উৎসর্গ

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সদয় প্রকাশক
শ্রীকরকমলে

সহসা এই সদয়তার কথা ভাবি যতই
রসিয়ে ওঠে মন ঠাকুরের করুণাতে ততই।

ইতি
গুণগ্রাহী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী (বাংলা)

উপন্যাস ঃ

ভাবি এক হয় আর, দোলা, ছায়া, তরঙ্গ রোধিবে কে, ধূসরে রঙিন, দোটানা, দ্বিচারিণী।

প্রবন্ধাদি ঃ

তীর্থংকর, ভ্রাম্যমান, আবার ভ্রাম্যমান, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, এদেশে ওদেশে, ভূস্বর্গচঞ্চল, ধর্ম বিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ, ইন্দিরাদেবীর পত্রাবলী (অনুবাদ), যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ, সাধু গুরুদয়াল ও কবি নিশিকান্ত (যন্ত্রস্থ)।

নাটক ঃ

আপদ ও জলাতঙ্ক, শাদাকালো, ভিখারিণী রাজকন্যা, প্রেমানন্দ (অঘটনী গল্পমালার শেষে মুদ্রিত)।

স্মৃতিকথা ঃ

স্মৃতিচারণ (প্রথম খণ্ড), স্মৃতিচারণ (দ্বিতীয় খণ্ড , স্মৃতির শেষ পাতায়, দেশে দেশে চলি উড়ে, স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে (ছাপা হবে পরে)।

রমন্যাস ঃ

অঘটন আজো ঘটে, অঘটনের ঘটা, অভাবনীয়, অঘটনের শোভাযাত্রা, অঘটনের সূত্রপাত ও করুণা অলৌকিকী (একখণ্ডে), অঘটনের পূর্বরাগ, অঘটনী গল্পমালা, ছায়াপথের পথিক, অশ্রুহাসি-ইন্দ্রধনু, পতিতা ও পতিতপাবন, গান প্রেম দেশ ভগবান প্রেম-অভয় (শেষ তিনটি বই শীঘ্রই ছাপা হবে)।

স্বরলিপি ঃ

সুরাঞ্জলি, গীতিমঞ্জরী, নবগীতিমঞ্জরী, গীতশ্রী, সুরবিহার (প্রথম খণ্ড), সুরবিহার (দ্বিতীয় খণ্ড)। দ্বিজেন্দ্রগীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান।

কাব্য ও কাব্যনাট্য ঃ

ভাগবতী কথা, অনামিকা সূর্যমুখী, মধুমুরলী, শ্রীচৈতন্য, মীরা বৃন্দাবনে, মহাভারতী কথা, তারাঞ্জলি (ইন্দিরা-ভজনের অনুবাদ , সুধাঞ্জলি (ঐ অনামিকা সূর্যমুখীর শেষে মুদ্রিত)। 'কৃষ্ণকথাকাহিনী' (ভাগবতী কথা ও মহাভারতী কথা-একত্রে)।

ভূমিকা

গৌরচন্দ্রিকা লেখার পরেও ভূমিকা কেন? উত্তর সহজ: গৌরচন্দ্রিকায় কয়েকটি কথা বলা হয় নি।

আমি বাংলায় লিখতে আরম্ভ করি প্রথম ১৯২১ সালে—সুইজর্লণ্ডে—রেঁালার সঙ্গে আমার ফরাসী কথালাপের বাংলা অনুবাদ যেটি পরে আমার তীর্থঙ্কর-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে লিখি আমার প্রথম উপন্যাস "মনের পরশ"—পট-ভূমিকা য়ুরোপে। উপন্যাসটির আদর হয়েছিল ব'লে পর পর এই ঢঙের আরো পাঁচটি উপন্যাস লিখি। এ-ছয়টি কথিকার মধ্যে কেবল প্রথমটিই (দ্বিতীয় সংস্করণে এর নামকরণ করি "ভাবি এক হয় আর"—এটিও নিঃশেষ তবে অদূর ভবিষ্যতে ছাপা হবে) স্মৃতিচারিণী রমন্যাসের কোঠায় পড়ে যেহেতু এতে আমি যেভাবে লিখে চলি তাতে কারুরই বুঝতে বেগ পেতে হয় হয় নি এ-উপন্যাসটির যুগল নায়ক কুঙ্কুম ও পল্লব কে। বহুবৎসর বাদে ১৯৭২ সালে আমি "ভাবি এক হয় আর"-এর শেষার্ধ লিখি "গান প্রেম দেশ ভগবান্" নাম দিয়ে। এ-বইটি আশা করি দু' বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে।

অতঃপর আমি ঝুঁকি ধর্মোপন্যাস ওরফে রমন্যাস লিখে এক নবপথের পথিক হ'তে। কোনো ধার্মিক ধর্মের কাহিনী লিখেছেন ব'লে জানি না। একমাত্র SONG OF BERNADETTE—কিন্তু এ-বইটি চমৎকার হ'লেও এর মূল্যায়ন করা হয়—প্রথম কৃষাণ বালিকার ঐতিহাসিকতায়—দ্বিতীয় লূর্দ-এ রোগতাপহারিণী প্রবাহিনীর অলৌকিক আরোগ্যশক্তির চমকে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ধর্মার্থী তথা রোগী যায় লূর্দ-এ চিরকুমারী মেরীমাতার সুধাধারার কৃপাস্পর্শ পেতে। যাবে না কেন? মানুষের দেহ ও স্বাস্থ্য সর্ববিধ পার্থিব ভোগের ভিৎ—ধর্মসাধনায়ও আপ্তবাক্যে পাই: শরীরমাদ্যং খলুধর্মসাধনম্। (শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ-উদ্ধৃতিটির সমর্থন করেছিলেন তাঁর কায়াকল্পসাধনার বিবৃতিতে) কিন্তু তবু এ-বইটিকেও ঠিক ষোলো আনা ধর্মোপন্যাস বলা চলে না। তারপরে হিল্‌টন সাহেব কয়েকটি তিব্বতী উপন্যাস লেখেন। কিন্তু সে-বিবরণীর মধ্যেও ধর্মের অমৃতবাণী ঝংকৃত হ'য়ে ওঠে নি, উঠেছে যাকে বলা যায় নেপথ্যতথ্য গুহ্যতত্ত্বের—occultism-এর—নানা উদ্ভট ব্যাখ্যা। আমি চেয়েছিলাম মুখ্যতঃ ধর্মকে উপজীব্য ক'রে কয়েকটি রমন্যাস লিখতে।

রমন্যাস নাম দিয়েছি বিশেষ ক'রে উপন্যাসের রং ঢং বর্জন ক'রে ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠা পেতে। কিছু কিঞ্চিৎ অলৌকিক অঘটনের আলোকপাত করেছি মূলত এই কথাটি বলতে যে, জগতের চলতি নিয়মকানুন পনের আনা ক্ষেত্রে অলঙ্ঘ্য হ'লেও বাকি এক আনার উদ্ভাসে দেখা দেয় যাকে ভাগবতী করুণার বে-আইনি বিধান ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। চলতি জীবনরীতি সর্বত্র প্রকট বটেই তো—কিন্তু তবু থেকে থেকে ভাগবতী করুণাও মূর্ত হয় বিশ্বাতীত বিশ্বপতির রক্ষাকবচের খবর দিতে। এই-খানেই অঘটন বা মিরাক্লের সার্থকতা—তাদের চমৎপ্রদ রসে নয়। যদি সব কিছুই একটানা কর্মফলের পথে অনিবার্য ঢঙে সংঘটিত হ'ত তাহ'লে মানুষের আত্মিক উপাসনা আরাধনা তপস্যা সবই হ'ত বিড়ম্বনা, অলীক। "সাবিত্রী"-তে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন জোর দিয়ে: Vain the soul's hope if changeless law is all.

আমার নিজের জীবনে নানা অভীপ্সা প্রার্থনা কী ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে আমি তারও কিছু খবর দিতে চেয়েছি আমার নানা কাহিনীতে। কোনো কোনো ক্রিটিক এতে প্রসন্ন হন নি যেহেতু তাঁরা আদৌ বিশ্বাস করেন না ভগবানকে ডাকাডাকি ক'রে কর্মফল বা নিয়তিকে পাশ কাটানো যায়। কিন্তু আর একদল জিজ্ঞাসু আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। তাঁরা ধর্মার্থী হোন বা না হোন সরল বিশ্বাসে মেনে নেন যে, ভগবানকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন—আর সে-সাড়া পেলে শুধু যে জীবনের অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাই নয়, সংসারের গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার পথ মেলে। আমি আমার নানা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা রমন্যাস ও স্মৃতিচারণ এঁদের জন্যেই লিখি।

স্মৃতিচারণ প্রথম ভাগ এঁদের কাছে এত সমাদর লাভ করল যে উৎসাহ পেয়ে দ্বিতীয় ভাগ লিখে ফেললাম। সেটিও জিজ্ঞাসু মহলে সমাদৃত হওয়ায় লিখি "স্মৃতির শেষপাতায়"—যেটি সম্প্রতি বাক্-সাহিত্য প্রকাশনী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর পরে আর লিখব না এ-সঙ্কল্প বজায় রাখতে পারলাম না নানা বন্ধুর উপরোধে: তাঁরা বললেন এতে আমার যোগাশ্রমে প্রবেশ করার সুখবর মিলেছে—কিন্তু যাঁর ডাকে পৌঁছলাম যোগাশ্রমের বাঞ্ছিত নন্দনে সেই মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের কথা না লিখলে চলবে কেন? ভেবেচিন্তে মনে হ'ল—তাঁদের উপরোধের মান রাখা শুভঙ্কর তাঁদের উৎসাহের জন্যেও বটে, আমার নিজের আন্তর তাগিদের জন্যেও বটে। তাই গত জুলাই মাসে (১৯৪৪) সুরু ক'রে পঞ্চাশ দিনে ৩০০ পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম শ্রীঅরবিন্দের মহিমার কথা। এটি সহৃদয় বন্ধু শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহোদয় মহোল্লাসে

নিয়ে গেলেন তাঁর "অমৃত" পত্রিকায় ছাপতে। এখানে বলা চাই—শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিতর্পণ আমি ১৯৫১ সালে করেছিলাম ইংরাজীতে SRI AUROBINDO CAME TO ME নাম দিয়ে। লেখবার পরে মনে হয়েছিল বহুবারই যে, এ-বইটির যখন পর পর তিনটি সংস্করণ বেরুলো তখন বাংলাতেও শ্রীঅরবিন্দের পালাগান করা উচিত যথাসাধ্য পুনরুক্তিকে পাশ কাটিয়ে। সম্পূর্ণ পাশ কাঠানো অসম্ভব, তবু চেষ্টা করেছি ইংরাজীতে যা যা বলা হয় নি সেই সব কথাই ফলিয়ে লিপিবদ্ধ করতে নানা ক্রিটিকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। "ভুল বোঝা" বলছি এইজন্যে যে, যদিও আমি সত্যিই চেয়েছি গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করতে, তবু আমার প্রতি বিমুখ ক্রিটিকেরা খুব সম্ভব ভ্রূকুটি করবেন এই ব'লে যে, আমি এই ছলে আমার নিজেরই ছবি আঁকতে চেয়েছি। তবু আমার মনে হয়—এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন একথা যেকোনো দরদী পাঠক মানবেন যদি আমার নানা উচ্ছ্বাস ও বিশ্লেষণ পড়েন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চোখে। কিন্তু উল্টো দিকে এ-ও একটি অকাট্য সত্য যে, এ-যুগ হ'ল মুলত অশ্রদ্ধার যুগ, তাই আমাকে সইতে হবেই হবে নানা বেদরদী ক্রিটিকের সস্তা বিদ্রূপ, হাল্কা হাসাহাসি, তীক্ষ্ণ তীরন্দাজি। হোক—বিশেষ যখন এ-সহনের একটি মস্ত ক্ষতিপূরণ এই যে অন্ততঃ কয়েকজন শ্রীঅরবিন্দভক্তের মন মানবেই মানবে যে, আমি তাঁকে শুধু যে ভালোবেসেছিলাম তাই নয় পূজার্হ মনে ক'রে আমার প্রাণ-বেদীতে অধিষ্ঠিত করেছিলাম ব'লেই দেখতে পেয়েছিলাম যে, এ-টাকা আনা পাইয়ের পঙ্কিল বাজারে এখনো এমন অমূল্য স্বর্ণারবিন্দ ফুটে ওঠে যার সৌন্দর্যে ও সৌরভে মন দুলে ওঠে, রক্তে ডমরু বাজে, চোখে জল ভ'রে আসে। তাঁর মধ্যে আমি যা দেখেছিলাম ও আনন্দের প্রবাহে অনুভব করেছিলাম আমি বহু চেষ্টা করেও ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নি। কিন্তু তাঁর কাছে কী পেয়েছিলাম ও কী মহানন্দের আশ্বাস নিশ্বাস ভ'রে নিয়েছিলাম তার অন্তত কিছুটা ঝঙ্কার আশা করি আমার নানা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বেজে উঠেছে—কিছুটা অন্তত ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি যে, অমরাবতীর ইন্দ্রধনু এ-দরকষাকষি স্বার্থের কাড়াকাড়ির হানাহানির কুরুক্ষেত্রেও কখনো কখনো ধর্মক্ষেত্রের স্বর্ণ-রাগচ্ছটার সারথ্য করতে অবতীর্ণ হ'তে পারে। মানুষের অন্তিম আশা সেইখানেই—মানবচরিত্রকে দেবত্বের পদবীতে উত্তীর্ণ ক'রে ধন্য হ'তে। যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছে এসে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন এই দেবারতির আকাশ-প্রদীপ হ'য়েই—যে-আলো নিভেও নেভে না কারণ তার উৎস অনাদি অশেষ। তাঁকে প্রণাম। ইতি।

পুনশ্চ। তথ্যের দিক দিয়ে আর একটু বলবার আছে: "শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে" স্মৃতিচারণের পরে পঠনীয় "দেশে দেশে চলি উড়ে"। এর তিনটে সংস্করণ বেরিয়েছে,

চতুর্থ সংস্করণে এর নাম দেব "দেশবিদেশের স্মৃতি"। তার পরে—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-জীবনের শেষে বিশ্বভ্রমণের অন্তে—"স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে" পাঠ্য। এটির প্রথমার্ধ প্রবাসীতে ও প্রবর্তকে বেরিয়েছিল। এ কয়টি জুড়লে একুনে দাঁড়াবে অন্তত ২০০০ পৃষ্ঠার স্মৃতিচিত্র। এরও পরে লেখার ইচ্ছা আছে "হরিকৃষ্ণ মন্দির স্মৃতি"—যদি না এ-বিচিত্র পর্বটি লেখার আগেই ওপার থেকে ডাক আসে।

প্রণাম

এসেছ যদি ধ্যানের মণি, মানবতনু ধরি'
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি'?
অলকা অরবিন্দ তুমি
শোভিলে যে ধুলায় কুসুমি'
নাশিলে কালো অলোক-আলোমন্ত্র নির্ঝরি'।
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি'?

অন্ধকারে বসুন্ধরা ছিল যে বিরহিণী
করুণ মেঘে না শুনি তব অরুণকিঙ্কিণি
এলো যে দুখদারুণ দিনে
লয় যেন সে তোমারে চিনে—
দাও গো এই নয়নবর আড়াল অপসরি'।
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি'?

জপিয়া তব দ্যুমণি-আঁখি রজনী বৈরাগী
কেতনে তব চমকি' নবচেতন ওঠে জাগি'
ঘনালো যবে বেদনরাতি
গাহিলে প্রেমে তুমি প্রভাতী
মরণপারাবারে বাহিলে নবজীবন তরী:
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি'?

গৌরচন্দ্রিকা

আমার স্মৃতিচারণ সম্বন্ধে "স্মৃতির শেষপাতায়"-এর ভূমিকায় একটি নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছি কী ভাবে আমার স্মৃতিকথা সাজানো সুষ্ঠু হবে। "স্মৃতির শেষ পাতায়" নামটি ঠিক হয় নি, কেন না তার পরে আরো তিনটি পর্ব আছে—পণ্ডিচেরীতে যোগদীক্ষা পর্ব, তার পর পণ্ডিচেরি আশ্রম থেকে বেরিয়ে বিশ্বভ্রমণ পর্ব—এটুকু লেখা হয়েছে "দেশে দেশে চলি উড়ে"-তে—তার পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে কী ভাবে পুনায় "ডানলাভিন কটেজ-এ প্রাক্‌মন্দির পর্বে প্রবেশ করল তার কাহিনী যা লিখেছি আমার "স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে"-তে যেটি গ্রন্থাকারে একটি বিশিষ্ট পর্ব হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে যথাকালে। কিন্তু মাঝখানে পণ্ডিচেরিতে আমার যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয়েছিল সেসবের কোনো যথাযথ বিবৃতি বাংলায় লেখা হয় নি,—কতকটা লেখা হয়েছে ইংরাজীতে SRI AUROBINDO CAME TO ME, AMONG THE GREAT ও YOGI SRI KRISHNAPREM এই তিনটি বইয়ে। এ-বই তিনটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা মানবেন এরাও মূলত স্মৃতিচারণই বটে—যদিও যথা পর্যায়ে সাজানো হয় নি, ফলে শুধু যে নানা স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে তাই নয়—পরের কথা অনেক সময় আগেই এসে গেছে। একথা খাটে "তীর্থঙ্কর" ও "ভূস্বর্গ-চঞ্চল" সম্বন্ধেও—যদি আমার জীবনের পণ্ডিচেরি পর্বকে ধরি মোটামুটি ২২.১১.১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ সালের শেষ পর্যন্ত। এতশত ব্যাখ্যা করছি একটি বিশেষ কারণে। সেটি এই যে, আমার অনেক দরদী বন্ধু বান্ধবী—যাঁরা আমার স্মৃতিচারণে রস পেয়েছেন—আমাকে বার বার অনুরোধ করেছেন যে, এতই যখন লিখলাম তখন বাংলায় স্মৃতিচারণ-মহাভারতটি পূর্ণাঙ্গ করলে তবেই আমার স্মৃতিকথা কতকটা সমাপ্ত হবে। (কতকটা বলছি এই জন্যে যে, এর অন্তিম পর্ব হবে আমাদের "হরিকৃষ্ণ মন্দির পর্ব"—যার পত্তনের কথা "স্মৃতি-জোয়ারে দুকূল ছেয়ে"-র শেষে উল্লেখ ক'রেই ইতি করেছি।) তাই ভাবলাম আমার দরদী পাঠকদের মনস্তুষ্টি করলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে: তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করাও হবে আমার স্মৃতিচারণের বৃত্ত কতকটা সম্পূর্ণও হবে।

যদি তাঁরা বলেন সম্পূর্ণ হবে কেমন ক'রে—হরিকৃষ্ণ-মন্দির পর্বকে যখন আমার জীবনের স্বর্গারোহণ পর্ব নাম দেওয়া চলে? তাহ'লে বলব আমতা আমতা ক'রে: "আচ্ছা, যদি পারি তো হরিকৃষ্ণ-মন্দিরের কাহিনীও লিখব যদি না হঠাৎ খুলে যায় ঠাকুরের চরণ বৈকুণ্ঠের দ্বার।"

না, এ নিছক পরিহাস নয়। মানুষ জীবনে কত কী করবে ভাবে। সঙ্কল্প করে মৎলব আঁটে, ভবিষ্যতের নানা গর্ভাঙ্কের ছক কাটে, কিন্তু যা করবে ভাবে করতে পারে কি পুরোপুরি? কিছুটা পারে, আর তারই নাম কর্মযোগের কৃতি। বাকিটুকু আর করা হয় না—যাকে বলে পাদপূরণ। সেই অকৃত কর্মের কিছুটা পরে বন্ধুরা হয়ত লেখেন স্মৃতিতর্পণে—যদি অবশ্য সত্যি লেখবার মতন কিছু থাকে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে উড়োতর্ক বা দাপাদাপিটা তো আর সত্যিকার কর্ম নয়, গীতার পরিভাষায় বিকর্ম। সত্যিকার কর্ম হ'ল সেই কৃতি প্রচেষ্টা সাধনা যাদের লক্ষ্য তিনি যিনি গীতায় ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বলেছিলেন: "কর্মেই আমাদের অধিকার কর্মফলে নয় নয় নয়।" অপিচ, এমন সব বিকর্ম না লেখাই বাঞ্ছনীয় নয় কি যার বিবৃতি শ্রোতার মনপ্রাণকে উদ্দীপ্ত করে না, তুলে ধরে না অন্ধকার থেকে আলোর পানে? অর্থাৎ যদি হরিকৃষ্ণমন্দিরে আমি এই জাতীয় শুভকর্ম বা শুভবুদ্ধির বিবৃতি লিখে যেতে পারি তবেই লিখব, নৈলে নয়। মানে, শুধু আর্টের জন্যে নয়, মানুষের মনকে ভগবৎমুখী করে যে-সব কাহিনী তারই রেকর্ড রেখে যেতে—যদি অবশ্য তার আগে ঠাকুর হাতছানি দিয়ে না ডাকেন তাঁর চরণমূলে ফিরে যেতে জাগতিক দেনাপাওনার হিসাব নিকাশের শেষে।

॥ এক ॥

আমার "স্মৃতিচারণ" প'ড়ে এক "নিরপেক্ষ" ক্রিটিক ভ্রূকুটি করেছিলেন এই ব'লে যে আমি বড় বেশি আমি আমি করেছি। কিন্তু আত্মজীবনী বর্গীয় লেখায় আমি-কে বাদ দিয়ে বিচিত্র বিশ্বের বর্ণনা করব কেমন ক'রে আমি ভেবে পাই নি। স্মৃতিচারণের উপজীব্য বিচিত্র বিশ্ব বটে, কিন্তু সে-বিশ্ব ফুটে উঠেছে একটি মানুষের মাধ্যমে যার সর্বনাম "আমি"। নিবন্ধ বা নানা রম্যরচনায় আমিকে কতকটা পাশ কাটানো চলে, কিন্তু স্মৃতিচারণের মূল রস বয় "আমিরই" নানা শাখাপ্রবালে। অবশ্য একথা মানি যে এ-শাখাপল্লবের মর্মরে কেবল "আমিই" বেজে উঠলে রসভঙ্গ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতেই হবে যে, এ-মর্মর জাগে একটি সংঘাতে—আমি ও ন-আমির। বাতাসের উপমাটি সুপ্রযুক্ত কারণ যদিও মর্মরধ্বনির রসে লতাবল্লরীর দান অনস্বীকার্য, তবু সঙ্গে সঙ্গে এও সমান অনস্বীকার্য যে বাতাস উস্কে না দিলে মর্মর-ধ্বনি জাগতেই পারে না। অন্ততঃ আমি তো এই ভাবেই এঁকে এসেছি নানা ছবি আমার "মনের মাধুরী মিশায়ে"। অবশ্য যদি আমার মনের কোনো মাধুরীই না থাকে তবে সে-ছবিকে মাধুরীর রসে রসিয়ে তোলা সম্ভব নয়। যে-মানুষ নিজে অরসিক তার আত্মকথা সরস হবে কেমন ক'রে? মিষ্টি না দিয়ে শুধু দুধ ঘন করলে কি পায়েস রাঁধা যেতে পারে?

এই সব ভেবেই আমি প্রথম থেকেই আমার আমি-কে রাশ ছেড়ে দিয়েছি—লৌকিক বিনয়কে মেনে "আমি" না ব'লে "বর্তমান লেখক" বসাই নি। আমার মনে হয় এভাবে আমি সর্বনামটিকে moi haissable নামাঙ্কিত ক'রে বাদ দিলে আত্মকথা আড়ষ্ট হয়—সাবলীল হ'তে পারে না—আরো এই জন্যে যে এভাবে আমি-র গলা টিপে ধরলে খতিয়ে বেসুরই বেজে ওঠে, সুরেলা কখন নয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই সবিনয়েই: যে, আমি [illegible] সত্ত্বেও ভেবেচিন্তে স্মৃতিচারণ লেখা সুরু না করলেও লেখার পরে দেখি: ও মা! আমি পদে পদেই আমির স্মৃতিপটে এঁকে এসেছি নানা বন্ধু বান্ধবী [illegible] শিল্পী রসিক ও দার্শনিককে—আর তাঁদের ছবি আঁকার সময়ে আমার আমি এগিয়ে আসে নি

কতকটা আড়াল থেকেই বাতি ধরেছে তাঁদের মুখের উপর। আজ জীবনের সান্ধ্য-লগ্নে আমার মনে হয় যে আমার নানা অহঙ্কার সত্ত্বেও আমি আসলে দাম্ভিক নই ব'লেই আমার স্মৃতিচারণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে অন্তত তাঁদের কাছে যাঁদের মন আমার এ-অঙ্গীকারকে মঞ্জুর করেন যে আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি স্বামীজির এই মহোক্তিকে যে আমি বড়র কাছে মাথা নত ক'রে সত্যিই আনন্দ পাই, যে-আনন্দের কাছে আমার আমি-র দুরভিমান ফিকে হ'য়ে এসেছে সরল উচ্ছ্বাসেই বলব।

আমার প্রতি বিরূপ অনেক ক্রিটিক আমাকে "উচ্ছ্বাসী" দুর্নাম দিয়ে আমার লেখার মানহানি ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যদি একটু শান্ত হ'য়ে ভেবে দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন যে, এই উচ্ছ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—বিশেষ ক'রে গুরুবাদী যোগপথে যেখানে আমার "আমি" গুরুর দিব্যসত্তায় অভিভূত হয়েছিল ব'লেই প্রতিষ্ঠা পায় নি। বাস্তবিক যাঁর ডাকে আমি সাংসারিক তথা শৈল্পিক জীবন ছেড়ে ছুটেছিলাম অজানা অচেনা আশ্রমে, তাঁর মহিমা আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল ব'লেই আমি তাঁর সঙ্গে নিরন্ত তর্কাতর্কি করা সত্ত্বেও সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশই মেনে চলতে পেরেছিলাম আত্মাভিমানের বিদ্রোহকে দাবিয়ে। তাঁর মহিমা আমি যে শতমুখে ব'লেও তৃপ্তি পাই নি, বারবারই মনে হয়েছিল আরো ফলিয়ে বলা উচিত ছিল—এই উচ্ছ্বাসই আমার নানা আত্মাভিমানকে বাতিল করার শক্তি দিয়েছিল—আর একবার নয় অগুন্তিবার। মহাজনের মহত্ত্ব আমার মনকে এমন সহজে রসিয়ে রঙিয়ে দুলিয়ে চালাত যে, আমি ঠাকুরকে বার বার প্রণাম করেছি এই ব'লে যে, আমাকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই প্রণাম করার আবেগ জাগিয়ে—দেখিয়ে দিয়ে যে, বড়কে বড় ব'লে চিনলে নিজের গর্ব মাথা তুলতে পারে না, কারণ প্রণামবৃত্তি বলে: "আমাকে দেখো না—দেখ মহিমময়কে যাঁকে প্রণাম ক'রে আমি মুক্তিপথের দিশা পেয়েছি প্রতি পদেই।" জানি এ-ধরণের পূজাবৃত্তিকে এ-যুগের বুদ্ধিবাদীরা নাম দেন—**hero-worship**: এ-দুর্নামটির বাংলা নেই, তবে এর কটাক্ষ কী জানে সবাই—যে "আপনাতে মন আপনি থেকো, যেও নাকো কারো ঘরে।" কিন্তু এ-উক্তিটির সদর্থ সত্য হ'লেও এর কদর্থটি আধুনিকেরা বেশি বরণ করেন: অর্থাৎ আত্মম্ভরিতা। কি না, আমি যা বুঝি তাই প্রামাণ্য, কাজেই অপরের উপদেশে চলতে আমি নারাজ।

এ আত্মসর্বস্বতার রসদ জোগায় হাজারো উড়ো ঝড়—তর্কপ্রবৃত্তি, আত্মাদর, রাশ না মেনে উদোম ছোটার সনাতন ঝোঁক, কারুর কাছে নত হ'তে কুণ্ঠাকে মান দিয়ে যারা নত হয় তাদের স্তাবক ব'লে দেগে দেওয়ার সস্তা সুখ—আরো কত কী। পণ্ডিচেরীতে পৌঁছবার আগেই এ-সত্যটি আমি আবিষ্কার করেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

একটি কথা মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে: যে উঁচু জমিতে ফসল ফলে না, নিচু জমিই উর্বর হয় সেখানে জল সহজে জমে ব'লে। তাছাড়া চৈতন্যদেবেরও আমি ভক্ত হয়েছিলাম "মন্ত্র" কাব্যে পিতৃদেবের চৈতন্য-তর্পণে সাড়া দিয়ে। চৈতন্যদেব উঠতে বসতে শিষ্যদের বলতেন:

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

তৃণের চেয়েও নিচু হ'য়ে, নিত্য স'য়ে তরুর মতন
মান দেয় যে নগণ্যকে ধন্য তারি ভজন পূজন।

কিন্তু মুখে শ্লোক আওড়ালে হবে কি যদি অন্তরে আত্মাভিমান বেঁচে বর্তে থাকে? শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রমে বার বার দেখতাম মুখে যা বলছি কাজে তা করতে পারছি না। বার বার ঠেকে একবার বেঁধেছিলাম একটি গান

যা কিছু বলি না বলি, সাধি না সাধি, করি না করি—
সবার মাঝে অহঙ্কার নিতুই 'ওঠে শিহরি'।

তাইতো আমি আরো চাইতাম গুরুদাস হ'তে যাতে হরির নামকীর্তনে ঠিক সুরটি আমার মুখে ফুটে ওঠে। উঠত যখন সত্যি নত হতাম গুরুর পায়ে, কিন্তু যেই তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতাম সেই দেখতাম প্রণতিসুন্দর দীনভাব মন থেকে উবে গেছে অজান্তে, আর তার জায়গা জুড়ে বসেছে "আগে জানি তবে মান্‌ব" এই ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন: 'আগে জান্‌ব তবে মান্‌ব' এ-জিগির এসেছে বিদেশ থেকে, ভারতাত্মা চিরদিনই ব'লে এসেছে—'আগে মহাজনদের মেনে চললে তবেই জানার ম'ত জানা যায়।' কিন্তু আমি প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি—যার নাম যোগাশ্রমে নানা পরীক্ষায় পড়া। তাই ফিরে গিয়ে হারানো খেই ধরি—বলি অন্তরের পূজাবৃত্তির কথা যে ধারণ করে গুরুবাদের বিনতিকে।

আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল আবাল্য পিতৃদেবের গুণী জ্ঞানী মানীকে শ্রদ্ধা করতে দেখে। আমাকে তিনি পদে পদে শেখাতেন প্রণাম করতে শুধু গুরুজনকে নয় তাঁর নানা গুণবান প্রতিভাধর বন্ধুকে আমাকে আগে বুঝিয়ে দিয়ে—তাঁরা কোন্ কোন্ গুণে গুণবান্, কিসের আলোয় ফুটে উঠেছেন প্রতিভার দীপ্তিতে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমীর নাম আমি কৈশোরে পড়েছিলাম রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণের এক পাদটীকায়। মহাপণ্ডিত, বেদজ্ঞ, সদাচারী নানা বৈদিক গ্রন্থের অনুবাদক। সব মনে নেই, তবে মনে আছে তিনি যেদিন প্রথম আমাদের "সুরধাম"-এ আসেন

পিতৃদেবের আমন্ত্রণে। পিতৃদেব তাঁকে দেখিয়ে বললেন: "প্রণাম কর এ মহা-পণ্ডিতকে যাঁর কথা তুই বলছিলি সেদিন।" আমি সানন্দেই প্রণাম করতে তিনি সবিস্ময়ে বললেন: "এ কী ব্যাপার দ্বিজেন্দ্রবাবু, আমার কথা এ-শিশু আপনার কাছে বলল কী সূত্রে?" আমি নতমুখে বললাম রাজকৃষ্ণ রায়ের কথা। তিনি খুশী হ'য়ে বললেন: "বেঁচে থাকো বাবা।" অমনি আমার সে কী আনন্দ! সাক্ষাৎ সত্যব্রত সামশ্রমীর স্নেহাশিস—আমাকে আর পায় কে?

এইভাবে আমি মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধার আবহে গ'ড়ে উঠেছিলাম—যার পরম পরিণতি গুরুবাক্যে প্রশ্নহীন বিশ্বাস না হোক, নির্ভেজাল শ্রদ্ধা। আজকের যুগ মূলত অশ্রদ্ধার যুগ, আকাশে বাতাসে হুঙ্কারধ্বনি শুনি পার্সনালিটি কাল্ট না কি আমাদের অধঃপাতের গোড়া—কাউকে না মেনে শুধু নিজের কুবুদ্ধিকে সুবুদ্ধি প্রমাণ ক'রে যে লায়েক ছেলে বনে কেবল তারই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যে জ্ঞানী ধ্যানী মুনি ঋষির গুণগানে দোয়ার দেয় তার অবস্থা সঙিন। বহুদিন পরে মনীষী অলডাস হাক্সলির একটি লেখায় পড়েছিলাম যে, আমাদের সভ্যতার প্রগতির মূলে আছেন যে-কতিপয় মনীষী তাঁরা না জন্মালে আমরা আজও বর্বরতার জঙ্গলেই গোচারণ ক'রে চলতাম, আমাদের মনের মাটিতে মহাজনদের দীপ্তিবীজ বুনলে তবেই আমরা মানুষ হ'য়ে উঠি, কিন্তু এ-বীজ তাঁরা না বপন করলে আমরা আজও থাকতাম যে-তিমিরে সেই তিমিরে। বইটি হাতের কাছে নেই তবে মনে হয় এক গাণিতিক প্রতিভাধর বালক Young Archimedes এর গল্পের প্রস্তাবনায় অলডাস পেশ করেছিলেন সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর এ-নিদানটি। একথা যে সত্য তা একটু ভেবে দেখলেই মনে হয় বৈ কি, কিন্তু সচরাচর মানুষ চলে গতানুগতিকতার পথেই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে—ভেবে দেখে অচিন পথে পদক্ষেপ করেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

সাধুসন্তের প্রতি শ্রদ্ধার বীজে আমাদের মনের মাটিতে সোনার ফসল ফলে এ একটি ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু আমাদের আত্মপ্রসন্ন অহমিকার ঠুলিকে আমরা দূরবীণ ব'লে ভুল করি ব'লেই এ-প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও দেখতে পাই না। পেলে কি ভাবতে পারতাম যে, গুরুকে মানলে স্বাধীন চিন্তার অপঘাত না হ'য়েই পারে না? আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে সনাক্ত করেছি অনেকগুলি কারণে: একটি কারণ—বলেছি—আমি মহাপ্রাণ মহাত্মাদের কাছে নত হবার দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার মহানুভব পিতৃদেবের কাছে শৈশবেই। শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সালে যখন প্রথম দেখি তখন আমার যুবক মন যে সানন্দ বিস্ময়ে আত্মহারা হয়েছিল তার মূলে ছিল এই দীক্ষার ফলশ্রুতি—কোনো মামুলিয়ানার সেকেলে উদ্গার নয়। অর্থাৎ আমার বালক মন শ্রদ্ধার বাতাবরণে ফুলের মতন সহজে তার নানা আনন্দদল মেলেছিল ব'লেই

আমি বরণ করতে পেরেছিলাম বরণীয়দের কমলচরণ—যাদের মধ্যে আমার কাছে গুরুর মান পেয়েছিলেন প্রধানত দুজন লোকোত্তর মহাভাগঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি চর্মচক্ষে দেখি নি, কিন্তু তিনি আমার মনের মন্দির আলো ক'রে বসেছিলেন কৈশোরেই। যৌবনে তাঁর উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আমার দ্বিতীয় গুরু শ্রীঅরবিন্দের অপার অচিন্ত্য স্নেহাশিসে। আমাকে তিনি আমার যোগদীক্ষার আদিপর্বে একটি সংশয়ের সঙ্কটলগ্নে লিখেছিলেন (২.১.১৯৩০) ঃ

"You need not imagine that we shall ever lose patience or give you up—that will never happen. Our patience you will find is tireless because it is based upon unbounded sympathy and love. Human love may give up, but divine love is stable and does not falter. We know that the aspiration of your psychic being is sincere. It is because the sincere aspiration is there that we have no right to disbelieve in your *adhikar* for the yoga."

[ভাবার্থ ঃ "ভুলেও ভেবো না যে, আমরা অসহিষ্ণু হ'য়ে তোমাকে বাতিল করতে পারি। পারি না, কারণ আমাদের ধৈর্যের ভিৎ হ'ল অপার দরদ ও প্রেম। মানবিক প্রেম হার মানতে পারে কিন্তু ঐশ প্রেম অচল প্রতিষ্ঠ। আমরা যখন জানি যে, তোমার অন্তরাত্মার অভীপ্সা অকৃত্রিম, তখন যোগে তোমার অধিকারকে নামঞ্জুর করব কেমন ক'রে ?"]

কিন্তু আমার সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করতে তিনি এর আগেও আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন। এবার সাধ্যমত যথাপর্যায়ে লিখতে চেষ্টা করব—কী ভাবে তিনি আমাকে নির্দিশায় দিশা দিতে আমার হৃদয় জুড়ে বসেছিলেন প্রথম থেকেই।

॥ দুই ॥

আমি অন্যত্র লিখেছি ফলিয়েই কী ভাবে আমার জীবনের নিশুত রাতে ঠাকুরের উষার আলো এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল গুরুচরণে শরণ নিতে। শরণ আমি নিয়েছিলামও ভক্তির উচ্ছ্বাসে। কিন্তু সে-পরম সুলগ্ন বারবারই নিরাশার দুর্লগ্নে ঢেকে গিয়েছিল, আর বারবারই ফের ভরসার নবারুণ আমাকে মুক্ত করেছিল নানা অহমিকা সংশয় ও চ্যুতির কবল থেকে। এ-রকম নানা দুর্লগ্নে আমি শ্রীমা-র কাছেও বারবারই

উৎসাহের পাথেয় পেয়েছিলাম—যার কথা বোধ হয় লিখেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু যখন মনে পড়ছে না তখন লিখি সংক্ষেপে—পুনরুক্তি হ'লে নিরুপায়। যে-স্মৃতিচারণের কালপরিধি ১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ সাল—প্রায় পঁচিশ বৎসর—সে পরিধির মধ্যে সব খুঁটিনাটি মনে রাখা অসম্ভব। তাই নানা কথাই একাধিকবার বলেছি যার জন্যে ক্রিটিকেরা আমার প্রতি ভ্রূকুটি করেছেন। কিন্তু তাঁরা যদি বার্ধক্যের উপান্তে এসে মনে করতে চেষ্টা করতেন কবে কী ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য তাহ'লে হয়ত পুনরুক্তির জন্যে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তাঁদের একটু বাধত। এইটুকু সাফাই গেয়েই স্বরু করি আমার যোগজীবনের প্রথম অধ্যায়।

১৯২৪ সালে আমার ভাগ্যতারকা প্রথম মেঘমুক্ত হ'য়ে আমাকে হাতছানি দিয়েছিল—আমার চিত্তাকাশে উদয় হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আশ্চর্য নয়নতারা। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে লিখেছিলেন মডার্ন রিভিউয়ে যে, এক আন্তর আলোয় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত—**his face was radiant with an inner realisation !**

তারপরে কত কী ঘ'টে গেল আমার জীবনমঞ্চে—কত আশা নিরাশার দ্বৈতলীলা, স্ববিরোধী অনুভূতির হানাহানি, অঙ্গীকার-অস্বীকারের দুঃসহ সংঘর্ষ ; সংসার ভালো লাগে না অথচ তার মায়া কাটাতে না পারা ; আলোকে আলো ব'লে চিনেও অন্ধকারের সঙ্গে ঘরকন্না করতে রাজী হওয়া ; একবার নয় বারবারই ঠেকেও শিখতে না চাওয়া ; পূজার হৃদয়াবেগের সঙ্গে বিজ্ঞ সাবধানতার অশ্রান্ত প্রতিযোগিতা ; এ-ও-তা বিলাসের মধ্যে শান্তি চাওয়ার সঙ্গে নির্মল বৈরাগ্যের সহাবস্থান—সে কত কাণ্ড কারখানা ! সময় সময় হতাশা আমাকে পেয়ে বসত, কোনো দিন কি পার হ'তে পারব এ-দুর্বিষহ অন্তর্দ্বন্দ্বের গণ্ডী ? যাঁরা বস্তুলাভ করেছেন তাঁদের স্বভাব নিশ্চয়ই একান্তী সুস্থ শান্ত, আমার মতন চঞ্চল বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত নয়—এইসব অন্তহীন বিষণ্ণ প্রশ্ন—কিন্তু থাক এ-ভণিতা, বলি রাত পোহালো কী ভাবে—যদিও বলা সহজ নয়—অনেক কথা বলতে বাধে ব'লেও বটে। তবু নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে চলবে কেন ? তাই বলি যতটা বলা চলে।

১৯২৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে শেষ কথা যা বলেছিলেন তা এই যে, আমাকে এখনো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে যদি আমি তাঁর যোগে সত্যিই দীক্ষা চাই। তার পরে গিয়েছিলাম স্বামী অভেদানন্দের কাছে আসন ও প্রাণায়ামে দীক্ষার জন্যে। তিনি কৃপা ক'রে দীক্ষা দিতে রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু বলিষ্ঠ যোগী শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার বাধ সাধলেন, আমার সঙ্গে (বোধ হয় ১৯২৬ সালে) ধ্যান ক'রে বললেন যে শ্রীঅরবিন্দই আমার গুরু একথা তিনি বরদাবাবুকে বলেছেন নিজে এসে। এসব

কথা আমার "স্মৃতিচারণ" দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছি, তাই পুনরুক্তি করলাম না। শুধু বলি যে, আমি শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে ১৯২৮ সালে ৫ই নভেম্বর গিয়ে আমার সমস্যার কথা জানাতে তিনি বলেছিলেন যে, বরদাবাবু আমাকে ভুল বলেন নি, শ্রীঅরবিন্দই আমার গুরু—এখন চাই শুধু পথ চেয়ে থাকা কখন ডাক আসবে—"ন ত্বরমানেন লভ্যঃ" হাঁকু পাঁকু করা ভুল ইত্যাদি। এসব কথাও লিখেছি আগে ফলিয়েই তাই এবার বলি—কিভাবে আমার ডাক এসেছিল জীবনের এক অবিস্মরণীয় সন্ধিলগ্নে।

৫ই নভেম্বর শ্রীগোপীনাথ আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন একটু নিরালা থাকতে যাতে গুরুশক্তি আমার মধ্যে সহজে সক্রিয় হ'তে পারে। আমি স্থির কবলাম লখনৌয়ে আমার পিতৃবন্ধু কবি অতুলপ্রসাদের কাছে থাকব লোকজনের সঙ্গে বেশি না মিশে।

কিন্তু মানুষ যা করবে ভাবে করতে পারে কি? অতুলপ্রসাদের আরাম নিলয়ে কেবল গান আর গান আর গান॥ শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন সাবিত্রীতেঃ

> The conscious doll is pushed a hundred ways,
> It feels the push but not the hand that drives,
> কী জানে জীবনে জীব, নিয়তির খেলার পুতুল?
> জানে সে কেবল—এক করাঘাতে ধায় দিকে দিকে,
> জানে না কার সে-কর করে তাকে উধাও কোথায়।

লখনৌয়ে গানের আবর্তে অস্থির হ'য়ে একদিন মনে বিষম অনুতাপ হ'ল। এর নাম কি—নিরালা থাকা? বিষণ্ণ হ'য়ে একলা ভজন গেয়ে সকালে সবে ধ্যানে বসেছি ১৫.১১ ২৮ তারিখে, এমন সময়ে আমার অন্তরে কী যে ওলটপালট হ'য়ে গেল ভাষায় তার হদিশ দেওয়া সম্ভব নয়ঃ ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হ'য়ে আমি শ্রীঅরবিন্দকে তার ক'রে ছুটলাম পণ্ডিচেরি। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ধরলাম ট্রেন—সব অনৈশ্চিত্যের অবসান হ'য়ে গেল যেন চক্ষের নিমেষে। অঘটন যে আজো ঘটে তার পরিচয় পেলাম আবার যেন নতুন ক'রে। তারপর শুধু আনন্দ আর আনন্দ তারকাতীর্থযাত্রার।

কী ভাবে এ-অভাবনীয় অঘটনটি ঘটেছিল আমি আমার "স্মৃতিচারণ" দ্বিতীয় ভাগে লিখেছি, অন্যত্রও বর্ণনা করেছি ফলিয়ে।

॥ তিন ॥

লখনৌ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে তার করেছিলামঃ "আমার ডাক্ এসেছে অবশেষে। এখন দীক্ষা দেবেন তো?" বম্বেতে বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের ওখানে উঠে

গুরুদেবের তার পেলাম : 'এসো।' কিন্তু বন্ধুর কাছে বলি নি : 'বাউল ঝাঁপ দিয়েছে' (শ্রীমৎ অনির্বানের ভাষায়।) শুধু বললাম শ্রীঅরবিন্দ ২৪এ নভেম্বর দর্শন দেবেন, তাই বাঙ্গালোর হ'য়ে পণ্ডিচেরি প্রয়াণ। বন্ধুবর শ্রীঅরবিন্দকে মহা কবি ব'লে ভক্তি করতেন, তাই খুশী হলেন।

হবি তো হ, সেইদিন রাতেই তাঁর এক মিত্রের নিলয়ে খ্যাতনামা আবদুল করিমের গান। কিন্তু এ কি? তাঁর গানে কই আর তো তেমন গভীর তৃপ্তি পেলাম না! যে-পরমানন্দ আমি আকণ্ঠ পান করেছিলাম তার পাশে আর সব আনন্দকেই আলুনি লাগত এ অত্যুক্তি নয়—যদিও জানি আমার মতন গান পাগলের মুখে এহেন কথা শুনে বিচক্ষণেরা মাথা নাড়বেন : "The old old story" ব'লে। কিন্তু আমার বৈরাগ্যের মূল তখন আর জীবনবিতৃষ্ণা ছিল না। পটপরিবর্তন হয়েছিল—এক অচিন আলোর আনন্দে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত—যাকে সাহেব পুরাণে বলে walking on air! একথার মর্ম কেবল সেই জানে যার চোখের ঠুলি খ'সে গেছে দৈব জ্যোতির অভ্যুদয়ে। তাই এ-আশ্চর্য আনন্দের উল্লেখ ক'রেই থামি—বলি কী হ'ল তার পরে। সেও এক অভাবনীয় অঘটন।

পণ্ডিচেরিতে শ্রীমার দর্শন আমি পেয়েছিলাম প্রথম ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে—যখন আমি উঠেছিলাম আলসাসিয়াঁ হোটেলে। শ্রীমা আমাকে সাদরে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন যোগ সম্বন্ধে নানা কথা। শুনে ভালো লেগেছিলো বৈ কি—কিন্তু আরো ভালো লেগেছিল তাঁর রূপে, বিশেষ ক'রে তাঁর দৃষ্টি ও হাসি।

শ্রীমা সুন্দরী—তাঁর যৌবনের ছবিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর সুষমায়। পণ্ডিচেরিতে যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর হবে। যৌবনশ্রী ছিল না, কিন্তু এমন মধুর মাতৃমূর্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর রূপশ্রীতে যে, আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম—আরো এই জন্য যে, বিদেশিনীর কান্তিতে ভারতীয় মাতৃরূপ দেখব এ আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। তাই হয়ত (চম্‌কে ওঠার দরুণই) অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না, শুধু দু'তিনটি সাধকের মুখে শুনেছিলাম তাঁর নানা দৈবী বিভূতির কথা। কিন্তু আমার মন টেনেছিলেন তিনি তাঁর মাতৃমূর্তির অপরূপ প্রসাদে—কোনো বিভূতির গুণে নয়। তাঁকে প্রণাম করেছিলাম সানন্দেই—কিন্তু দেবী ব'লে নয়, মা ব'লে সানন্দে স্বীকার ক'রে। এ আমি পারব ভাবিনি কিন্তু পেরেছিলাম যে প্রথমেই এতে আমার অনেক সংশয়ই নিরস্ত হয়েছিল। শ্রীমা-র একটি কথা আজও কানে বাজে : "আমি চাই সবাই আমাকে সহজে বরণ করবে আপনজন ব'লে।" আরো অনেক চমৎকার কথা যা ভুলে গেছি, কেবল এই আত্মপ্রকাশটুকুই মনে গেঁথে গেছে।

তারপর কলকাতায় ফিরে ফের পড়লাম নানা আবর্তে—বিশেষ ক'রে সংশয়ের। কিন্তু সেসব কথা নানা সূত্রেই লিখেছি, তাই টপ্‌কে বলি ১৯২৮ সালের কথা যখন প্রথম শ্রীমার সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথাবার্তা হয়। আশ্রমে দীক্ষা পাবার পরে দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখে মনের আরো একটি পর্দা স'রে যায়, যখন শ্রীমা আমাকে বলেন যে লখনৌয়ে ১৫.১১.২৮ তারিখে সকালে আমার চৈত্যপুরুষের (psychic being) উদ্বোধন হয়েছিল ব'লেই আমি সংসারের দেহলি ডিঙিয়ে এককথায় যোগমন্দিরের তোরণে পৌঁছতে পেরেছিলাম।

তারপর মাঝে মাঝেই শ্রীমা ডেকে পাঠাতেন আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে। মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর নানা আশ্চর্য ভাষ্যে, ভরসা পেয়েছিলাম বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে তাঁর নানা অভয় আশ্বাসে। সেসব মনে নেই, কেবল মনে আছে যে, তিনি শুধু যে বারবারই আমার নানা সংশয়ের জট খুলে দিতেন তাই নয়, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র শান্তিপ্রবাহ বইয়ে দিতেন। মনে আছে কতবারই তাঁর কাছে গিয়ে বসতেই তাঁর অপরূপ হাসি ও চাহনিতে মেঘলা মনের ঘনঘটা কেটে ফুটে উঠত তাঁর নয়নতারা।

যোগের পথে থেকে নানা উপলব্ধির প্রণালী বেয়ে আসে অচিন্ত্য সমাধান। আমার জীবনে প্রথম আসে চতুর্থবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। এ-উপলব্ধিটির কথা আমার স্মৃতিচারণেই লিখেছি—শেষবার লিখেছি আমাদের ইংরাজী স্মৃতিচারণে PILGRIMS OF THE STARS-এ। তবু পুনরুক্তি হবে জেনেও ফের বলতে চাই সে-অবিস্মরণীয় অনুভূতিটির কথা। তবে একাধিকবার লিখেছি বলে সংক্ষেপেই বলব।

মনে পড়ে আজো সে আশ্চর্য শিহরণের কথা। দর্শনের পর গুরুদেব ও শ্রীমা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন শ্রীমার জন্মদিনে সকালে ২১এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ তারিখে।*

তারপর কি যে হ'ল বলবার ভাষা খুঁজে পাই না। তাই শুধু একটু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

আমার দেহে মনে যেন এক অচিন্ত্য আগমনীর সুর ব'য়ে গেল—কী মধুর সে সুর! প্রণাম ক'রে গেলাম দূরে নিরালায় সমুদ্রের দিকে।

সামনে উদার প্রশান্ত নীল সিন্ধু। আমি বালির উপর ব'সে একা। দেহের শিরায় শিরায় তো আর রক্ত বইছে না ব'য়ে চলেছে সাহেবি ভাষায়—ichor,

---

* সে সময়ে তাঁরা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতেন। পরে সাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে আশীর্বাদ মিলত শুধু তাঁদের চাহনির।

অমৃত ধারা। যেদিকে চাই যেন মধুক্ষরণ হচ্ছে। বৈদিক শ্লোক মনে পড়ল: "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—জলে স্থলে মধু ঝ'রে পড়ছে! কৃষ্ণকর্ণামৃতের "মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।" শুধু একটানা মধুপ্রবাহ। মনে হ'ল এর পরে আর কী চাইবার আছে? আমি যে আপ্তকাম। আকাশ বাতাস থেকে সুধা ঝরছে—সমুদ্রের জল তো নয়—সুরেলা নির্ঝরের ঝঙ্কার। সব পেয়েছির দেশে এসে গেছি বুঝি? তাই তাই তাই। এরই নাম কি বস্তুলাভ? জানি না। সংজ্ঞা নিয়ে কে মাথা বকায় যখন অন্তর গ'লে স্নিগ্ধ বিদ্যুতের স্রোতে চলেছে গা ভাসিয়ে! তবু হঠাৎ কে যেন আমাকে প্রশ্ন করল আমার বুকের মধ্যেই; "আচ্ছা, যদি তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে বর্ণনা করতে বলেন এ আনন্দ, কী বলবে তুমি?"

সঙ্গে সঙ্গে (বুকের মধ্যেই) উত্তর বেজে উঠল প্রতিপ্রশ্নে: "বলছি। মানুষ পার্থিব জীবনে সব চেয়ে কি ভালবাসে?"

প্রথম স্বর: "আলো আর হাওয়া।"

দ্বিতীয় স্বর খুশী হ'য়ে বলল: "ঠিক। এবার শোনো: যদি আমাকে কেউ এক অন্ধকূপে বন্দী ক'রে রাখে তাহ'লেও আমি এই আনন্দের মধ্যেই ডুবে থাকব। কোনো কিছুর আর অভাব নেই···শুধু পরমা শান্তি আর আনন্দ বিলাস। ব্যস।"

॥ চার ॥

ভাবলোক থেকে বস্তুলোকে নামি—আরো এইজন্যে যে, শ্রীঅরবিন্দের মহাবাণী: মর্ত্যলোকে অমর্ত্যের আলো নামিয়ে এনে মৃণ্ময়ী ধরাকে চিন্ময়ী করার জন্যেই যোগসাধনা।* শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে এসে এ-শান্তির তর্জমা দেখতাম প্রতিপদেই আশ্রমের আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলা ও সুষমায়। আমাদের দেশে অনেক আশ্রমেই দেখেছি এ-বিষয়ে গভীর ঔদাসীন্য। এক খ্যাতনামা আশ্রমের দুটি বিশিষ্ট সাধিকা আমাদের হরিকৃষ্ণমন্দিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে বলেছিলেন ইন্দিরাকে: "হুম্! কিন্তু আমাদের গুরুদেব বলেন—আসল কথা চিত্ত শুদ্ধি—বাইরের শুদ্ধি বাহুল্য—এমন কি শুচিবাইয়ের কোঠায় পড়ে বলা চলে।" নানা আশ্রমে গিয়ে দেখেছি জাজিমের ধুলোয় অতিথিদের পায়ের ছাপ, মাছির ভনভনানি, আবর্জনার অখণ্ড

---

* সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির অভীপ্সা (SAVITRI, 3. 2):
His single freedom could not satisfy,
Her light, her bliss he asked for earth and men
নিঃসঙ্গ মুক্তিতে আপনার শুধু তৃপ্তি না লভিয়া
চাহিতেন তিনি বিশ্ববাসী তরে মা-র শান্তি জ্যোতি।

রাজত্ব। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রতি সাধন কুটিরই প্রত্যহ ঝক ঝক করত—যেমন পরিষ্কার, তেম্‌নি পরিপাটি। শ্রীমা পই পই ক'রে সবাইকে নিষেধ করতেন অলস হ'তে। কোথাও যেন আমরা কেউ ক্লেদের লেশও না জমতে দিই। এমন কি, নানা দ্বারে ধাতুর হাতল থাকলে মেটাল পালিশ দিয়ে পরিষ্কার করা হ'ত। এযুগে পরিচারকদের চালনা হ'য়ে উঠেছে দুঃসহ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে প্রবেশ করতে না করতে চোখে পড়ত এক অদৃশ্য সর্বগামিনীর সদাসজাগ পরিকল্পনা—চত্বর, দেহলি, ঘরের মেজে, নানা আসবাব—সবই যেন গুণগান করত সেই মহিমময়ীর যাঁর অলক্ষ্য সূত্রের টানে সাধক সাধিকা কিঙ্কর কিঙ্করীরা উঠত বসত চলত ফিরত। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিই যেটি বাইরে থেকে দেখতে সামান্য হ'লেও আমার চোখে অসামান্য হয়েই প্রতিভাত হয়েছিল আমার আশ্রমে আসার ঠিক পরেই। আমি পেয়েছিলাম একটি চমৎকার বড় ঘর, দুধারে বারান্দা, ওধারে একটি ছোট ভাণ্ডার মতন। বারান্দা দুটির একটি সরণিমুখী, অন্যটি সমুদ্রমুখী। একদিন সকালে উঠে দেখি—এক সাধক ছাদে একটি পুলি লাগাচ্ছেন যার অন্তে একটি বিজলি বাতি। কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন: "মা বলেছেন আপনি বহুপাঠী, এই বাতিটি ইচ্ছামত ওঠাতে নামাতে পারলে আপনার লেখাপড়ার সুবিধা হবে।" আমার বুকে যেন অশ্রুসাগর দুলে উঠল। এ কী কাণ্ড! শ্রীমা তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁর কাজও অন্তহীন, দায়িত্বেরও অবধি নেই। এহেন আশ্রমনিয়ন্ত্রী কেমন ক'রে এত শত খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে পারেন? আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সবে প্রথম পর্ব, কিন্তু তিনি হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ভেবে আমি না চাইতেই ব্যবস্থা করলেন আমার আরামের! পুলিটির প্রসাদে আমার লেখাপড়ার কী যে সুবিধা হ'ল ব'লে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আজো ভুলি নি (প্রায় ছেচল্লিশ বৎসরের পরেও) যে একদা এক অপরিচিতা অতন্দ্রিতা মাতৃদেবী আমার সুখ-সুবিধার জন্যে এমন সুব্যবস্থা করেছিলেন! ঘটনাটি বাইরের লোকের কাছে ছোট মনে হ'তে পারে—কিন্তু আমার কাছে মাতৃদেবী বরদা শুভদা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রথম সেদিন সকালে। মনে হয়েছিল: "যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে।"

কিন্তু শুধু এই ব্যাপারেই নয়—সার্বজনীন খাওয়ার ঘরে প্রতি সাধকের আসনের সামনে একটি ক'রে টুল—প্রত্যেকের থালা হাতে এগিয়ে গিয়ে আহার্য গ্রহণ ক'রে বসা—প্রত্যেকের জন্যে একটি টিনে চিনির রেশন রাখা—পরে একের পর এক সাধক সাধিকাদের প্রতি ডিশ প্রক্ষালন করা—প্রথমে ঠাণ্ডা জলে, পরে গরম জলে—শেষে সন্তর্পণে মুছে যথাস্থানে ন্যস্ত করা—খুঁটিনাটি সে কি একটা? আর প্রত্যেকটিরই বিধান দিতেন এই সর্বময়ী আশ্রমধারিণী! কিন্তু এবার শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফিরি।

॥ পাঁচ ॥

যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে আমার একটা অভিনব সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে ১৯২৯ সালে তাঁকে চিঠি লেখা ও উত্তর পাওয়ার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে।* আশ্রমবাসী হওয়ার পরে আমি দিনরাত পড়তাম তাঁর নানা বই ও "আর্য" পত্রিকা। আর্য পত্রিকা সর্বত্র পাওয়া যায় না—মাত্র ছয় বৎসরে তার আয়ু শেষ হয়। কিন্তু এই আশ্চর্য মাসিক পত্রিকাটিই ছিল গুরুদেবের গ্রন্থাবলীর ভিত্তি তোরণ তথা শিখর। তাঁর ESSAYS ON THE GITA, LIFE DIVINE, SYNTHESIS OF YOGA, SECRET OF THE VEDAS, PSYCHOLOGY OF SOCIAL DEVELOPMENT (পরে গ্রন্থাকারে এটি ছাপা হয় HUMAN CYCLE শিরোনামায়), DEFENCE OF INDIAN CULTURE, IS INDIA CIVILISED, (এগুলি পরে একখণ্ডে ছাপা হয় FOUNDATIONS OF INDIAN CULTURE শিরোনামায়) বিবিধ দার্শনিক তথা চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা এই মাসিকীটিতেই ছাপা হয়। কিন্তু এসম্বন্ধে আর বেশি লেখার প্রয়োজন দেখি না যেহেতু নানা লেখকের নানা লেখায়ই এসব ঐতিহাসিক তথ্য মিলবে। আমি যথাসাধ্য সেইসব কথাই লিখব যা ব্যক্তিগত—স্মৃতিচারণের উপজীব্য তো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতাই বটে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে কত কী দিয়েছেন, নানা পত্রে তথা কথালাপে যার ফলে আমার জীবন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে সেই কথাই আমি বলতে চাই পরমানন্দে। জগতের নানা যশস্বীর সম্বন্ধে বেশি বলতে গেলে অত্যুক্তি হ'তে পারে বটে, কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া এই যে, এ মহাপুরুষের গুণগান যতই করি না কেন অত্যুক্তি হবে না—অর্থাৎ understatement-ই হবে, overstatement নয়। আমি তাঁর সম্বন্ধে আমার একটি গানে লিখেছিলাম :

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ, ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে।
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান, কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে?
না চাহিতে যে গো সকলি মিলিল অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে,
অতীতের দিশাচিহ্ন মুছিল নবীন-দিশারি-ছবি বরণে।

---

* তাঁর কাছ থেকে আশ্রমে আমি প্রথম চিঠি পাই ১৯২৯ সালে জুন মাসে : তাতে তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন : "People discuss these matters from a mental plane on which I no longer stand" (মানুষ এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে মানস স্তরে দাঁড়িয়ে—সে-স্তরে আমি আর আর নেই)

ছিল না যাহার কোনো দাবিদাওয়া তারে দিলে তব চিরন্তনে,
যা কিছু পেয়েছি সবি প্রিয়, পাওয়া তব চরণের অনুসরণে।

দিশারি কথাটি বড় সুন্দর। জীবনে প্রতিপদেই তো নানা ডাক আসে, এ টানে এদিকে ও—ওদিকে। এ আদর্শ-সংঘর্ষে কেবল একটি দীপঙ্করের আলোয় তীর্থপথের নির্দেশ মেলে—যাঁর নাম দিশারি। উপদেষ্টা মেলে অনেক কিন্তু দিশারি হ'তে পারেন শুধু জীবনদেবতা যাঁর প্রতিনিধি হ'য়ে আসেন গুরু, পথিকৃৎ। আমার কৈশোরে এসেছিলেন এমনি দিশারি প্রথম—শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপর—শ্রীঅরবিন্দ। একজন বীজ বুনে আড়াল থেকে আশীর্বাদ করতেন, আর একজন এগিয়ে এসে পথে বাতি ধরতেন নানা সংকটের দুর্লগ্নে, অন্ধকারের নিরাশায়। শ্রীঅরবিন্দ আমার কাছে এসেছিলেন এই ভাবে পথচলার পাথেয় হ'য়ে। তাঁকে পাওয়ার পরে আর কোনো দাতার কাছেই যে কিছু পাইনি এমন কথা বলব না। পেয়েছি অনেক কবি মনীষী দ্রষ্টা সাধুসন্তের কাছেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখতে পাই নি যাঁকে বসাতে পারি আমার হৃদয়মন্দিরের শেষ আসনে। এমন কথা বলি না যে, শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে সব সময়েই অটল আশ্বাস পেয়েছিলাম। আমাদের মন চঞ্চল, দোলায়মান, কখনো কখনো তাঁর অন্তরালবিলাসে ক্ষুব্ধ হয়েছে বৈ কি। বারবার অশান্তির ঘূর্ণীপাকে হাঁপিয়ে উঠে চেয়েছি তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে। কিন্তু কখনো এমন মনে হয় নি যে, আর কাউকে আমার গুরু ব'লে বরণ ক'রে বলতে পারি: "ত্বমেকো গতির্মে ত্বমেকো গতিঃ"—শুধু তুমিই আমার গতি অগতির গতি, আর কেউ নয়। আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষা অভীপ্সা জল্পনা কল্পনা তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই প্রদক্ষিণ করত যেমন পূজারী গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বার বার সংশয় এসে আমাকে অশান্ত করেছে, উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, বারবারই মনে হয়েছে—তাঁকে দিশারি ব'লে বরণ করব কেমন ক'রে যিনি সংকটলগ্নেও আড়ালে থাকেন—কাছে এসে বলেন না: "অয়মহং ভোঃ"—এই যে আমি! আমার মনে হয় নি কোনোদিনই যে, আদর্শ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে। আমার কৈশোরে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির আদানপ্রদানের অপরূপ দৃশ্যে। চেয়েছিলাম এম্‌নি গুরুই বটে। কিন্তু মানুষ যা চায় তার ষোলো আনা না পেলে যে সে তীর্থ পথের নির্দেশ পেয়ে প্রাণসাধনায় কৃতকৃত্য হ'তে পারে না একথা আর মনে ঠাঁই পায় নি যখন দিনের পর দিন শ্রীঅরবিন্দের কাছে পেতাম যা চেয়েছিলাম সর্বান্তঃকরণে—কখনো তাঁর নানা লেখায় কখনো তাঁর চিঠিতে, কখনো তাঁর কথালাপে।* কিন্তু পণ্ডিচেরিতে তাঁকে যেভাবে

* কথালাপ তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছিল তিনবার—তীর্থঙ্কর ও Among the Great দ্রষ্টব্য। কিন্তু এছাড়া একবার তাঁর সামনে ব'সে তাঁকে গান শুনিয়ে মেতে উঠেছিলাম—আর একবার যখন তিনি আমার অর্ঘ নিয়ে আমাকে এসে আশীর্বাদ করেছিলেন গভীর স্নেহে।

অন্তরে পেয়েছিলাম, তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর আরো গভীর স্নেহস্পর্শ আমাকে পদে পদে পথের পাথেয় দিত একথা বললে বিচক্ষণেরা উচ্ছ্বাস বলতে পারেন, কিন্তু যে পায় সে জানে কী পেয়েছে। পিতৃদেবের একটি গানের দুটি চরণ আমার মনে প্রায়ই বেজে ওঠে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান-স্মৃতিতে :

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার আশার অতীত গণি।
আমি আঁধারে পথের ধুলার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।

তাঁর কথা ভাবতে আমি শুধু "কুটিরে" না গেয়ে গাই "হৃদয়ে"। কারণ তিনি তাঁর দেহান্তের পরে সত্যিই হয়েছিলেন আমার হৃদয়বাসী—শুধু দিশারি নন, পরম বন্ধু, প্রাণপ্রিয়। তাঁর নানা নিবিড় আলিঙ্গন পেয়েছি স্বপ্নে, দেখেছি তাঁর অমল হাসি, চেয়ে থেকেছি তাঁর দেবনেত্রের পানে। কিন্তু এসবই আমার কাছে বহন ক'রে এনে দিয়েছে এক চিরন্তন আশ্বাস : মা ভৈঃ। আমি আছি, কৃষ্ণও আছেন। আর যার হৃদয়ে গুরুকৃষ্ণ উভয়েই আসীন তার ভয় কি—চুক্তিও যে দেবে তাকে পাথার বর?

উচ্ছ্বাস হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেল বা! তাই এবার ফিরি বাস্তবলোকে—পণ্ডিচেরি আশ্রমের প্রসঙ্গে বলি যা বলার আছে, অর্থাৎ সেই সব প্রাপ্তির কথা যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়—সাহেবি ভাষায় যাকে বলে objective data : কেবল মুস্কিল এই যে গুরুশিষ্যের গভীরতম সম্বন্ধের হদিশ মেলে না বস্তুভিত্তি, objective লোকে, মেলে কেবল অন্তরের প্রেমলোকে যা অমেয় অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয়। তবু যতটা বলা যায় বলি, যেহেতু বর্ণনাভাষ্যে আংশিকেরো সার্থকতা আছে।

॥ ছয় ॥

প্রথমেই বলেছি—আমি আমার আশ্রম জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কথাই বলব যা বলতে মন দুলে ওঠে। অর্থাৎ যা আঁধারে আলো দেয়, নিরাশায় আশা, কাঁটা-বনে ফুলের ভরসা। এ ও তা হাবিজাবি বর্ণনা—যা বাস্তববাদীদের আরাধ্য—না না না। আশ্রমে নানা হীনমতির হীন আচরণে ঘা খেয়েছি বৈ কি, কিন্তু জগতে হীন মতির দেখা তো সর্বত্রই মেলে। যোগাশ্রমের নির্দেশিকায়ও সেই চর্বিত চর্বণ করার বিড়ম্বনা কেন? কবি নিশিকান্তের "কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা" চরণটি আমার মনকে উস্কে দেয় প্রতিপদেই। তুচ্ছ কথার বেসাতি—ভাগবতের ভাষায় : "কিং তথা অসদালাপম্ আয়ুষাং যদসদ্ব্যয়ঃ?" শ্রীরামকৃষ্ণ

বলতেন গালগল্প হ'ল মনের বাজে খরচ। একদা আমি এই ভাব নিয়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমে একটি গান বেঁধেছিলাম—"ঐকান্তিক":

কোন্ ভাবে কে সাজায় ডালা, কার টানে কে কোথায় চলে,
কোন্ সাধে কে গাঁথে মালা, কার ঢঙে কে কথা বলে:
মনের বাজে খরচ এ তো,
থাকলে পুঁজি দেখা যেত,
আমার পুঁজি বন্ধু তুমিই—আর কিছু নয় ধরাতলে,
চিন্তা এখন হোক—যেন নাথ, তোমার পথেই চরণ চলে।

এ-ভণিতার দরকার আছে একটু। কেন—বলি। আশ্রমে এসে নানা সাধকের রকমারি মেজাজ—বিশেষ ক'রে ক্ষুদ্রতা দেখে সময়ে সময়ে সত্যিই যেন গালে হাত দিয়ে ভাবতাম শ্রীঅরবিন্দের দিব্য পরিমণ্ডলে এ-হেন ঈর্ষা দ্বেষ কাড়াকাড়ি হামবড়াই কেমন ক'রে বেঁচেবর্তে থাকে? তিনি তাঁর নানা চিঠিতে ও লেখায়ই কি লেখেন নি যে তিনি যোগের নানা দর্শনাদির জন্যে তত ভাবেন না যত ভাবেন আমাদের মানবচরিত্রের রূপান্তরের জন্যে? বারবারই তিনি আমাকে লিখতেন: "ধ্যানে তোমার আজো জ্যোতি বা মূর্তি দর্শন হ'ল না এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। এসবের মূল্য নেই বলি না, কিন্তু চরম সমাধান মিলতে পারে কেবল আমাদের প্রকৃতিকে ঢেলে সাজাতে পারলে। তোমার স্বভাব যে বদলাচ্ছে এতেই আমি আনন্দিত, দর্শন টর্শনের দুর্ভাবনা ছাড়ো। অনেকেরই দর্শনাদি হয় কিন্তু তাদের মূল প্রকৃতি থেকে যায় যে-তিমিরে সেই তিমিরে। আমি চাই সেই অপার্থিব আলোর অবতরণ যে পরশমণির মতন তার ছোঁয়াচে আমাদের গোড়াকার স্বভাবের ধাঁচ বদলে দেয়, কারণ এ-রূপান্তর না হ'লে আমার পূর্ণযোগে (integral yoga) সিদ্ধিলাভ অসম্ভব, আমি পৃথিবীতে যে নবজাগৃতির আনন্দ আনতে চাইছি সে আদৌ প্রতিষ্ঠা পাবে না।"*

বিষাদের নানা দুর্লগ্নেই আমার মন ব্যথিয়ে উঠত তাঁর সঙ্গে সামনা সামনি ব'সে কথালাপ করার সুযোগ মিলত না বলে। কিন্তু সেসময়ে একটি কথা ভেবে দেখি নি (যেকথা এমার্সন বলেছেন যে, জীবনে প্রায়ই ক্ষতির উল্টোপিঠে ক্ষতিপূরণ compensation থাকে) যে, যদি তিনি আমার সঙ্গে দিনের পর দিন আলাপ ক'রেই আমাকে আলো দিতেন তাহ'লে শুধু যে তাঁর অজস্র পত্রের মাধ্যমে যে-স্থায়ী

* আমি এখানে তাঁর নানা পত্রের শুধু চুম্বকটুকু পেশ করলাম। তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখেছেন প্রায় চার হাজার চিঠি। সেগুলির ফটোপ্রিন্ট শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে রক্ষিত আছে। তাঁর নানা চিঠিতেই পেতাম তাঁর অজস্র স্নেহ, অশ্রান্ত দেশনা (guidance) এবং ব্যক্তিরূপের দিব্য জ্যোতি। SRI AUROBINDO CAME TO ME ও YOGI KRISHNAPREM-এ এসব চিঠির কিছু পরিচয় দিয়েছি শুধু তাঁর স্নেহপ্রতিভার গুণকীর্তন করতে নয় তাঁর পরাপ্রজ্ঞার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করতেও বটে।

দীপ্তি অক্ষয় হ'য়ে আছে সে সঞ্চয়িতার বর পেতাম না তাই নয়, চিঠির মধ্যে দিয়ে তাঁর অক্লান্ত বাৎসল্য, মধুর মৈত্রী ও অপার আশীর্বাদ জমা থাকত না—যার সম্পদ অপরিমেয়। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁর নানা স্নেহোচ্ছল চিঠির ও অটুট ধৈর্যের প্রসাদ আমাকে যা দিয়েছে সে-অবদান কি অমূল্য নয়? কজন ভাগ্যবানের এমন সৌভাগ্য হয় জীবনে? শুধু মহাপুরুষের সান্নিধ্য নয়, এমন কি আশীর্বাদও নয় —তাঁর সম্বোধন "my friend and my son" বলে! এ-পত্রটির পটভূমিকার কথা একটু ফলিয়েই বলি কারণ সত্যিই এ বলবার মত। আমি চেয়েছিলাম ক্ষোভবশে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে—উত্তরে পেয়েছিলাম তাঁর অবর্ণ্য স্নেহের সাড়া—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায়—"যেতে নাহি দিব"; ছাড়তে চায় যে ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী তাকে বলা: "তোমার সাধ্য কি যে যাবে—তুমি যে আমার প্রিয়"—গীতার ভাষায় "প্রিয়োঽসি মে।"*

কিন্তু এর ভাষ্য দিতে হ'লে একটু ভূমিকা না কবলেই নয়।

আমি শ্রীঅরবিন্দকে কেন ভুল বুঝতাম বারবার মূলে তার দুটি কারণ। একটি—আমি যোগ সম্বন্ধে ছিলাম অজ্ঞান আর অজ্ঞানেরা অজ্ঞান ব'লেই জানে না যে, তারা অজ্ঞান, দ্বিতীয়— আমি ছিলাম অত্যন্ত ঝোঁকালো মানুষ(impulsive), আর ঝোঁকের পরিণাম মূঢ় রোখ, রোখের পরিণাম মতিভ্রম। কিন্তু এ-সূত্রে আমার একটি অমূল্য লাভ হয়েছিল এই যে, আমি তাঁর অগাধ স্নেহ ও অহেতুক করুণার মর্মজ্ঞ হ'তে পেরেছিলাম। পরে আমি এ উপলব্ধিটির রূপ দিই একটি কবিতায় (মধুমুরলী):

> যদি অপরাধ না করিত পাপী—কৃপার মহিমা জানিত কি সে?
> স্খাতসলিলে ডোবে নি যে—তুমি তারক কেমন জানিত কি সে?
> মলিন ধুলায় হয় নি যে—প্রেমগঙ্গাস্নানে তোমার, প্রভু,
> অশুচি যে হয় অমল পলে—এ-উপলব্ধি কি লভিত কভু?

আমার মনে এই একটা দৃঢ় ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল যে, যোগের প্রগতি হয় নানা দর্শনাদিরই ফলে—যার ইংরাজী নাম vision. কিন্তু আমার ধ্যানের বাগানে কোনো দর্শনফুলই ফুটত না ব'লে আমি বার বার ধ্যানে ব'সে "বৃথা বৃথা" ব'লে ব্যথিত হতাম বিষণ্ণচিত্তে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বারবার সাবধান ক'রে দিতেন ভুল ভেঙে দিতে চেয়ে, কিন্তু আমি তবু মোক্ষম আঁকড়ে ধ'রে থাকতাম আমার নানা দৃঢ়মূল ভুল ধারণা। শেষে হ'ল বিস্ফোরণ বিদ্রোহ। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন আমাকে যে, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে আমার এক অবোধ গোঁ যে, যোগে দর্শনাদি না হ'লে সব

মাটি। আমি রুখে উঠলাম, বললাম: "তাহ'লে গুরুদেব, আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়—আমি পারছি না ধ্যানের শূন্য বালুচরে কল্পনার পরীপ্রাসাদ বানাতে। শ্রীঅরবিন্দ বোঝালেন: সে কি কথা? যোগে তোমার কবিতার উৎস খুলে গেছে, গানে উন্নতি হয়েছে, অন্তরে নানা সঙ্কটে আশ্চর্য শান্তি নেমেছে—সব ভুলে গেলে? কিন্তু আমার বিমুখ মন সমানে মাথা নাড়ে: উঁহুঃ, গুরুদেব আমাকে সুমিষ্ট প্রবোধ দিচ্ছেন যেমন ডাক্তারে দেয় মরণাপন্ন রোগীকে। আজ দেখতে পাই এ-মূঢ়তা কেন আমাকে থেকে থেকে পেয়ে বসত। কিন্তু সে-সময়ে আমি মূলত এরি তাপের তাড়সে প্রলাপ বকতাম। শেষে তাঁকে দিলাম আলটিমেটাম: আমি আপনার যোগের অধিকারী নই, তাই চলি।

উত্তরে তিনি লিখলেন একটি মর্মস্পর্শী চিঠি—অমনি আমার বিকার কেটে গেল—আমি দেখতে পেলাম আমার গোঁয়াতুর্মির বহর। গুরুদেব লিখলেন (১৬ ৫ ৩২): **"You do not belong to your myself—you belong to the Divine and myself and the Mother. I have cherished you like a friend and a son and have poured on you my force to develop your powers—to make an equal development in the yoga. We claim the right to keep you as our own here with us."**

[তোমাকে এখন ভগবান্ স্বয়ং পেয়ে বসেছেন, সেই সঙ্গে আমি ও শ্রীমা-ও পেয়েছি সে-অধিকার। আমি তোমাকে বরণ করেছি বন্ধু ও দুলাল ব'লে। তোমার নানা নিহিত শক্তির আমি উদ্বোধন করেছি আমার প্রভাবে—যোগেও তোমার তেমনি প্রগতি হবেই হবে, তাই আমি দাবি করবই করব তোমাকে আমাদের কাছে ধ'রে রাখতে আপনজন ব'লে লালন ক'রে।]

প'ড়ে আমার বিদ্রোহ গ'লে গিয়েছিল চোখের জলে। যাবে না? সাক্ষাৎ শ্রীঅরবিন্দ—মহামানব, যুগর্ষি, মহাকবি—যাঁর মহিমা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল সাংসারিক জীবন থেকে, যাঁর চুম্বকশক্তি আমাকে টানত আমার প্রাক্‌যৌগিক জীবনেও, যাঁর নানা কবিতায় নিবন্ধে ভাবধারায় স্নান ক'রে আমি বারবারই নিজেকে ধন্য মনে করেছি—তিনি আমার মতন ঝাঁঝালো রোখালো অবোধকে মান দিতে পারেন তাঁর "দুলাল ও বন্ধু" বলে! এরই তো নাম ছায়াস্বপনের জাগরণে কায়া ধরা—**dream come true**!

আর শুধু এই চিঠিটিই তো নয়—চিঠির পর চিঠি অশ্রান্ত নির্ঝরে—জানানো স্নেহের অঙ্গীকারে: তোমাকে আমি ছাড়ব না, তোমার প্রাণসাধনার পথে তোমাকে ঠেলে পৌঁছিয়ে দেবই দেব তীর্থলক্ষ্যে যাতে ক'রে তুমি জেগে উঠতে পারো নিশার

আঁধার থেকে উষার সোনার আলোয়, তোমার প্রাণের নিহিত পূজার দলগুলি মেলে ধ'রে বরণ করতে পারো সেই নীলমণিকে যাঁর জন্যে আমাদের জন্ম, যাঁর মিলন বিনা অন্য সব প্রাপ্তিই থেকে যায় বিফল বিষণ্ণ। আর কতবারই না মাত্র দুএকটি লাইনে ঝরাতেন তাঁর আদরের ঝর্ণাধারা! একবার লিখেছিলেন (ডিসেম্বর, ১৯৩৪): "আমার সামনে যখন রাতে নানা সাধকদের চিঠি জড়ো হয় তখন আমি সব আগে খুঁজি তোমার চিঠি। আমি তোমার দ্বিতীয় 'আর্জেন্ট' চিঠিটির কথা জানতে পেরেছিলাম তোমার তৃতীয় চিঠিটি পাবার পরে—নিশুত রাতে। যদি আগে পেতাম তবে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতাম। তোমাকে যে সারারাত আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে এজন্যে আমি দুঃখিত।" আর একটি চিঠিতেঃ আমার সময় হয় না এমন নয়। এমন দিন যায় না যেদিন আমি তোমার পানে আমার যোগশক্তিকে না নিয়োগ করি—যাতে তোমার নানা পথের বাধা কাটে। (Want of time does not come in the way, as there is no day on which I do not devote some time to thinking of you and concentrating on you. May 1933)

পক্ষান্তরে কী চমৎকার প্রত্যুত্তর দিতেন সময়ে সময়ে! একবার আমি তাঁকে লিখেছিলাম হাল্‌কাসুরে যে, আমার ভালো লাগে ভগবান যখন মানুষী তনু ধরেন তার সাঘাতিক কূটস্থ রূপকে বাতিল ক'রে। পিঠ পিঠ তিনি জবাব দেন (১৪ ২.৩২): "তোমরা সবাই কেবলই আবদার ধরো ভগবান মানুষ হ'য়ে মানবিক চেতনায় বেঁচে থাকুন, কিন্তু মানুষকে ভাগবতী চেতনায় উত্তীর্ণ করতে চাইবামাত্র না না ক'রে শোরগোল তোলো"। ["Again you all insist on the Divine becoming human, remaining in the human consciousness, but protest against any attempt to make the human divine !" 14 2 32]

কখনো বা দুকথায় বুঝিয়ে দিতেন কোনো সমস্যার আশু সমাধানের দিশা মেলে কোন পথে। একবার আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি—জ্ঞান জ্ঞান ক'রে এত সোচ্চার হ'য়ে হবে কী যখন দুঃখশোকের যন্ত্রণা মানুষকে পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে? উত্তরে গুরুদেব লিখলেনঃ "জ্ঞান যখন আমাদের কোনো সঙ্কটের মূল আবিষ্কার করে তখন তার মধ্যে সক্রিয় হয় এক আশ্চর্য দুঃখনিবৃত্তির শক্তি। ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে যেই দুঃখব্যথার নিদানে পৌঁছই, দেখি—দুঃখ উবে গেছে যেন এক ইন্দ্রজালে!" ("For knowledge when it goes to the root of our troubles has in itself a miraculous healing power as it were. As soon as you touch the quick of the trouble, as soon as you, diving down and
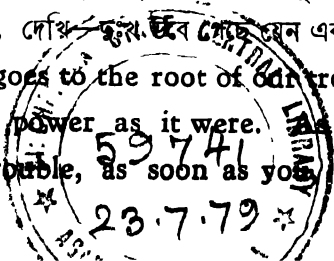
down, get at what really ails you, the pain disappears as though by a miracle!")

আর একবার কোনো কোনো সাধকের আচরণে ঘা খেয়ে গুরুদেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, এ-ধরণের চ্যুতিকে যারা চ্যুতি মনে করে না তাদের নানা স্খলনকে তিনি স'য়ে থাকেন কেমন ক'রে? উত্তরে তিনি লিখেছিলেনঃ "My experience shows me that human beings are much less deliberate and responsible for their acts than the moralists, novelists and dramatists make them and I look rather to see what forces drove them than what the man himself may have seemed by inference to have intended or proposed—our inferences are often wrong and even when they are right touch only the surface of the matter."

[ভাবার্থঃ নীতিবাদী, ঔপন্যাসিক নাট্যকারেরা মানুষকে তার কর্মের জন্যে যতটা দায়িক ক'রে থাকেন আসলে তারা ততটা দায়িক নয়। আমি জোর দেই সেই গভীর দৃষ্টির 'পরে যার প্রসাদে দেখতে পাওয়া যায় কী ধরণের তাড়নায় তাদের পদস্খলন হয়। তাদের নানা ত্রুটি চ্যুতির সম্বন্ধে যে-সব সিদ্ধান্ত আমরা সচরাচর ক'রে থাকি তারা প্রায়ই বেঠিক, আর ঠিক হ'লেও খতিয়ে উপরভাসাই বলব।]

কখনো কখনো দুকথায় দিতেন নানা স্ববিরোধের সমাধান। একদা আমি তাঁকে লিখি যে, ছন্দে নতুন কিছুর প্রবর্তন করতে গেলেই গতানুগতিকদের দল হৈ হৈ ক'রে ওঠেন—এমন কি নবছন্দ রসাল হ'লেও। উত্তরে গুরুদেব লেখেনঃ "তাবটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সমান সত্য যে, আমাদের সব মানবিক প্রচেষ্টারই বিকাশ প্রসার সমৃদ্ধির জন্যে আমাদের মন বা শ্রুতি চায় নূতনত্বের চমকঃ Novelty is difficult for the human mind or ear to accept, but novelty is asked for all the same in all human activities for their growth, amplitude, richer life (২৮.১.৩৩)"

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—নিয়তিকে ঠেকাবে কে? তাই তাঁর নিরন্ত আশ্বাসের পরেও আমি থেকে থেকে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতাম, মনে হ'ত হয়ত শেষরক্ষা হবে না, আর তখন আমার মতন অযৌগিক আগন্তুক অনাদৃত ত্রস্ত হ'য়ে উঠবেই উঠবে। বলা বাহুল্য, এর মূলেও ছিল আমার সূক্ষ্ম অহমিকা যে চাইত তাঁর আদর কাড়তে। তিনি নিশ্চয় দেখতে পেতেন এসবই। কিন্তু এমনি ছিল তাঁর অহৈতুকী কৃপা, অমল স্নেহ যে আমাকে বার বার ফিরে ফিরে দিতেন একই ভরসা যে আমার প্রতি তিনি বিরূপ

হবেন না, হবেন না, হবেন না : "You need not think that anything can alter our attitude towards you. That which is extended to you is not a vital human love which can be altered by external things : it remains and persistently we shall try to help and lift you up and lead you towards the light where in the union of soul and heart you will recognise the Friend and the Mother",

[তোমাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখেছি তার বদল হবে না গো ! তোমাকে আমরা যা দিতে চাইছি তা তো কোনো চঞ্চল মানবিক প্রীতি নয়—বাহ্য পরিবেশ বদলালে যার ভোল বদলে যায়। সে অটল, অচল। আমরা নিরন্তরই চাইব তোমার সাধনার সহায় হ'য়ে তোমাকে দিব্য জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করতে যেখানে তোমার অন্তরাত্মা ও হৃদয় চিনতে পারবে চিরসাথীকে ও মা-কে।)

॥ সাত ॥

আমি কিছু ভেবেচিন্তে কোমর বেঁধে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের মহিমার অশ্রুকণ্ঠী গুণগান করতে চাই নি—অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগে। শেষের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন নতুন ক'রে শুনি তাঁর স্নেহস্বরধুনীর রেশ স্মৃতির শ্রুতি-সৈকতে। দেখতে পাই যেন আরো স্পষ্ট ক'রে তিনি আমাকে কী অজস্র আশা—ভরসা জ্ঞান আলো—সর্বোপরি তাঁর অমেয় স্নেহ দিয়ে ধন্য করেছিলেন। একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি একা আমাকে তাঁর প্রেমপক্ষপুটে টেনে রেখেছিলেন আমার হাজারো কামনা বাসনার টানকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে। আমার প্রকৃতি ছিল বহুমুখী, নিত্যবিক্ষিপ্ত। কিন্তু তবু তাঁকে আমি বরণ করেছিলাম আমার প্রাণের নায়ক ব'লে—আর এমন নায়ক যাঁর জন্যে আমি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন এমন কি আমার আদরের গীতসাধনাও ছাড়তে রাজী হয়েছিলাম। কেমন ক'রে এহেন অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল—বিশেষ যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লেন দেন হ'ত না, শুধু পত্রের মাধ্যমেই চলত আদান প্রদান ? এ-প্রশ্নের পরিপাটি উত্তর আমি দিতে পারব না। আমরা কি জানি আমাদের স্বরূপ ? তাই শুধু এইটুকু ব'লেই এ-ভাষ্যের সমাপ্তি টানব যে, আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে। এক গভীর বেদনার অন্ধকারে অনুযোগ ক'রে লিখেছিলাম একটি কবিতা চল্লিশ বৎসর আগে :

বেসেছি তোমাকে ভালো—যে-তুমি জ্বেলেছ আলো এ-প্রাণে কৃপায়।
শিশুকাল হ'তে আমি চেয়েছি দিবসযামী তোমার চরণ।
অশান্ত বাসনা যবে রঙ্গমুগ্ধ কলরবে করেছে আমায়
উদ্‌ভ্রান্ত—সে-দুর্লগ্নেও তোমারেই জানি প্রেয় করেছি বরণ।

কতদিন মনে মনে করেছি যে সঙ্গোপনে তোমার অর্চনা,
কুমারী যেমন করে শিবপূজা পতিতরে—না দেখি তাহারে ;
অলক্ষ্য গুরুর শিখা আমাকে পরাক টিকা—করেছি প্রার্থনা,
রজনী যেমন করে প্রার্থনা উষার তরে বিরহআঁ-ধারে।

পঙ্কগ্লানি হ'তে মুক্তি চাহি নি কি গুরুভক্তিব্রতে—গেয়ে গান :
"তোমার আশিসে জিনি' তুফানতর্জন, চিনি' তোমায় কাণ্ডারী,
চলিব তোমার দিশা বরি'—জপি' প্রেমতৃষা রজনীবিহান ?"
বহুজন্মপুণ্যফলে সে-তুমি অন্তরতলে এসেছ, দিশারি !

কোরো ক্ষমা এ-দুর্যোগ—যদি করি' অনুযোগ কাঁদি অভিমানে :
"যে সুদূর আকাশের বিহঙ্গ সে এ-মর্ত্যের ব্যথার কী জানে ?

আমার "মধুমুরলী" কাব্যগ্রন্থে এ-কবিতাটির পটভূমিকা (context) দিয়েছি। তাই শুধু সংক্ষেপে এইটুকু ব'লেই থামব যে, আমার মনে একটি অনপনেয় দুঃখ ছিল তাঁর দেখা সাক্ষাৎ পেতাম না ব'লে। আমি পণ্ডিচেরি গিয়েছিলাম শুধু তাঁরই টানে। সেখানে আনন্দ পেয়েছিলাম অগাধ—বিশেষ ক'রে তাঁর প্রেমস্পর্শে। তিনি আমাকে একবার লিখেছিলেন যে, আমাকে তিনি যত চিঠি লিখেছেন তত চিঠি আর কাউকেই লেখেন নি। আরো লিখেছিলেন পরে—যখন তিনি সাধকদের প্রাত্যহিক চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন—যে, আমাকে তিনি চিঠি লিখে চলবেন কেন না আমার কাছে যে তাঁর চিঠি মরুভূমির পথিকের কাছে তৃষ্ণার জলের সামিল তা তিনি জানেন। আমি সাশ্রুনেত্রে তাঁকে লিখেছিলাম : আপনার লিখতে কষ্ট হ'লে আপনি লিখবেন না—যদিও জানতাম তিনি লিখবেনই লিখবেন। কিন্তু সে যাক, এ-সূত্রে আমি বলতে চাইছি শুধু এই কথাটি যে, আমি তাঁর অদর্শনের দুধের সাধ যে চিঠির ঘোলে কিছুটাও মেটাতে পেরেছিলাম তার কারণ—তাঁরই স্নেহের দৈবী শক্তি ঘটিয়েছিল এ-অঘটন। আমি পণ্ডিচেরিতে নানা ভুল করলেও তাঁর স্নেহকে কখনো মানবিক ব'লে ভুল করি নি এইজন্যেই যে তাঁর প্রেম যে মানবিক প্রেম নয় এটুকু আমার অবোধ মনও চোখের

জলে শুধু মেনে নিয়েছিল নয়, মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম, যেকথা তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁর একটি পত্রে (এপ্রিল, ১৯৩৪) :

"If is only divine love which can bear the burden I have to bear, that all have to bear who have sacrificed everything else to the one aim of uplifting earth out of its darkness to the divine. The Galileo-like 'Je m'en fiche'-ism (I do not care) would not carry me one step."

শ্রীঅরবিন্দ দৈবী প্রেমকে কী ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এ-পত্রে তার ঈষৎ আভাস দিয়েছেন বিশেষ ক'রে এই মহাসত্যটির 'পরে জোর দিয়ে যে, যাঁরা ধরণীর দুঃখনিবৃত্তি চান তাঁরা ধরণীকে পাশ কাটিয়ে সমাধির সুখে মগ্ন হ'য়ে থাকতে পারেন না, চান প্রতিপদেই পার্থিব দুঃখকে বহন করতে দৈবী প্রেমের তাগিদে, কেন না কেবল দৈবী প্রেমই এ-গুরুভার বহন করতে পারে, যাকে মানুষ প্রেম প্রেম ব'লে ঢাক পিটোয় সে-প্রেম বেশি সইতে হ'লে নেতিয়ে পড়েই পড়ে। তাই—গেয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ—মহাপ্রাণ যাঁরা তাঁরা বলতেই পারেন না—মানুষের দুঃখে তাঁদের প্রাণ কাঁদে না, বললে তাঁরা প্রেমের দুরভিসারে এক পা-ও এগুতে পারতেন না। এই দীপ্ত বাণীটি তিনি বিশদ ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) দেবর্ষি নারদের মুখে :

The great who come to save this suffering world···
Must pass beneath the yoke of grief and pain···
On their shoulders they must bear man's load of fate···
Exempt and unaffected by earth's fate,
How shall he cure the ills he never felt ?
He carries the suffering world in his own breast ;
Its sins weigh on his thoughts, its grief is his :
Earth's ancient load lies heavy on his soul···
His march is a battle and a pilgrimage.

আসেন মহানুভব যাঁরা এই আর্তা ধরণীরে
করিতে উদ্ধার—হবে তাঁহাদের করিতে বহন
জীবের যন্ত্রণা যত। নিয়তির গুরুভার হ'তে
যদি তাঁরা পান অব্যাহতি তবে দিবেন কেমনে
মুক্তি বসুধারে তার লক্ষ জ্বালা হ'তে—যাহাদের

সাথে হয় নাই পরিচয় তাঁহাদের ? ধরিত্রীর
পাপ তাপ করে ক্লিষ্ট চিন্তারে তাঁদের, আর্তি তার
করেন ধারণ তাঁরা আপনার বলি', পৃথিবীর
সনাতন গুরুভার করেন বহন গূঢ়প্রাণে।
পদযাত্রা তাঁহাদের তীর্থযাত্রা হয় প্রতিপদে
পার্থিব ত্রিতাপ সাথে ঘোষিয়া সংগ্রাম ক্লান্তিহীন।

আমি জানি—বস্তুবাদী রিয়ালিস্টরা এধরণের কবিত্বকে উচ্ছ্বাস ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবেন—আত্মিক রণঘোষকে 'অবাস্তব' নাম দিয়ে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিশ্বের দুঃখশোক দুর্বিষহ মনে হ'ত ব'লেই তিনি আত্মিক যোগশক্তির আবাহন করতে চেয়েছিলেন—প্রথম দিকে বিপ্লবীদের নায়ক হ'য়ে কারাবাস বরণ ক'রে, তারপরে কারাগৃহে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পেয়ে রাজনীতি ছেড়ে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন হ'য়ে। আমাকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি কোনোদিনই নিজের একক মুক্তি-সাধনাকে বরণ করেন নি বিশ্ববিচ্ছিন্ন পরমানন্দের আবেশে মশগুল হ'য়ে থাকতে। তিনি বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে যোগদীক্ষা চেয়েছিলেন যোগশক্তিবলে ভারতের রক্তশোষক বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করতেই। তারপর তাঁর চোখের সামনে খুলে যায় এক অদিগন্ত জ্যোতির্লোক যার প্রসাদে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের পার্থিব চেতনাকে ঊর্ধ্বায়িত করতে—দেখতে পেয়ে যে, এ-মহা-উত্তরণ শুধু যে সম্ভব তাই নয়, মানবিক চেতনাকে তার মর্ত্য সীমা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে কোনো স্থায়ী আনন্দরাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না এ-অপল্কা মাটির ভিতে। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের মৃন্ময়ী মা-কে তিনি হেনস্থা করতে চান নি, বারবারই ঘোষণা করেছেন যে, এই মর্ত্যলোকে শাশ্বত অমর্ত্য চেতনার আবাহন ক'রে পৃথিবীকে স্বর্গের পদবী দিতেই মানুষকে চাইতে হবে যার ফলে

> The sprit shall look out through Matters gaze
> And Matter shall reveal the spirits' face.*

তাঁর বিখ্যাত Life Heavens কবিতাটিতেও তিনি এই মহাবাণীই দিয়েছেন ঝংকৃত প্রস্বনে :

> I, Earth have a deeper power than Heaven ;
> My lonely sorrow surpasses its rose-joys,
> A red and bitter seed of the raptures seven ;—
> My dumbness fills with echoes of a far voice.

* মৃণ্ময়ীর দৃষ্টিদীপে জ্বলিবে চাহনি চিন্ময়ীর,
প্রকাশিবে চিন্ময়ীর মুখ মৃণ্ময়ীর প্রতি অণু। (Savitri. Book II)

এ-কবিতাটির মনোজ্ঞ অনুবাদ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের এক প্রিয় শিষ্য ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (মণি) ঃ

আমি পৃথ্বী, স্বর্গ হ'তে গূঢ়তম শক্তি আছে আমার অন্তরে,
আমার নিরালা ব্যথা ওই স্বর্গসুখ হ'তে বহু উর্ধ্বে রাজে,
রক্তরাঙা মধুতিক্ত সপ্ত পুলকের রাজ্য মোর মর্ম ধরে,
মূক মোর এ-আত্মায় দূর এক আহ্বানের প্রতিধ্বনি বাজে।

কথায় কথায় স্মৃতিচারণ থেকে বহুদূরে স'রে এসেছি। তাই ফের স্মৃতির থেই ধরি। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা। পটভূমিকাটি এই ঃ কোনো সাধিকা আমার কাছে এসে একদিন খুব কান্না-কাটি করেন। তাঁকে আমি ভরসা দিয়ে বলি ইংরাজীতে ঃ **"However feeble the day, the flower is in the bud and it will blossom."** (মাটি যতই কেন না অসহায় হোক যে-ফুলটি লুকিয়ে আছে কুঁড়ির তলায় সে ফুটবেই ফুটবে) শ্রীঅরবিন্দকে সাধিকাটির দুঃখের কথা জানিয়ে লেখাতে তিনি আমাকে লেখেন ঃ

"তুমি তাকে ঠিকই বলেছ, বিশেষ ক'রে তোমার সান্ত্বনাটি (**However feeble··· blossom**) একথাটি শুধু প্রতি মানুষের সম্বন্ধেই নয় এ-বিশ্বভুবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। **Earth is a feeble clay for the spiritual planting, but all the same it buds eventually and the bud, once there, will blossom."**

(মৃন্ময়ীর মাটিতে অধ্যাত্ম চাষে ফসল ফলানো সহজ নয়, কেন না সে-মাটি ভঙ্গুর, তবু কুঁড়ির নিচে ফুল আছে ব'লে অন্তিমে সে ফোটেই ফোটে।)

এই ফোটার প্রসঙ্গে আর একটি চিঠিতে তিনি সস্নেহে লিখেছিলেন : **"You cannot doubt but that we will help you through and watch over you with the greatest love and care. Beyond the storm we must look to a summer beyond".**

পদে পদেই তিনি এই ভাবে মনে করিয়ে দিতেন তাঁর করুণাসজল, আশিসস্নিগ্ধ সদা সজাগ স্নেহসতর্কতার কথা। আর কতশত কাজের মাঝে !

॥ আট ॥

শ্রীঅরবিন্দের কথা যখন ভাবি তখন সব আগে মনে হয় আমার তাঁর অপার স্নেহ কোমলতার কথা, তারপরে তাঁর তুঙ্গ প্রজ্ঞার, যার জ্যোতি তাঁর অজস্র নিবন্ধে কাব্যে

ও পত্রাবলীতে যেন বান ডাকিয়ে চলেছে পদে পদে চম্‌কে দিয়ে। এছাড়া ভাবতেও আবেগ জাগে তাঁর অটল ইচ্ছাশক্তি ও আশ্চর্য ব্যক্তিরূপের কথা যে-ব্যক্তিরূপ রবীন্দ্রনাথের মতন মহামানবকেও বলিয়েছিল: "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" আমাকে কবিগুরু বলেছিলেন পাঁণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখার পর: "তিনি একটি দীপ্তির মধ্যে রয়েছেন দেখলুম।"

ভাষায় এ-দীপ্তির বর্ণনা সম্ভব নয়। আমরা উজিয়ে উঠতে পারি তার মহিমার ও মাধুর্যের কথা বলতে—বলার প্রয়োজনও আছে, পূজনীয়ের স্তবগানে মন আনন্দ ও শক্তির বর পায় বৈকি—কিন্তু দৈবী দীপ্তি প্রজ্ঞা প্রীতি করুণার কথা যতই বলি না কেন মন শেষে বলেই বলে: "মেনেছি হার মেনেছি।" তাই এবাব আমি যতটা পারি ভাবোচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে বলব আমার আশ্রমজীবনের কিছু কথা যার মাধ্যমে আমি তাঁর মহিমময় সত্তার সংস্পর্শে এসেছিলাম।

তাঁর পত্রাবলীর অজস্রতার কথা প্রথমেই এসে গেছে। ভেবেছিলাম এ-সম্বন্ধে পরে সাজিয়ে লিখব যথা পর্যায়ে—কারণ তাঁর পত্র-পর্ব আমার আশ্রমজীবনের আদি-পর্ব নয়। তাই পেছিয়ে গিয়ে স্থরু করি যথাসম্ভব প্রথম থেকে—(২২এ নভেম্বর, ১৯২৮)—যেদিন আমি আশ্রমে পৌছই।

একটি সাধক এসেছিলেন স্টেশনে—কে, মনে নেই। তবে মনে আছে আমার মন ভ'রে ওঠার কথা যখন পৌছলাম ফরাসী কোষাগার-ভবনেব পাশে আমার আবাসে দোতলার ঘরে। সামনের প্রাঙ্গনে একটি—বোধহয় বকুল গাছ। দোতলায় আমার ঘরের পূর্বদিকে সাগরমুখী বারান্দায় পা দিতেই মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। অদূরে নীলাঞ্চলা আদিজননী কলোর্মিলা। ঘরে চেয়ার টেবিল খাট মশারি তোষক এমন কি একটি আরাম কেদারাও যেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। কে বলবে— বিদেশ বিভূঁয়ে এসে পড়েছি। মনে পড়ল শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত শিবশান্ত মূর্তি, আর শ্রীমার স্নিগ্ধ মধুর কান্তি। যেন ঘরে বেজে উঠল উভয়েরই সম্ভাষণ—"স্বাগতম্!"

তাবপর ক্রমশ নানা সাধক সাধিকার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে স্থরু হ'ল আমার বহুবাঞ্ছিত যোগজীবন। কী আনন্দ! কী চমক—আবেশ—শান্তি!

অতঃপর কর্মস্থচী। এর কিছু কিছু বদল হয়েছিল পরে। তাই মনে রাখা চাই যে, আমি এখানে বলছি ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০ সালের কথা। পত্রপর্বের শুরু হয় ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি। আমার দপ্তরে তাঁর টাইপ করা চিঠি রক্ষিত আছে ১৯৩০ সাল থেকে। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে। আগে বলি কীভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার রথ চলত সে-সময়ে।

(১) সকালে উঠে প্রথমেই যেতাম আমরা সবাই—শতাধিক সাধক সাধিকা—

শ্রীমাকে প্রণাম করতে। তিনি ধ্যান করতেন একটি অনত্যুচ্চ কাষ্ঠাসনে ব'সে আমাদের ধ্যানে দীক্ষা দিতে। আধঘণ্টা ধ্যানের পরে আমরা একে একে গিয়ে তাঁর পায়ে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করতাম আব তিনি প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে একেকটি ফুল দিতেন—রকমারি ফুল—শিউলি, জবা, গোলাপ, স্থলপদ্ম···তুলসী মঞ্জরীও দিতেন। প্রত্যেক ফুলটি ছিল যেন একেকটি আত্মিক প্রতীক, যথা গোলাপ—আত্মসমর্পণের, শিউলি—অভীপ্সার (aspiration), তুলসী—ভক্তির···

ফুল পেয়ে শ্রীমার আশীর্বাদ শিরোধার্য ক'রে প্রথম দিকে প্রতিদিনই মন এক অচিন আনন্দের আবেশে ভরপুর হ'য়ে থাকত—মনে হ'ত যেন শ্রীমা তীর্থপথে প্রতিদিন এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে দিলেন।

(২) ফিরে এসে ফস্কো ওবফে কোকো সেবন—সে সব হাল্কা বর্ণনা থাক। নানা গ্রন্থেই লিখেছেন নানা সাধক।

(৩) মা আমাকে কখনো কখনো ডাকতেন পূর্বাহ্নে। আমি গিয়ে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতাম, তিনি উত্তর দিতেন—যেমন মধুর তেমনি প্রাঞ্জল ফরাসী ভাষায়। প্রতিদিনই তাঁর স্পর্শপ্রসাদ, স্নিগ্ধ হাসি ও গভীর চাহনি আমাকে আবিষ্ট করত। তখনো তো নিজের অহন্তার সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে হয় নি, তাই চলতাম কবি নিশিকান্তের ভাষায়ঃ "এখন শুধু সুখের তালে চলছে তরী ভরা পালে—আপন ভুলে কূল অকূলের মাঝিব মুখে আছি চেয়ে।"

(৪) তারপব প্রতি সাধকই ক'রে চলত তার নির্দিষ্ট কাজ, আশ্রমের কাজ, বলাই বাহুল্য। কেবল আমাকে ও মণিকে (সুবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) আশ্রমের কোনো কাজ দেওয়া হয় নি, আমরা লেখাপডা ও গানসাধনায় ডুবসাঁতার কাটতাম।

(৫) তুপুরে ভোজনালয়ে ভোজন।

(৬) সন্ধ্যায় সান্ধ্য আহার।

(৭) অতঃপব শ্রীমা-ব সঙ্গে ফেব ধ্যান সন্ধ্যাবেলা। এ-ধ্যানচক্রে শ্রীমা অল্পক্ষণ ধ্যান ক'রেই প্রত্যেককে আশীবাদ করতেন ও 'সুপ' পরিবেশন করতেন। সে-বর্ণনা ফলিয়ে করার প্রয়োজন দেখি না। শুধু ব'লে রাখা যে, শ্রীমার দেওয়া সুপ আমাদেব কাছে ছিল বড় আদরের।

(৮) উৎসব হ'ত বৎসরে তিনটি—যেদিন যেদিন শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিতেন শ্রীমার পাশে ব'সে। এ-বর্ণনাও ফলিয়ে করব না, শুধু বলিঃ

(ক) প্রথম উৎসব, ২১এ ফেব্রুয়ারি—শ্রীমার জন্মদিনে।

(খ) দ্বিতীয় উৎসব, ১৫ই আগস্ট—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে।

(গ) তৃতীয় উৎসব, ২৪এ নভেম্বর—শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধির পুণ্যাহে।

এ উৎসব তিনটির সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আশ্রম পঞ্জিকায়ও বিবৃতি আছে। তাই কেবল বলি পরে আর একটি উৎসবের দিন ধার্য করা হয়—

(ঘ) ২৪এ এপ্রিলে শ্রীমার পণ্ডিচেরিতে এসে কায়েম হবার দিন। এর পর আর তিনি পণ্ডিচেরির বাইরে পদার্পণ করেন নি কখনো।

প্রতি দর্শন হত নিঃশব্দে, অনবদ্য শৃঙ্খলা ও শান্তির আবহে। আমরা একের পর এক গিয়ে গুরুদেব ও শ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ বরণ ক'রে প্রত্যাবর্তন করতাম মহানন্দে।

(৯) এছাড়া আর একটি স্মরণীয় দিন রঙিয়ে উঠত প্রতি মাসের পয়লা তারিখে। সাধকেরা যে যা চাইত (কলম কাপড় কাগজ তোয়ালে ইত্যাদি) লিখে পাঠিয়ে দিত —শ্রীমা সেসব বিলি করতেন। চমৎকার ব্যবস্থা! কেউই দোকানে গিয়ে কিছু কিনত না।

এর পরে আর একটি স্মরণীয় দিন ধার্য হয় প্রতি রবিবার বিকালে। শ্রীমা আমার ঘরে এসে ব'সে আমাদের আটদশজনের রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিতেন একের পর এক। একটি মার্কিন মহিলা শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিয়ে পরদিন টাইপ ক'রে পাঠাতেন আশ্রমে, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ দেখে দিলে (যাকে বলে পুনমার্জন) সেই বিবৃতিটির অনেকগুলি কপি করা হ'ত সাইক্লোস্টাইলে ও সাধকদের সবাইকেই এক এক কপি দেওয়া হ'ত। পরে এগুলি CONVERSATIONS WITH THE MOTHER শিরোনামায় ছাপা হয়েছিল গ্রন্থাকারে।

এ-কথাচক্রে থাকতাম আমরা আট দশ জন মাত্র। কাজেই অধিকাংশই, যাঁরা বাদ পড়তেন, কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন কথালাপের অনুলিপি প'ড়ে।

পরে শ্রীমা মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তাঁর মোটরে নিয়ে যেতেন কোনো এক বিজন কুঞ্জে যেখানে ফের কথালাপ হ'ত। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস আমরা এ-আনন্দ পেয়েছিলাম।

সংক্ষেপে এই-ই ছিল সে-যুগের আশ্রম-জীবনের বাহ্য কর্মপঞ্জী। এর পরে আসে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর পর্ব—আমার কাছে যে-পর্ব বরণীয় হয়েছিল কীভাবে তার কিছু পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু বলা হয় নি এ-পর্বের উদ্ভব ও প্রগতির কথা। বলি।

।। নয় ।।

বলেছি, শ্রীমা মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন আমার সঙ্গে কথালাপ করতেও বটে, আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেও বটে। আরো অনেক সাধক যেতেন তাঁর কাছে তাঁদের প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে। কিন্তু তাঁব হাজারো কাজ—শতাধিক লোকের খাওয়াদাওয়া বসবাস খুঁটিনাটি দাবিদাওয়ার সমাধান—কাজেই সাধকদের মধ্যে অনেকেরই নানা প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। তাই অগত্যা শ্রীঅরবিন্দ ঠিক করলেন সাধকেরা চিঠি লিখে কোনো প্রশ্ন করলে তিনিই জবাব দেবেন পত্রে। বলাই বাহুল্য, এদের মধ্যে প্রশ্নাঘাতে অগ্রণী ছিলাম আমিই। এই হ'ল গুরুদেবের পত্রাবলীর উদ্ভব। প্রথমদিকে তিনি প্রত্যহ পাঁচ সাত জনের প্রশ্নের জবাব দিতেন রাতে ঘণ্টাখানেক ধ'রে। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পেয়ে সবাইকে দেখাবার ফলে তারাও সোল্লাসে "জয় গুরু" ব'লে আমার মত তাঁকে পত্রাঘাত স্বরু করলেন—শ্রীঅরবিন্দ তাদের নিরস্ত করলেন না,—লিখে চললেন চিঠির পর চিঠি। যতদূর মনে পড়ে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি এই পত্রপর্বের স্বচনা হয়। কিন্তু দেখতে দেখতে বানের জলের মতন প্রশ্নের ঢেউ ফুলে উঠল—ফলে শ্রীঅরবিন্দ চিঠি পডতে ও লিখতে রাতের পর বাত দুতিন ঘণ্টা সময় নিয়োগ করতেন শোবার আগে।

কিন্তু স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ পত্রপাঠক তথা পত্রলেখক—লোকে মেতে উঠল—যার ফল হ'ল দারুণ: তিনি রাত ন-টা থেকে আরম্ভ ক'রে দশটা এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত সমানে চিঠি লিখতেন—কখনো কখনো দুপাতা তিনপাতা চারপাতা—আমাকে ছ'সাত পাতার চিঠিও লিখতেন অনেক সময়ে। শেষে এমন হ'ল যে, তিনি শুতে যেতেন শেষ রাতে—অর্থাৎ প্রত্যহ সাত আট ঘণ্টা স্বহস্তে চিঠি লিখে তবে। এ আমার গুরুচ্ছ্বাসী অতিরঞ্জন নয়—কেউ সংশয় প্রকাশ করলে সাক্ষী তলব করতে পারি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তকে যিনি এসব চিঠি বিলি করবার ভার নিতেন দিনের পর দিন।*

এ যদি তাঁর ধৈর্য্য তথা করুণার চূড়ান্ত প্রমাণ ব'লে কেউ গণ্য করতে না চান

---

* একদিন রাত তিনটের সময় চিঠি লিখতে লিখতে থেমে গিয়ে পরদিন আমাকে লিখেছিলেন সপরিহাসে: "The lights went out, the lights went out!" শেষে: "So I have to wait till tomorrow, Pondichery Municipality volente.. ." শেষে পুনশ্চ; "Joy! Joy!! Joy!!! I have done it—both letters written, done this time!"

আমার Sri Aurobindo Came To Me দ্রষ্টব্য—Chapter, Avowedly personal.

তবে আমি নাচার। কারণ এই নিয়ে আমরা দিনের পর দিন বিস্ময় প্রকাশ করেছি উল্লাসের গমকে তাঁকে কারুণিক মহানুভব ও সহিষ্ণু শিরোপা দিয়ে। ভেবে পাইনি কেমন ক'রে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি এইভাবে অশ্রান্ত চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নভেম্বরে পড়ে গিয়ে তাঁর উরুর হাড়·ভেঙে না গেলে পত্রপর্ব কখনই অকস্মাৎ শেষ হ'ত না। এর পরে তিনি আর চিঠি লিখতেন না, তবে আমার কন্যাশিষ্যা গীতরাজ্ঞী উমা বসুর অকালমৃত্যুর পরে আমি ব্যথিত হ'য়ে তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লেখার পরে তিনি কেবল আমাকে ফের চিঠি লেখা সুরু করেন। তিনি যে-চিঠিটি লেখেন সেটি সুদীর্ঘ—তারিখ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সে-চিঠিটি পেশ করব পরিশিষ্টে—এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, তাঁর উরুভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমাকে আবার চিঠি লিখবেন কথা দিয়েছিলেন তাতে আমি শুধু যে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম তাই নয় অভিভূত হয়েছিলাম যার ফলে আমার বিষাদের কুয়াশা কেটে গিয়েছিল সত্যিই। প্রতিভা মনকে চমকে দেয়, কিন্তু সব সময়ে প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে না যেমন পারে স্নেহ, দরদ সমবেদনা প্রীতি—এই অঙ্গীকার যে, দরদী আমার ব্যথার সাথী।

এখানে পত্রাধ্যায়ের ভূমিকা শেষ করবার আগে শুধু আর একটি কথা বলতে চাই। তিনি আমাকে যত চিঠি লিখেছেন তার সংখ্যা ৪০০০ একথা বলেছি—ফটোপ্রিণ্টার গুণে আমাকে জানিয়েছেন ব'লে। আমি এসব চিঠির মধ্যে বোধহয় অর্ধেকেরও বেশি টাইপ ক'রে বাঁধিয়ে রেখেছি চারিটি খণ্ডে—এর মধ্যে আমার নিজের লেখা চিঠি ২৫ পৃষ্ঠার বেশি হবে না। তাই বলা চলে অকুতোভয়ে যে তাঁর চিঠির টাইপ-করা পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০০-র কম হবে না। এছাড়া আর সবাইকে যত চিঠি লিখেছেন গুনলে কত দাঁড়াবে বলতে পারি না, তবে সব জড়িয়ে অন্তত হাজার দুই পৃষ্ঠা হবেই হবে !!

শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী সম্বন্ধে এত কথা খুঁটিয়ে বললাম শুধু তথ্য পরিবেষণ করতেই নয়, এ-পত্রাবলীর প্রসঙ্গে তাঁর আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সমবেদনার 'পরে আলোকপাত করতেও বটে। যিনি ধ্যানলোকে পেয়েছিলেন অনাদি অশেষ ভূমানন্দ তিনি ইচ্ছা করলেই সে-আনন্দে মশগুল হ'য়ে থাকতে পারতেন। যেমন ছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমুখ মহাতপস্বিবৃন্দ। তিব্বতে ও হিমালয়ে এখনো এমন তান্ত্রিক সাধু আছেন যাঁরা তুষারপাতের মধ্যেও নগ্নদেহে সমাধিমগ্ন থাকেন অহোরাত্র—যথা, স্বামী কৃষ্ণাশ্রম। এ আষাঢ়ে গল্প নয়—নানা পরিব্রাজক তীর্থযাত্রী হিমালয়ের নানা গভীর গুহায় দেখা পেয়েছেন এ-শ্রেণীর বিরক্ত বৈরাগীর—যাঁদের মূল বাণী এই যে, যেহেতু "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" সেহেতু কী হবে এ-মায়ার খেলায় বৃথা সময় নষ্ট

ক'রে? সাংসারিক বা বৈষয়িক সুখ যে অনিত্য একথার যখন মার নেই তখন এ-ক্ষণসুখের প্রসাদে নিজেকে জড়িয়ে লাভ কী—এই হল লীলাবিমুখ সন্ন্যাসীদের মহাবাক্য। আমাদের শাস্ত্রেও এ-মহাবাক্যের সমর্থন আছে নানা মুনি ঋষি যোগী যতির সমাধিলব্ধ অনুভূতির এজাহারে। এমন কি, জ্ঞানভক্তিকর্মবাদী গীতায়ও নানা শ্লোকে পাই এ-ধরাবিতৃষ্ণার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। যথা "অনিত্যম্ অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" [এ জগৎ দুঃখের নিলয় তাই এখানে এসে শুধু আমাকে, ভগবানকে, ধ'রে যত শীঘ্র পারো বেরিয়ে এসো এ-মায়ামোহের গোলকধাঁধা থেকে]। কেন? কারণ এ-জগৎ যখন "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" তখন কেন মিথ্যে এখানে বেঁচে থাকার দুর্ভোগ? অবশ্য গীতায় একথাও পাই যে, এ-সংসার অজস্রসুখের আনন্দলোকও হ'তে পারে, কিন্তু কার কাছে? না, স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী মহাজনদের যাঁরা সকলের মধ্যে থেকেও অনপেক্ষ, সর্ববিচ্ছিন্ন, অনাসক্ত, উদাসীন, ব্রাহ্মীস্থিতিতে অচলপ্রতিষ্ঠ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা লেখায়ই বারবার বলেছেন যে, এ একটা কথাই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম সত্য ব'লেই জগৎ মিথ্যা এ-সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না। সাবিত্রী-তে সাবিত্রী ভগবানকে জোর গলায়ই বলেছেন (অন্তিম স্কন্ধে):

> If earth can look up to the light of heaven
> And hear her answer to her lonely cry,
> Not vain their meeting, nor heavens' touch snare,
> If thou and I are true, the World is true.

> ধরা যদি পারে স্বর্গজ্যোতি পানে রহিতে চাহিয়া,
> তাহ'লে ধরার সাথে অধরার আদানপ্রদান
> মিথ্যা মায়া বলিব কেমনে? জীব আর শিব যদি
> সত্য হয়—তবে বিশ্বলীলা হবে অলীক কেমনে?

অপি চঃ

> Heaven's touch fulfils but cancels not our eartl.
> অধরার স্পর্শে ধরা হয় ধন্য, লুপ্ত হয় না সে।

তাঁর প্রখ্যাত HUMAN CYCLE-এ (২৪ অধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "The one thing essential must take precedence, the conversion of the whole life of the human being to the lead of the spitit. The ascent of man into heaven is not the key, but rather His

ascent here into the spirit and the descent also of the spirit into his normal humanity and the transformation of the earthly nature."

ভাষ্য এই যে, সর্বাগ্রে মানুষকে চাইতে হবে তার সমগ্র জীবনকে ঢেলে সাজাতে। মানুষ স্বর্গমুখী হ'য়ে মর্ত্যকে বাতিল করলে চলবে না, কেন না মানুষের আত্মায় ভগবান্ আরূঢ় হয়েছেন নিখিল বিশ্বে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি মানুষের স্বভাবের আমূল রূপান্তর সাধন করতে চান ব'লেই। গীতার মধ্যে মায়াবাদের কিছু ফালতো রেশ শোনা গেলেও তার মূল বাণী যে বিশ্বরাজকে বিশ্ববন্ধু ব'লে বরণ ক'রে জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগের সমন্বয়ে সর্বহিতব্রতী হওয়া একথা জোর ক'রেই বলা যায়।*

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ শুধু গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর বিশ্বব্রত আরো ঝঙ্কৃত, প্রাণস্পর্শী। তাই সাবিত্রী বিশ্বরাজকে বলছেন (অন্তিম স্কন্ধে) ঃ

Since God made earth, earth must make in her God ;
What hides within her breast she must reveal.
I claim thee for the world that thou hast made.

ঈশ্বর যখন বিশ্ব করেছেন সৃষ্টি—বিশ্বকেও
বিরচিতে হবে বিশ্বাধিপে। যিনি বিশ্বের অন্তরে
রাজেন সুগুপ্ত তাঁকে চাহিবেই বিশ্ব প্রকাশিতে।
তোমাকে এ-বিশ্বতরে চাই যারে সৃজিলে তুমিই।

এ বহির্মুখী বস্তুবাদী যুগে পৃথ্বীবাদের সমর্থন করা কারুর কারুর কাছে হয়ত বাহুল্য মনে হ'তে পারে, কেন না আজকের দিনে চিন্তাশীল মানুষ সহজেই সাড়া দেয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উদাত্ত জীবনদর্শনে ঃ "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তাছাড়া জীবনের একটা প্রবল টান আছেই আছে, কাজেই মনে হ'তে পারে অনেকের—কেন শ্রীঅরবিন্দ বারবার বৈরাগ্যবিমুখতার পাঠ দিতে চেয়েছেন তাঁর অজস্র কাব্যে পত্রে নিবন্ধে? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমার যা মনে হয়েছিল তাঁর কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পরে আমি বলতে চাই একটু বিশদ ক'রেই, কেন না সংসারে বিষয়ীরা বৈরাগ্যবিমুখ হ'লেও যোগের জগতে সাধকেরা প্রায়ই অন্তরে বৈরাগ্যের একটা প্রবল টান অনুভব করেন—বিশেষ ক'রে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী দর্শনের প্ররোচনায়।

*গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে (২৫ ও ২৬ শ্লোকে) পাই শ্রীকৃষ্ণের এই পরম আত্মপ্রকাশের কথা যে, তিনি সর্ববন্ধু ব'লেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করার পরে জীবন্মুক্ত হওয়ার পরেও কৃষ্ণৈকান্ত ঋষিরা "সর্বভূতহিতে রত" থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ এই বিশ্বমুখী বাণীকেই বরণ করেছেন—বিশ্ববিমুখতার বাণীকে বর্জন ক'রে।

কিন্তু জীবনের আর সাধনার পীঠ আলাদা হ'লেও সংসারের কোনো ক্রমবিকাশই বিশ্ব থেকে প্রত্যাহৃত হ'য়ে আত্মকেন্দ্রিক হ'তে পারে না—এর প্রভাব পড়েই পড়ে ওর 'পরে কমবেশি, কেন না ভগবান্ যখন বিশ্বের প্রতি অনু ছন্দ রাগ দোলে অনুস্যূত, তখন বিষয়ীর মধ্যেও যিনি বৈরাগীর মধ্যেও তাঁর কিছুটা প্রভাব থাকবেই থাকবে এবং ভাই সি ভার্সা। তাই পদে পদেই দেখা যায় যে, যেমন বিলাসীর মনেও বৈরাগী বিরাজ করে তেমনি বৈরাগীর মনেও বিলাসী উঁকি দেয়। এ আমার কথার কথা নয়: আমার নিজের জীবনে এই দুই স্ববিরোধী ভাবধারা প্রায়ই আমাকে অশান্ত ক'রে তুলত: আশ্রমের বাইরে এলে যেমন মন ঝুঁকত সাধনার দিকে, তেমনি আশ্রমে ফিরে গেলে মন বলত—চলো মন, বাইরে গিয়ে একটু জিবিয়ে নেওয়া যাক। মায়াবাদীরা সচরাচর বৈষয়িক সব ভাবধারার ছোঁয়াচ কাটিয়ে বিজনবাসী হ'তে চান। কিন্তু সংসার আমাদের অস্থিমজ্জায় ঠাঁই পেয়ে এসেছে আশৈশব, সে ছাড়বে কেন? ফলে মানুষ অতিষ্ঠ হ'য়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়ে হয় সংসারের দিকে ঝুঁকে বৈরাগ্যকে ভুলতে চায়, নয় বৈরাগ্যকে বরণ ক'রে মোহমুদ্গর স্তবে কেঁদে বলে: "নলিনীদলগত সলিলং তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"—কি না, এ-জীবন পদ্মপত্রের জলের মতন টলমল টলমল করে ব'লে এ-বিড়ম্বনা ছেড়ে মায়াময়মিদম্ অখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্ব প্রবিশ বিদিত্বা—এই মায়াময় সংসার ছেড়ে ব্রহ্মপদে আশ্রয় নাও।"

একথা ঠিকই যে, সংসারের কোনো কিছুই স্থায়ী হয় না, না সুখ, না তৃপ্তি না আমোদপ্রমোদ। একথাও অনস্বীকার্য যে, দুঃখসুখের পারে যিনি নিয়তির বাঁধ ক'ষে আমাদের চালাচ্ছেন তাঁর আশ্রয় পেলে মানুষ কৃতকৃত্য হ'য়ে শান্তি পেয়ে জীবনের চিরন্তন দোটানা থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু, বলছেন শ্রীঅরবিন্দ, তাই ব'লে একথা সত্যি নয় নয় নয় যে, সংসার ছেড়ে নিঃস্ব বা গুহাবাসী হ'লেই রাতারাতি জীবনসমস্যার পরম সমাধান মিলবে, বলা চলে না যে, মানবেরা দলে দলে চোখের জলের নদী কোনোমতে সাঁতরে পার হ'য়ে সংসার ছেড়ে সর্বহারা বনচারী হবে এই-ই ভগবান্ চান। তাই গুরুদেব বারবারই আমাকে লিখে বোঝাতেন যে, বিরক্ত বৈরাগী হওয়াই ঘোর জীবন সমস্যার শেষ সমাধান নয়, তিনি গীতার অনাসক্তিকে বরণ ক'রেই নির্মোহ আনন্দলোকের বাসিন্দা হ'তে চান, সংসারকে বর্জনীয় ব'লে দেগে দিয়ে নৈমিষারণ্যে গিয়ে ফলমূল খেয়ে মৌনী বাবা বনতে চান না। তাঁর FOUNDATIONS OF INDIAN CULTURE-এ (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) তিনি লিখেছেন যে সনাতন ভারতের বাণী এ নয় যে, মানব-জীবন জঘন্য, সত্যের সত্য এই যে, মর্ত্য-জীবন বরণীয়—পুরাণেও পাই যে এমন কি দেবতারাও নরলীলাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন ("Human life was in ancient Indian thought no vile and

unworthy existence ; it is the greatest thing known to us ; it is desired, the Purana says, even by the gods in heaven".) ।

একথা আমার অজানা ছিল না। ভাগবতে যখন প্রথম পড়ি—দেবতারা স্বর্গ থেকে মানুষকে দেখে ঈর্ষা করছেন, বলছেন ধন্য এরা যে, কৃষ্ণের লীলাসাথী হ'তে পারল*—তখন মন ভ'রে উঠেছিল বৈ কি। মনে হয়েছিল বৈ কি—শ্রীঅরবিন্দের মতন ঋষিকল্প মহাগুরুর চরণে যখন আশ্রয় পেয়েছি তখন তাঁর বাণী ছেড়ে শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের সুরে সুর মিলিয়ে বলব কী দুঃখে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—নেংটি প'রে গুহায় গিয়ে বসলেই চতুর্বর্গ লাভ হবে ?

কিন্তু তবু এমনি মানুষের মন যে সে উল্টোপাল্টা স্রোতে সাড়া না দিয়ে পারে না, যার ফলে তার প্রবৃত্তি কখনো ঝোঁকে এদিকে, কখনো ওদিকে। তাই আমি সব বুঝেও সময়ে সময়ে যোগে আরো এগিয়ে গিয়ে রাতারাতি সিদ্ধিলাভ করবার আশায় বায়না ধরতাম আমিও গুরুদেবের মতন চুপচাপ থাকব একলাটি, শুধু ধ্যান ধারণা নিয়ে। একবার তাঁকে লিখেছিলাম কবীরের একটি দোঁহা :

> হঁস হঁস কান্ত ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়।
> হাঁসী খেলে পিউ মিলৈঁ তো কৌন দুহাগিনি হোয়।

> (মিলে না কান্তে হেসে খেলে, তাঁকে কেঁদে কেটে শুধু জিনি,
> সাধ ক'বে হ'ত দুঃখী কে মূঢ় সুখে দেখা দিলে তিনি ?)

লিখে টীকা করলাম (বিজ্ঞের ম'ত !) "যুগে যুগে দেখি বহু হাহাকারের পরে তবে সাধক কাঁটাবনে ফুলবাগানের পথ খুঁজে পেয়েছে। কাজেই আপনি কেন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন—বুক চাপড়ে কেঁদে হুতুশে না হ'লেও বস্তুলাভ হ'তে পারে ? সহজিয়া হয় মানুষ বহু সাধনার কান্নাকাটির পরে, আগে নয়। তাই আমি বিজনবাসী হ'য়ে হাহুতাশ সুরু করব যদি দয়া ক'রে অনুমতি দেন, লক্ষীটি ! বেলা ব'য়ে যায় গুরুদেব !"

উত্তরে তিনি লিখলেন অশান্তকে শান্ত করতে (২২. ১০. ৩২) : **"An ascetic dryness or isolated loneliness cannot be your spiritual destiny since it is not consonant with your *swabhava* which is made for joy, largeness, expansion, a comprehensive movement of the lifeforce"** [রুক্ষ শুষ্কতা বা একান্ত বিজনবাস তোমার সাধনার অনুকূল হ'তে

---

*অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হিনঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।২০

পারে না, কেন না তোমার স্বভাব সহজ আনন্দমুখী, প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ প্রগতি-পন্থী।]

কিন্তু আমি স্বভাবে কিছুটা একরোখা ব'লে সব বুঝেও নিজের ঝোঁকালো মনের ওকালতি করতাম প্রায়ই, বলতাম তাঁকে অনুযোগের সুরে : "বেশ, আমি চেষ্টা করব আপনার কথা মেনে চলতে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, চুপচাপ থেকে সাধনায় বেশি ডুবলে অতলের তল পেতে বিলম্ব কম হ'ত।"

কিন্তু হায় রে, এভাবে দোমনা হ'য়ে চলার নাম তো গুরুবাক্য মেনে চলা নয়। মনের বিমুখতাকে জয় করতে হ'লে সব আগে চাই গুরুর বাধ্য হওয়া। তাই মহাসাধকেরা সবাই বলেন বিদ্যা গুরুমুখী না হ'লে কিছুতেই প্রজ্ঞা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না—থেকে যায় পুঁথির বুলি মাত্র যার সাহেবি নাম পেডান্টি। শুধু তাই নয়, গুরুর অবাধ্য হ'লে সে-বিকর্মের ফলও ফলেই ফলে যথাকালে—প্রায় দুই আর দুই-যে চারের লজিক। দৃষ্টান্ত আমি নিজেই—দুর্লগ্ন এল ঘনিয়ে—গান্ধিজি সমুদ্র থেকে নুন ছাঁকার পণ নিয়ে চললেন একদল কারাব্রতী সহযাত্রী নিয়ে। দণ্ডীমার্চের তারিখ ও জয় ঘোষণা কাগজে প'ড়ে আমি ঠিক করলাম—সোজা তাঁর দলে গিয়ে হাজিরি দিয়ে জেলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ,* যখন দেখাই যাচ্ছে যে, যোগে আমার কোনো সত্যিকার অধিকার নেই। উত্তরে তিনি লিখলেন এক সুদীর্ঘ চমৎকার চিঠি আমাকে ঠাণ্ডা করতে। তারিখ—৩০ এ মার্চ ১৯৩০। এ-চিঠিটির প্রাঞ্জল ভাষা ও গভীর ভাব আশ্রমের গণ্ডীর বাইরেও বহু ভাবুক ও পণ্ডিত প'ড়ে আনন্দ পেয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতেও ছাপা হয়েছে। তাই আমি এখানে তাঁর বক্তব্যের ভাবার্থটুকু সংক্ষেপে পেশ ক'রেই ক্ষান্ত হব। প্রথমে তিনি ভূমিকা করলেন এই ব'লে যে, যে-আসুরিক মিথ্যা শক্তিরা চিরদিন দৈবসত্যশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এসেছে —তারাই দেশপ্রেমের অজুহাতে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দৈবপ্রভাবের পরিধি থেকে। আর শুধু আমাকে নয়, আরো অনেককেই এরা যোগভ্রষ্ট করতে চাইছে নানা সঙিন কুযুক্তি দিয়ে।

তারপর গুরুদেব লিখলেন যে, এ-আক্রমণ আসে যখন সাধকের সাধনা মানস বা প্রাণশক্তির স্তর থেকে দৈহিক স্তরে অবতরণ করে। তখন হয় কি—সাধক ভুলে যায় প্রথম দিকে কত কি আনন্দ শক্তি শান্তি নেমেছিল তার অন্তরে। শেষে লিখলেন তাঁর উদ্বোধনী জিজ্ঞাসা : "চেতনার যে-পূর্ণ রূপান্তর আমাদের লক্ষ্য সে রূপান্তর কঠিন একথা আমি তোমাকে খুলে বলেছি বহুবারই। কিন্তু তুমি কি সত্যি ভগবানের

*পরে শ্রীঅরবিন্দ একদা বলেছিলেন কাউকে : "অনেকেই জেলে যায় বার বার। কিন্তু তোমরা কি কেউ ভাবতে পারো—দিলীপ চুপচাপ জেলে ব'সে আছে?"

এ-মহান্ ডাকে সাড়া দিতে নারাজ? আর কিসের জন্যে? এমন একটি ঝোঁকের —যাতে তোমার স্বভাব সাড়া দিতেই পাবে না।...এখন সময় এসেছে তোমার চৈত্য পুরুষের (psychic being) এগিয়ে আসার যাতে ক'রে তোমার প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর হ'তে পারে। এ-রূপান্তর হ'লে তোমার সব সংশয় ভঞ্জন হবেই হবে...মন ভাবে, প্রাণ কাঁদে, কিন্তু হৃদয় জানেই জানে জীবন দেবতাকে।*...আমি চাই তুমি তোমার অন্তরাত্মার জ্যোতির অনুগামী হবে, মনে রাখবে যে, শুধু ভগবানের ডাকে সাড়া দিতেই এসেছ তুমি—শুধু সেই ডাকের পথে চলো একান্তী হ'য়ে—তাহ'লে তুমি জয়ী হবেই হবে।

॥ দশ ॥

অধিকাংশ সময়ে তিনি হেলান দিয়ে ব'সে লিখতেন ব'লেই হয়ত ছোট ছোট কাগজে লিখতেন। বড় বড় কাগজেও লিখতেন যখন তাঁকে চার পাঁচ ছয় আট দশ পাতার চিঠি লিখতে হ'ত বা অর্ধেক লিখে আমাকে পাঠিয়ে পরদিন লিখতেন উত্তরার্ধ। (একবার লিখেছিলেন এত বড় চিঠি যা টাইপ ক'রে দাঁড়াল ষোলো পৃষ্ঠা!) বলাই বাহুল্য, আমার কাছে এ-চিঠিগুলি হয়েছিল শুধু আমার সাধনার সহায় নয়—আমার আশ্রম জীবনের একটি প্রধান আনন্দ, গৌরব। তাঁর পত্র আমি যে প্রতিদিনই পেতাম তা নয়, কিন্তু আমার কোনো প্রশ্ন থাকলে তিনি পিঠ পিঠ উত্তর দিতেন ব'লে আরো আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাখিল করতাম। তাঁকে প্রশ্ন করার যত আনন্দ, উত্তর পেতে তার দশগুণ আনন্দ। আমার মনের অবস্থা ক্রমশঃ এমনি দাঁড়িয়েছিল যে, গুরুদেবের চিঠি আমার কাছে হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি আরাধ্য যেমন চাতকের কাছে মেঘের জল। নলিনীবাবু যখন সকালে তাঁর চিঠি নিয়ে আসতেন খামে ভ'রে তখন খাম দেখেই আমার বুক উঠত দুলে। আমার এক ফরাসী বন্ধু villederac একদা আমাকে বলেছিলেন ফ্রান্সে: "জাপানীদের কথা কীরকম মিষ্টি সে আর কী বলব মসিয়ে? সে না শুনলে বোঝানো অসম্ভব। কিন্তু তারপরে যখন শুনলাম জাপানী ললনার মিষ্টভাষ তখন—ওহ্—" ব'লে ফরাসীদের স্কন্ধ দোলন (shrugging) অর্থাৎ এমন বর্ণনাতীত মাধুর্য যার মাত্র একটু কণাস্বাদ দেওয়া যায় অঙ্গভঙ্গিতে।

শ্রীঅরবিন্দের চিঠির খাম হাতে ক'রে সত্যিই আমার বুকের রক্ত উঠত দুলে।

*"The mind thinks, the vital craves but the soul feels and knows the Divine ...Be faithful and you will conquer." —Sri Aurobindo 30.3.30

তারপর থাম খুলে ব'সে তাঁর চিঠির প্রথম লাইন পড়তে না পড়তে যে-অসহ পুলক আমাকে উচ্ছল ক'রে তুলত তার বর্ণনা করতে চাই শুধু আমি এইভাবে অঙ্গভঙ্গি ক'রেই—ভাষার সীমিত ব্যঞ্জনায় নয়। মনে পড়ে একটি গান শিখেছিলাম এক সন্ন্যাসীর কাছে, কৃষ্ণের প্রতি রাধা:

নয়ন পলকে সখা, এসো হে লুকায়ে রাখি:
রসনা নীরব রবে, যা কবার কবে আঁখি।

তাই আমি ইঙ্গিতে পাঠককে উস্কে দিয়েই থামি শুধু এইটুকু পুনশ্চ জুড়ে দিয়ে যে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে স্বপ্নাবেশ (romance) বেজে উঠতে পারে এ-প্রত্যক্ষ সত্যকে আমি গদ্যের ভাষায় ফোটাতে অক্ষম তবে একটু আভাস দিতে পারি ছড়ায়:

কোথা যে তুমি আসীন— জানি না, ওগো অপার!
শুধু, মন হয় যে রঙিন লিপিকা পেলে তোমার—
একথা বলতে পারি, নয় এ প্রলাপ উছাস,
যে মতো জানে তারি অন্তর নেশার বিলাস।

কতবারই যে তাঁর চিঠির সুধাপ্রলেপের জাদুতে আমার মনের সব ক্ষোভ জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেছে—একটি দৃষ্টান্ত দিই। মাঝে মাঝে আমি গাইতাম তিনি উপর থেকে কান পেতে শুনতেন। শ্রীমা শুনতেন সাম্‌নে ব'সে। একদা আমি গানের পর তাঁর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে অভিমান ক'রে তাঁকে লিখেছিলাম: "আমার সন্দেহ হচ্ছে—এ অধমের গান আপনার মনের তারে কোনো অনুরণনই তোলে না। তাই ভবিষ্যতে আশ্রমে গিয়ে গান শুনিয়ে আপনাকে আর বিব্রত করব না ভাবছি। নাস্তিকে খুঁচিয়ে অস্তি করার চেষ্টা বিড়ম্বনা।"

উত্তরে তিনি লিখলেন (২৩.৮.৩৩):

"তোমার সন্দেহ অমূলক। তোমার গানে আমার ঔৎসুক্য শুধু যে অস্তি তাই নয়, এমন অস্তি যে আমি রাতে ঘুমের সময়ে জেগে তোমার 'সরস্বতী' গানটির অনুবাদ সংশোধন করছিলাম।...আমি আর এক সাধককে লিখেছি যে, কাল তোমার গান আবেগে ও ব্যঞ্জনায় তোমার আগের সব গানকে ছাড়িয়ে গেছে; লিখেছি—সাধকটি ঠিকই ধরেছেন যে, তোমার সেদিনকার গান হয়েছিল পার্থিব চেতনার আবেদন—ভগবানকে ডাকা: তুমি নেমে এসো। উদাত্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে যখন কিছু লিখি তখন মনে হয় কথারা পাণ্ডুর ও প্রাণহীন তাই তারা প্রকাশ করতে অক্ষম—গানে কী ভাব মনে জাগল, কেন না মনোজাত কথামালার মধ্যে দিয়ে মনের অতীত ঝঙ্কারকে পরিবেষণ করা অসম্ভব। অন্তত আমার এই রকম মনে হয় ব'লেই তোমার

গানের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ভেবে পাই না ঠিক কী ক'রে ফুটিয়ে তুলব যা বলতে চাই।"

[Your surmise is without any real cause. Far from being without interest in your music, my interest was so great that I sat up during my time of sleep correcting your song "**Saraswati**", so that it might be in time for the occasion,—as I could not make any time for it in my working hours. And I had already written to some one who asked the question that your song yesterday had even exceeded in feeling and significance anything we had yet had and that he was right in feeling in it the effective invocation of the earth-consciousness for the Divine's descent. Written words are pale and lifeless things when one has to express the feelings raised by superb music and seem hardly to mean anything—not being able to convey what is beyond words and mere mental form—that is, at least, what I have felt and why I always find it a little difficult to write anything about your songs···23.3.33 Sri Aurobindo]

এ আর এক আশ্চয ব্যাপার। পণ্ডিচেরীতে যখন আমি এসেছিলাম তখন পণ নিয়েছিলাম গান আর নয়—ধ্যানে চাইব তাঁকে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন "গানের ওপারে"। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলেন নি যে, গানকে নামঞ্জুর করতে হবে। কিন্তু আমি তাঁকে ভুল বুঝে ভেবেছিলাম "নিবিড আঁধারে শুধু চমকে অরূপরাশি তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।" এর একটা কারণ এই যে, আমার মধ্যে যে-বৈরাগী বাস করত সে ছিল দোমনা, দুমুখী—কখনো চাইত কর্মকে নামঞ্জুর ক'রে কর্মাতীতকে পেতে, আর একটি বাউল ছিল যে গানের মধ্যে দিয়ে বার বারই গানাতীতের চকিত স্পর্শ পেয়ে ভক্তিতে আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে অঙ্গীকার করত—গানই তার স্বধর্ম—"গানাৎ পরতরং নহি"। তাই শ্রীঅরবিন্দকে কথা দিতে মন ব্যথিয়ে উঠলেও পণ নিয়েছিলাম যে, যদি (শ্রীঅরবিন্দেরই ভাষায়) যোগে দীক্ষা চাইলে যোগেশ্বরের সঙ্গে কোনো রফা করা না চলে—অর্থাৎ, যদি তিনি আমাকে বলেন গান ছেড়ে নৈঃশব্দ্যে ডুব দিতে—তবে তাই করব নাক টিপে আসনে ব'সে। আজ এসব কথা ভাবলে হাসি আসে, কিন্তু তখন সত্যিই যোগের সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণাকেই ঠিক মনে ক'রে পড়তাম বিপাকে যেকথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে পরে দেখিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন যে, যোগপন্থীর

কাছে গুরুর নির্দেশ অপরিহার্য হয় এইজন্যেই যে, গুরুর শুধু উপদেশই নয় দীপ্ত ব্যক্তি-রূপও পদে পদে তার নানা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে। তবু গান ও ধ্যানের পন্থা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নানান্ হিজিবিজি ধারণার গোলকধাঁধায় সময়ে সময়ে এম্নিই হাঁপিয়ে উঠতাম যে, আমি গুরুদেবের অগাধ স্নেহ ও নিরন্ত ভরসা সত্ত্বেও নিজেকে অনধিকারী মনে ক'রে এ-বিড়ম্বনার হাত থেকে অব্যাহতি চাইতাম। এর একটি কারণ ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন "দিলীপ, তুমি স্বভাবে শিল্পী, আর যোগীর স্বধর্ম শিল্পীর পরধর্ম।" কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বারবারই বলেছিলেন অটল নৈশ্চিত্যের প্রস্বনে যে, যোগ আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট—"your destiny is to be a yogi"—তাই আমার সব আগে চাই এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করা (গুরুবাক্য ও স্ববুদ্ধি মেনে) যে, যদি ভগবান্ থাকেন ও আমাকে ডাক দিয়ে থাকেন যোগপন্থী হ'তে—তাহ'লে তাঁর দেশনা আছেই আছে সে ডাকের পিছনে—কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে আমি সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে পৌঁছব পরমা সিদ্ধিতে। [**It is this faith you have to develop—a faith which is in accordance with reason and commonsense—that if the Divine exists and has called you to this path, as is evident, then there must be a Divine guidance behind and that through and in spite of all difficulties you will arrive**···25.6.32]

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার আমার কাছে উদ্ধৃত করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের একটি মহাবাক্য: "যত বাধা তত বিকাশ।" নানা বাধা বিঘ্ন নির্ভরসা যখন আমার সামনে দুর্লংঘ্য তুষার-প্রাচীরের মতন পথ আগলে দাড়াত তখন আমার মনে পড়ত বরদাবাবুর মুখে-শোনা শ্রীঅরবিন্দের এই আশ্বাসটি। ফলে মনে যে কিছুটা আত্ম-প্রসাদও পেতাম না তা নয়, কিন্তু পেলে হবে কি—বাধারা চড়াও হ'য়ে আমাকে সময়ে সময়ে এমনিই জখম ক'রে দিত যে, আমি গুরুদেবের কাছে লিখতাম কান্নাকাটি ক'রে: "আপনি অতিমানস লোকের বাসিন্দা মহাকায় মহাজন ব'লেই মাদৃশ বামন অভাজনের দুঃখ দুর্দশা বুঝতে পারেন না। বুঝতেন হাড়ে হাড়ে যদি আপনাকে আমাদের মতন বাধার পর বাধা ডিঙিয়ে মরুপথে চলতে হত মরীচিকার হাতছানিতে" ··ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন: "বলো কি তুমি—অবাক্ কাণ্ড!—যে, আমি অতিমানস স্বভাব নিয়ে জন্মেছিলাম—তাই দুস্তর বাধাদের কোনো খবরই রাখি না!

---

*Your destiny is to be a Yogi and the sooner your vital Purusha reconciles itself to the prospect the better for it and all the other personalities in you.

হা ভগবান্! আমাকে যে সারা জীবনই দুঃখের সঙ্গে লড়তে হয়েছে—বিলেতে অনশন অনটন থেকে শুরু ক'রে এখানে প্রবাসে মুখোমুখি হ'তে হয়েছে একের পর এক কঠিন বাধা ও বিপদের সঙ্গে। আবাল্য আমাকে লড়াই ক'রে চলতে হয়েছে নিয়তির সঙ্গে—এখনো হচ্ছে। আজ আমাকে একটি ঘরে ব'সে তাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে সেও রীতিমত যুদ্ধ যদিও আমি লড়ছি এখন আত্মিক আয়ুধ নিয়ে।" (১৯৩৫)

["But what strange ideas again !—that I was born with a supramental temperament···and that I know nothing of hard realities ! Good God ! My whole life has been a struggle with hard realities—from hardships, starvation in England, and constant dangers and fierce difficulties to the far greater difficulties cropping up continually here in Pondichery external and internal My life has been a battle from its early years and is still a battle : the fact that I wage it now from a room upstairs and by spiritual means as well as others that are external makes no difference to its character."]

তবু যখন থেকে থেকে আমার নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি হাঁপিয়ে উঠে চ'লে যেতে চাইতাম "আর পারছি না" ব'লে, তখন গুরুদেব কি এক জাদুতে দুচারটি ছত্রেই আমার সব দুঃখ তাপ জল ক'রে দিতেন। একবার যখন আমি ক্ষেপে উঠে তাঁকে লিখেছিলাম: এবার সত্যিই যাবার সময় এসেছে—তখন তিনি লিখেছিলেন (২৯.৫.৩৬):

"ভগবান্ সবচেয়ে ভালো বোঝেন—তাঁর এই প্রজ্ঞায় আস্থা রাখা চাই · আশা করি তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যিই চ'লে যাবে না। যদি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে চাও যেতে পারো, কিন্তু আমাদের জানিয়ে তবে—যাতে ক'রে আমাদের শক্তি তোমার রক্ষাকবচ হ'তে পারে। অন্ততঃ আমাদের স্নেহ তোমাকে সদাসর্বদাই ঘিরে থাকবে এ-কথাটি অবিশ্বাস কোরো না। [whatever else you doubt, you should not doubt that our love and affection will always be with you]"

আর একটি পত্রে লিখলেন পরের দিনই: "আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, তুমি থাকবে স্থির করেছ। ··কিন্তু যদি যাওই, তাহ'লেও মনে রেখো আমাদের স্নেহ তোমার সাথী থাকবে রক্ষাকবচের ম'ত। না, আমি তুঙ্গ স্বর্গলোকের সঙ্গে প্রেমালাপে মশগুল থাকি না। থাকতে পারলে সত্যি হাল্কা হ'তাম। আমি এখন চাইছি একটি সেতু

বাঁধতে স্বর্গের উল্টো পাতালের সাথে। কিন্তু তার জন্যে আমাকে পাতালে ঝাঁপ দিতে হবে। হোক। আমার সাধনার সিদ্ধির জন্যে তাও করতে হবে বাধ্য হ'য়ে। ["N , it is not with the Empyrean that I am busy : I wish I were ! It is rather with the opposite end of things : it is in the Abyss that I have to plunge build to a bridge between the two. But that too is necessary for my work and one has to face it."]

মহাপুরুষদের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় শৈলারোহীদের ম'ত একথা আমি যে জানতাম না তা নয়। কিন্তু একবার ভুলে গিয়ে আমার এক বিষাদের দুর্লগ্নে তাঁকে লিখেছিলাম অনুযোগের সুরে: "গুরুদেব, আপনি বারবার লেখেন কেন যে, আপনি নানা বাধা বিঘ্ন ডিঙিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন ব'লে আমরাও পারব এমন ধারা অসাধ্য সাধন করতে? কোথায় আপনি আর কোথায় আমরা, বলুন তো? আপনি যে-সব প্রতিবন্ধককে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন সেসবের সিকির সিকিও যে আমাদের দমিয়ে দেয়। আপনি পারেন, কৃষ্ণ পারতেন, রাম পারতেন, বুদ্ধ পারতেন। কিন্তু আমাদের মতন বিশেষ ক'রে এযুগের সংশয়ীরা মস্ত মস্ত বাধারা হুমকি দিলে ভয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিই কারণ এইই আমাদের স্বভাব তথা স্বধর্ম। সাধ্য অনুসারেই সাধনা গ'ড়ে ওঠে, নয় কি? তাছাড়া অবতার বিভূতি মহাজনবৃন্দ ভগবানের সঙ্গে ঘবকন্না করেন, কাজেই তাঁর কাছে যা-ই চান পেয়ে যান এও কি একটি ঐতিহাসিক সত্য নয়?"

উত্তরে তিনি লিখলেন (১০.২.৩৭): "মহাপুরুষদের যে কল্পচিত্র তুমি এঁকেছ তার রং ঢং মহিমময়। ভগবান্ আমাদেরকে যা চাই তাই জুগিয়ে দেন তখনি তখনি—একথা সত্যি হ'লে হ'ত চিত্তচমৎকার (glorious)। কিন্তু হায় রে, তাঁর প্রতিনিধিদের কাছে—বিভূতি অবতারদের কাছে—তিনি আশা করেন অনেক কিছু—দুস্তর বাধাবিঘ্নকে তাঁরা অতিক্রম করবেন এইই চান তিনি। তাঁরা এজন্যে মানুষের কাছে অনুকম্পার সান্ত্বনা না চাইতে পারেন কিন্তু সময়ে সময়ে একটু আধটু গুমরে ওঠার দিব্য অধিকারও কি তাঁদের নেই?"

এ-অধ্যাত্ম সত্যটির তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন চমৎকার (Savitri, 1/2):

> He measures the difficulty with the might
> And digs more deep the gulf that all must cross.
> সক্ষমের ক্ষমতার অনুপাতে করেন বিধাতা
> খনন—যে-খাত হবে সকলেরি লঙ্ঘিতে জীবনে।

কিন্তু তবু গভীর খাত যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, চ্যালেঞ্জের সুরে বলে তাল

ঠুকে : "এসো বৎস, দেখা যাক তুমি লাফ দিয়ে পার হ'তে পারো কি না"—তখন সময়ে সময়ে আমাদের মন ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে খাতের ব্যাদিত ব্যাদান দেখে। একবার এমন হ'ল যে, আমি কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারি না—না ধ্যানে, না জপে, না প্রার্থনায়, না গানে। শেষটায় অন্তরের অন্ধকার যখন অসহ হ'য়ে উঠল তখন গুরুদেবকে লিখলাম : "আমি আর পারছি না যোগাশ্রমে তিষ্ঠুতে তাই এবার যাবই যাব—কেন মিথ্যে আপনাকে কষ্ট দেওয়া—আপনার কত কাজ, জানি তো! কেবল একটি অনুরোধ : যদি বাইরে গিয়ে বুঝি যে, আমি ভুল করেছি আপনার স্নেহাশ্রয় ছেড়ে এসে—তাহ'লে যেন আমাকে আর একবার ফিরে আসতে দেওয়া হয়—do give me another chance, please!

উত্তরে তিনি লিখলেন (২২.৯.৪৪) : "It is nonsense about giving you 'another chance' if you want to come back. There can be no question of 'another chance': if you go, you will always be welcome back as one coming home. That does not depend upon your success or failure in the *Sadhana*. We know the difficulties of the Sadhana and it is from the beginning a *permanent* chance that we have given you."

[ভাবার্থ : তোমাকে যেন আর একবার আসতে দিই—আর একবার চেষ্টা করবার সুযোগ দিতে—এ কী হসনীয় কথা! তোমাকে আমরা চিরকালের জন্য এখানে রাখতে চাই—সাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ করো বা না করো সে প্রশ্নই ওঠে না। তুমি যদি সত্যিই চ'লে যাও তো ফিরে আসবে যেমন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে।]

অতঃপর অনেকদিন পরমানন্দে কাটাবার পরে ফের অশান্ত হ'য়ে উঠলাম গুরুদেবের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে। এত অশান্ত যে, তাঁকে আমার আকুলি-বিকুলি জানাতে কুণ্ঠা বোধ করা সত্ত্বেও না জানিয়ে পারলাম না। তাঁর কাছে সত্যিই আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতাম না—আমার নানা ত্রুটি চ্যুতি মতিভ্রম সবই অকপটে জানাতাম, কেন না আমার অন্তরে আমি তাঁকে চিনেছিলাম ধৈর্য ক্ষমা করুণার মূর্ত বিগ্রহ ব'লে। শেষে তাঁকে হাল্কা সুরে লিখলাম : "গুরুদেব, আপনারি শ্রীমুখে শুনেছি যে, শুধু গুরুই শিষ্যকে পরীক্ষা করেন না, শিষ্যও গুরুকে বাজিয়ে নেয় তিনি খাঁটি গুরু কি না পরখ করতে। আমি আপনাকে কী ভাবে পরখ করতে চেয়েছিলাম বলব?—আপনার ধৈর্য কতটা ভার সইতে পারে তার খবর পেতে। কারণ আর সব শিষ্যেরা আপনাকে কম বেশি ভোগালেও আমি আপনাকে বার-

বার যে-ভাবে উত্যক্ত করেছি সেভাবে আর কেউ করে নি এ আমিও জানি আপনিও জানেন। আপনি ঠিক কোন্ কোন্ গুণে দৈবী পদবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলতে পারি না, কিন্তু আপনার ধৈর্য যে অতিমানবিক—superhuman—এ-সম্বন্ধে আমার তিলার্ধও সন্দেহ নেই। তবু বারবার আমি পণ নিয়েছি যে, আপনার এত সময় নেব না—আমার সাধনায় বিফল হ'লে চেষ্টা করব স'য়ে থাকতে—আপনার করুণার 'পরে ভর ক'রে জপ করব আপনার (ভাগবতের ভাষায়) চরণ-তরণী বেয়ে দুস্তর সাধনার্ণব পার হ'তে. কিন্তু বার বার কথা দিয়েও কথা রাখতে পারি নি। আপনার চিঠি অনেকদিন না পেলে কেমন যেন আর হালে পানি পাই না—শুধু তাই নয়, আপনার ভরসার চরণতরণীও আজ যেন মনে হয় ডুবু ডুবু—উপায় কী বলুন ?"

উত্তরে তিনি আমাকে লিখলেন (১৪.৮.৪৫) ফের অভয় দিয়ে : "Henceforward, however, when I can, I will write. I have no intention, I can assure you, of cutting off connection with you in the future. What restrictions there have been, were due to unavoidable causes. *My retirement itself was indispensable; otherwise I would not be where I am, that is, personally, near the goal.* When the goal is reached it will be different. But as far as you are concerned, I have given to you that I have not given to others; what you have stated about my connection with you is perfectly true—that *you are a part of my existence*, if it were false, why should I have persistently pressed you to remain with me always? Inwardly, I have been constant in my desire and my effort to help you, not only from time to time, but daily and always. If you had an unprecedented peace for so long a time, it was due to my persistent pressure."

[ভাবার্থ : এখন থেকে তোমাকে আমি যখনই সময় পাব লিখব। চিঠি লেখায় ঢিল দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম—নৈলে আমি আমার লক্ষ্যের এত কাছে এসে পৌছতে পারতাম না। কিন্তু তোমাকে আমি যত শক্তি দিয়েছি তত আর কাউকেই দিই নি—তুমি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছ তোমার একথা সত্য। তা যদি না হ'ত তাহ'লে কেন আমি নিরন্ত তোমাকে বলব আমার কাছে কাছে থাকতে ? অন্তরে অন্তরে আমি বরাবরই চেয়েছি তোমার সাধনার সহায় হ'তে—

শুধু থেকে থেকে নয়—প্রতিদিন, সদাসর্বদা। তুমি যে সম্প্রতি এতদিন ধ'রে একটানা শান্তি পেয়েছ তার মূলে ছিল আমার অক্লান্ত আন্তর প্রচেষ্টা।"]

আমার মনে হয় যে, সময়ে সময়ে আমি চমৎকার চমৎকার উপলব্ধির পরেও ফের মনমরা হ'য়ে পড়তাম গুরুদেবের কাছ থেকে চিঠি আদায় করতে। মানুষ প্রশ্রয় পেলে বেশি অবোধ হ'য়ে ওঠে—কে না জানে? একটি দৃষ্টান্ত:

দেওয়াস স্টেটের মহারাণী একদা পণ্ডিচেরিতে এসেছিলেন স্বামীর সঙ্গে। তিনি আমার গান বড় ভালোবাসতেন। [তিনি আমাকে একটি হিন্দি গান দিয়েছিলেন, —দিল্ লে লৈয়া হৈ মেরো—যেটি ভৈরবীতে আমি যত্র তত্র গাইতাম—গ্রামোফোনেও গানটি জনপ্রিয় হয়েছিল।] একদিন আমি বিষণ্ণ উদাস মনে সমুদ্রের তীরে পৌঁছতেই দেখা তাঁর সঙ্গে। তিনি গুরুবাদ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করবামাত্র কী যে হ'ল—আমার সব বিষাদ হঠাৎ কেটে গেল, আর আমি সোচ্ছ্বাসে গুরুবাদের গুণগানে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠলাম। বাড়ি ফিরে মনে দারুণ অস্বস্তি ঘনিয়ে উঠল: আমি কি বিশ্বাস না ক'রে বিশ্বাসীর ভান করলাম বান্ধবী মহারাণীর অভিনন্দন পেতে? কিন্তু আমার চিত্তাকাশে বিষাদের মেঘ কেটে যে আনন্দের চাঁদ দেখা দিয়েছিল এ তো অকাট্য সত্য: তবে কেন একই মন বহুরূপীর মতন এভাবে চকিতে রঙ বদলালো? আর যাবে কোথা? গুরুদেবকে এই নিয়ে এক মস্ত পত্রাঘাত ক'রে আশ্রমে গিয়ে তাঁর ঘরের সামনে থালায় রেখে ফিরে ফের সেই হা হুতাশ: আমি কি তাহ'লে আসলে কপট? নৈলে বিষণ্ণ হ'য়েও কেন আনন্দের অভিনয় ক'রে বসলাম? ভক্তিমতী মহারাণীর কাছে আদর্শ গুরুভক্ত সেজে বাহবা পেতেই কি? ছি ছি·····

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন (২৬.৯.১৯৩৬): "মহারাণীর কাছে তুমি ভোল বদলাও নি। এরকম হয় সকলেরই: হয় কি, আমাদের চেতনার একটা অংশ সামনে আসে যে শুধু যে বিশ্বাস করে তাই নয়, জানে যে, যা বলছে সব সত্য। সে-সময়ে মনের বিষণ্ণ সংশয়ী অংশটা পেছিয়ে যায় বা ডুব দিয়ে গায়েব হয়। সাধারণতঃ মানুষ তার ব্যক্তিরূপের এই বহুমুখিতার খবর রাখে না তাই ভাবে যে, এসব কপটতা বা কৈতব। কিন্তু আসলে তা নয়। এমন অনেক বিশ্বাস বা অনুভূতি আছে আমাদের প্রকৃতির কোনো অংশ যাদের এমন দৃঢ় মুষ্টিতে ধ'রে থাকে যে বিষাদের ঝড়ঝাপটা তাদের থেকে থেকে ঢেকে ফেললেও মুছে ফেলতে পারে না।

["Your experience with the Maharani; that happens to everybody: it is that part of the consciousness comes up which not only believes these things but knows them to be true: the other part which is depressed and open to doubt and denial

takes then a back seat or goes underground. People do not know this multitudinousness of the human personality, so they call it insincerity in themselves or others. But it is not so. There are certain beliefs and feelings that something in our nature holds on to with a firm grip and storms and despondencies only cover but do not destroy them···Sri Aurobindo]

এরকম জ্ঞানের মুক্তামণির তিনি হরির লুট বিলিয়ে গেছেন তাঁর নানা মন্তব্যে নিবন্ধে কবিতায়। একদিন আসবেই যেদিন জগতে সব দার্শনিকরাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তাঁর মতন গভীর চিন্তাশীল ভাবুক যে কোনো দেশেরই চিন্তাজগতের মুকুটমণি ব'লে আদরণীয় হ'তে পারে। আমি আর একটি উদাহরণ দিই।

আমাদের দেশে একটি ধারণা আছে যে ভগবানের কাছে জ্ঞান ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি পবিত্রতা ঐকান্তিকতার বর চাওয়া প্রশস্ত হ'লেও দৈহিক রোগমুক্তির বর চাওয়া ঠিক নয়—কেন না দেহের সুখদুঃখ আত্মিক আলোহাওয়ার সগোত্র নয়। সাধনায় যখন থেকে থেকে অসুস্থতার কবলে দুঃখ পেতাম তখন আমার মনে এ-প্রশ্ন প্রায়ই উদয় হ'ত। একবার ঘোর ব্রঙ্কাইটিসের যন্ত্রণায় গুরুদেবকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি লিখেছিলেন (১৮.১.১৯৩৭):

"অধ্যাত্ম সাধনায় সাধক দিতে চাইবে—কিছু ফিরে চাইবে না এ-সূত্র ঠিকই। কিন্তু সাধক ভগবানের কাছে চাইতে পারে যে, তাঁর দিব্যশক্তি তাকে নিরাময় করুক বা তার স্বাস্থ্য অটুট রাখুক—যদি সে এ-প্রার্থনা করে সাধনার জন্যে যাতে ক'রে তার দেহ ভাগবত কর্মযোগে কর্তা হ'তে পারে"। **[For the spiritual life to give and not to demand is the rule. The *sadhak*, however, can ask for the Divine Force to aid him in keeping his health or recovering it if he does that as part of his *sadhana* so that his body may be able and fit for spiritual life and a capable instrument of the Divine work."]**

॥ এগারো ॥

আমি অন্যত্র বলেছি—আর একবার নয়, বারবার—যে, আমি আবাল্য ভগবানকে দুটি রূপে ভালোবেসে এসেছি: শ্যাম ও শ্যামা? গান গাইবার সময় আমি সাধ্যমত ভক্তির অর্ঘ নিবেদন ক'রে এসেছি ঠাকুরের এই দুই মূর্তির চরণে। মা ব'লে যখন

গাইতাম তখন মনে মনে ডাকতাম দুর্গা কালী ভবানীকে। শ্রীরাধার আবির্ভাব আমার জীবনে হয়—কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠার পরে। কিন্তু জগন্নাথ ও জগজ্জননীকে যুগপৎ ডাকবার সময় মনের মধ্যে সমান আনন্দ বোধ করলেও একথা বললে ভুল হবে না যে, আমি ইষ্ট বলতে বুঝতাম কেবল কৃষ্ণকেই। ভাগবতের কথায় আমার মন সম্পূর্ণ সাড়া দিয়েছিল যে, কৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্ ("কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং")। আর সব দেবদেবী বা অবতারদের প্রতিই আমার সহজ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল—রাম, মহাদেব গণেশ হনুমানকেও আমি পূজনীয় মনে করতাম বৈকি—কিন্তু আমার মন আবাল্য কৃষ্ণকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল আমার প্রাণের দেবতা ব'লে। তারপর বৈষ্ণব কবিতার ভক্তিপ্রেমরসে মন রসিয়ে উঠলে আরো জোর দিয়ে বলতাম কৃষ্ণই আমার ইষ্ট।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য সবাই ব'লে এসেছেন একবাক্যে যে, গুরুকৃপা বিনা ইষ্টের চরণে পৌঁছনো যায় না। আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ে নানা রটনার কথা পড়তাম নানা সাধু সন্তের জীবনীতে। কিন্তু কোনো পাঠই আমার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নি। আমি কৃষ্ণভক্ত এতবড় দুরভিমান আমার ছিল না, কারণ নির্ভেজাল ভক্তি কী বস্তু তার আমি প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম নানা সাধু মহাত্মা ও উচ্চকোটির সাধকদের সংস্পর্শে এসে, তাঁদের প্রভাবে ভগবান্ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা ক্রমশ থিতিয়ে একটি স্থায়ী নিষ্ঠায় সংহত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু গুরুকরণ বিনা শ্রদ্ধা ভক্তির প্রসাদে হরিচরণ মেলা দুরূহ এ-ধারণা আমাকে ক্রমশই পেয়ে বসছিল যার ফলশ্রুতি আমার পণ্ডিচেরি-প্রয়াণ। সেখানে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে আমার মন গান গেয়ে উঠেছিল। তিনি সে সময়ে—১৯২৪ সালে—আমাকে দীক্ষা দিতে রাজী হন নি, পরে ১৯২৮ সালে আমাকে গ্রহণ ক'রে ধন্য করেছিলেন—কী ভাবে আমি ফলিয়ে লিখেছি।

কিন্তু গুরুকরণ থেকে সাধনার সুরু হ'লেও সব সমস্যার আশু সমাধান হয় না। গুরুকরণ এমন একটি ভেল্কিবাজি নয় যার ফলে ডাকামাত্র হাতে চাঁদ নেমে আসে। সাধনার আলো ঊর্ধ্বের দিকে চালায় সাধককে, কিন্তু কীভাবে চালায় বোঝা সহজ নয়। এর কাছে যে-পথ বা মন্ত্র অনুকূল ওর কাছে হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রতিকূল, আজ যে-ছন্দ সহায় কাল সে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে—এই রকম কত না সমস্যা যার সমাধান দুকথায় হ'তে পারে না। একটা উদাহরণ দিই: আমার গান আমার সাধনার সহায় ব'লে গুরুদেব ও শ্রীমা আমাকে উৎসাহ দিতেন নিরন্তরই, কিন্তু আর একজন সাধক বহু প্রার্থনা ক'রেও শ্রীমার কাছে গান করার অনুমতি পান নি। তাঁর গান আমাকে মুগ্ধ করত তাই আমিও শ্রীমাকে বারবার উপরোধ করেছিলাম, কিন্তু

তিনি কিছুতেই তাঁর গান শুনতে রাজী হন নি—কেন কে বলবে ? তাই শুধু "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ", এই ডাক্তারি বিধান মেনে চলা ছাড়া উপায় কি ?

কিন্তু এসব কিছুই আমি জানতাম না যখন গুরুচরণে আশ্রয় নিই ভাবোচ্ছ্বাসে। আমার শুধু এমনি ধারা একটা আবছা ধারণা ছিল যে, গুরু আসতে না আসতে তাঁর প্রসাদে আমার রকমারি দর্শন হবে। আশ্রমে নানা সাধক সাধিকার বহুবিধ দর্শন হ'ত তাঁদের মুখে যখনই শুনতাম যে তাঁদের সামনে রঙিন আলো ঝলকায় নানা মূর্তি ফোটে, মেরুদণ্ডে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় [অন্ততঃ তাঁরা তাই বলতেন সঘনে আর আমি সরল ভাবে বিশ্বাস করতাম তাঁদের বিবৃতির ষোলো আনাই] তখনই আমার মন হায় হায় ক'রে উঠত, বাঁধত বিষাদের গান :

তোমার পথে যায় না বাধা গোনা,
মেঘের পরে মেঘের মেলে দেখা।

কিন্তু মেঘের পরে ফের নীলাকাশ হেসে উঠত, তাই হাল ছাড়তাম না, পাদপূরণ করতাম :

তবু জানি—হবেই জানাশোনা,
জানি যখন—নই আমি আর একা।

"একশোবার", বলত আমার মন সঘনে। মহাগুরু কাণ্ডারী যখন চলেছেন আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে তখন মন অশান্ত হবার মধ্যে দিয়েই পেত আবার শান্তির আভাষ, পেত ভরসা গুরুবাক্যের :

সরল তোমার পথ—বলে কোন্ জনা ?
গন্ধ গোপন, আবছা চরণরেখা :
তবু জানি—হবেই জানাশোনা,
জানি যখন—নই আমি আর একা।

বলেছি এত বড় বিচিত্র পথ, কল্পনায় যোগের যে-রূপ ফুটে ওঠে, বাস্তবে দেখি তার আর এক মূর্তি। এ আমার কথা নয়—বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং—মহাযোগেশ্বর, মা কালীর কোলের ছেলে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। শান্তি না ? শান্তি কে না চায় ? শান্তি যে কাম্য একথাও অপ্রতিবাদ্য। কিন্তু শান্তি অনেক সময় এসে কিছুক্ষণ থেকে প্রস্থান করে। তখন মনে ক্ষোভ হয় বৈ কি। কিন্তু পরে আমি বার বার অনুভব করেছি—শান্তি একটানা হ'লে আমার মনে খাসা আত্মপ্রসাদ নিটোল হ'য়ে উঠত, ফলে প্রার্থনার জোর ক'মে আসত। ওদিকে অসন্তোষও ভালো নয়, অনেক বাধা আনে, কিন্তু সেও অকারণ আসে না, সাধনার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে। তাই ঐ গানটিতেই আমি লিখেছিলাম :

"জানি" বলি যেই—ভয় ছায় মনে :
বাধা তো নয় মনগড়া এ-পথে,
অশান্তিদের চেয়েও ক্ষণে ক্ষণে
শান্তি আড়াল করে শুভব্রতে।
কেন আড়াল করে—তার কারণও দুর্বোধ্য নয় :
একটু ভালোবেসেই থাকি সুখে,
অল্পে যে নেই সুখ—যাই হায় ভুলে!
ওগো অচিন! তাই কি যুগে যুগে
ব্যথার ঢেউয়েই আসো দুলে দুলে?
শেষে সমাধান মেলে, কিন্তু বিচিত্র ভাবে :
যতই ভাবি হারাই ততই দিশা
হাল ছেড়ে যেই কাঁদি—"আমি একা",
তোমার কৃপায় দেখি—নেই তো নিশা!
তোমার উষায় আবার মেলে দেখা।

কিন্তু দেখা কার সঙ্গে? ইষ্টের সঙ্গে? না। হ'লে তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু তাই বা বলি কেমন ক'রে—যখন অনেক সময়েই চোখে পড়ত যে, যাঁরা বলতেন তাঁদের দর্শন লাভ হয়েছে তাঁদের স্বভাব একটুও বদলায় নি? আমি বলছি না যে, কোনো সাধকের মধ্যেই ইষ্টদর্শনের ফলে পরিবর্তন আসত না। কেমন ক'রে বলব? তবে শ্রীঅরবিন্দও যখন একথা বলতেন—আর পরে মহাযোগী কৃষ্ণপ্রেমও বলত—তখন নিজেকে প্রবোধ দিতাম এই ব'লে যে, দর্শন পাব হয়ত যখন ঠাকুর বুঝবেন কাল পূর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ যখন দর্শনের ফলে আমার মন বরাবরের জন্যে ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে সব বাসনাবন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তি পাবার অবস্থায় পৌছে যাবে। এ-অবস্থা লাভ হয় কোন্ পথে সে-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি দীর্ঘ পত্র থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিলে হয়ত আমার বক্তব্য সুবোধ্য হবে। তাই বলি কী অভাবনীয় ভাবে আমি একসময়ে ঠাকুরের করুণা পেয়ে গিয়েছিলাম।

হয়ে ছিল কি, যেমন আমার মাঝে মাঝে হ'ত, আমি কিছুদিন ধ'রে ধ্যানে ব'সে কোনো ফল না পেয়ে ঠিক করতাম যে, যথেষ্ট ধ্যানধারণা করা হচ্ছে না ব'লেই আমাকে বিষাদ ক্রমশ পেয়ে বসেছে। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে ধ্যানকে উপমা দিয়েছিলেন ক্রমাগত চাপ দেওয়ার সঙ্গে*—কতকটা খৃষ্টদেবের বাণীর মতন—দ্বারে ঘা দিতে

* (Dilip, Concentration or even the effort at concentration is like a constant pressure which wears away the obstacle, until, before one well knows, one finds it breaking or broken.)

দিতেই দ্বার খুলবে। আমার তখন কবিতা লেখার প্রেরণা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল ব'লেও আমার মন আমাকে টানল ধ্যানের দিকে। ভাবটা—শ্রীঅরবিন্দ যতই আশ্বাস দিন না কেন, ধ্যান না করে কেউ ভগবানকে পায় নি, গান গাওয়া বা কবিতা লেখা চলে কেবল ততদিনই যতদিন মন না ধ্যানে নিবিষ্ট হবার শক্তি পায়। বিবেকচূড়া-মণিতে আচার্য শঙ্করও লিখেছেন (২৬৪ শ্লোকে) যে, হাতের জল যে জলই বটে এ বিষয়ে যেমন মনে সংশয় আসে না তেমনি ধ্যান করলে যখন ব্রহ্মলাভ ("তত্ত্বনিগম") হয় তখন মনে আর সংশয় ঠাঁই পায় না। সে-সময়ে আমি বুঝতাম না যে, ধ্যানে যাদের সহজ প্রবেশ আছে একথা কেবলমাত্র তাদের সম্বন্ধেই খাটে—সকলের সম্বন্ধে নয়। আমাকে গুরুদেব নিরন্তর উৎসাহ দিতেন কর্মের (কবিতা বা গানের) মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তি লাভ ক'রে ইষ্টদর্শন চাইতে, কিন্তু আমার রোখালো মন আমাকে প্রায়ই বোঝাতো যে, আমার সাধনা সফল হচ্ছে না, আমি যথেষ্ট ধ্যানধারণা করছি না ব'লেই। কঠ উপনিষদের "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং হি তৎ" [অনিত্য কর্মের ঘটকালীতে ধ্রুব ধ্যানের ধনকে পাওয়া যায় না] জাতীয় জ্ঞানপন্থী শ্লোকও মনকে উস্কে দিত ধ্যানের দিকে। সেবার আমি গুরুদেবকে লিখলাম যে, তিনি যাই বলুন না কেন আমি কর্মমার্গ ছেড়ে ধ্যানব্রতী হবই হব এ-শুন্যতা কাটাতে। গুরুদেব অনেক বোঝালেন কিন্তু আমি গোঁয়ার্তুমি ক'রে আশ্রমবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঘরে একলা বসলাম ধ্যানস্থ হ'য়ে ইষ্টদর্শন করতেই হবে, নৈলে আর মান থাকে না। এ-শ্রেণীর মনোভাবের মূলে যে অহঙ্কার ঘুপটি মেরে রয়েছে আমি দেখেও দেখতে চাইতাম না, উপরন্তু নিজেকে বোঝালাম—ধ্যানে অভীষ্ট ফল পেলে গুরুদেবও খুশী হবেনই হবেন। তাই রোখ ক'রে চাইলাম ধ্যানে সিদ্ধ হ'য়ে গুরুদেবকেও যুগপৎ চমকে দিয়েই প্রসন্ন করতে।

কিন্তু যতই ধ্যান করি—প্রথমে দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ্যান, দুতিন ঘণ্টা উপনিষদ গীতা ভাগবত পাঠ, তারপরে ক্রমশ সাত আট ঘণ্টা ধ্যানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি—ততই মনে আরো আঁধার ছেয়ে আসে। শেষে এমন হ'ল যে, বিষাদের ভার আর সইতে না পেরে ছাদে গিয়ে ধ্যান করতে লাগলাম আকাশের নিচে তিন সপ্তাহ পরে। কিন্তু বৃথা বৃথা বৃথা! যতই মনের লাগাম কষি ততই সে উদ্দাম ছোটে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর বেদনায় কালো হ'য়ে আসে। শেষে চোখের জলে বললাম ঠাকুরকে [এ চিঠিটির কপি এখনো আমার দপ্তরে আছে—এখানে একটু অনুবাদ দিচ্ছি]:

"গুরুদেব, আমি কেবলমাত্র নিজের বলিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়ে বসে-ছিলাম ধ্যানে। কিন্তু দিনের পর দিন ধ্যানে ব'সেও কোনো দর্শন তো হ'লই না, শুধু অন্ধকার ও বিষাদ হ'য়ে উঠল নিদারুণ—এমন অসহ্য যে, আমি ছাদের উপর ব'সে চোখের জলে ঠাকুরকে বললাম: 'ঠাকুর তুমি অন্তর্যামী তাই জানো আমি শুধু

তোমার কৃপার্থী হ'য়েই চেয়েছি আজীবন সফলসাধন হ'তে—ঝুঁকেছিলাম ঘোর তপস্যার বলে বস্তুলাভ করতে। কিন্তু ফল হ'ল সাংঘাতিক···ঠাকুর, আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে আমি আমার অহংকৃত বুদ্ধিবলে এ-রহস্য ভেদ করতে অক্ষম; শুধু তাই নয়, এও আমি বুঝবার কিনারায় এসেছি যে, যথার্থ জ্ঞানের উদয় হ'তে পারে কেবল সেই সুলগ্নে যখন সাধক দেখতে পায় যে, শুধু নিজের রোখালো চেষ্টায় আলোর আবাহন সম্ভব নয়। তাই চোখের জলে তোমায় ডাকছি—তুমি সাড়া দাও—যাতে ক'রে আমি বুঝতে পারি যে, তুমি আছ—মরীচিকা নও।'

"গুরুদেব, এ-প্রার্থনা আমার মধ্যে জেগে উঠবামাত্র আমার মধ্যে এমন একটি নমনীয়তা—elasticity—দেখা দিল—যেন মখমলের মতন নরম—মনে হল যেন সে কোমলতা এত বাস্তব—এত গাঢ় যে, তাকে আমি ছুঁতে পারি। শুধু তাই নয়, আমার আত্মাভিমান হার মানতে না মানতে এতদিনের অন্ধকার নিরাশা ও ব্যর্থতার স্তূপ লুপ্ত হ'ল যেন এক ইন্দ্রজালে: আমার সমস্ত অস্থিরতা শান্তিতে গ'লে গেল, অন্ধকার ভেসে গেল আলোর বানে। কানাই আমাকে অভিনন্দন ক'রে বলল—আমি অজান্তে পেয়ে গেছি এক আত্মিক (সাইকিক) অনুভূতির প্রসাদ। আপনি কী বলেন জানতে চাই। ইতি। দিলীপ"

পরের দিনই গুরুদেবের উত্তর এল। সুদীর্ঘ—তাই তার চুম্বকটুকু দিই অনুবাদে যেহেতু মূলপত্রটি একাধিকবার ছাপা হয়েছে *:

"দিলীপ, কানাই' ঠিকই বলেছে: এ-অনুভূতি শুধু আত্মিক নয়, অতি মূল্যবান অনুভূতি—সাইকিক বলে সাইকিক? এর ভাষ্য—তোমার চেতনার প্রাণশক্তির ও আবেগের স্তরের উপর পড়েছিল ভাগবত আলো—যার পুনঃপুনঃ অভ্যুদয় হ'লে তোমার হবে দ্রুত প্রগতি যতদিন না সে চিরস্থায়ী হবে—যার আমি নাম দেই মানবসত্তার আন্তর রূপান্তর (psychic transformation of the being) অপি চ, এই রূপান্তরের ফলেই জ্ঞানের সুরু হ'তে পারে · তাই তুমি ঠিকই ধরেছ যে, অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলে চেনার মধ্যে দিয়েই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হ'তে পারে আর যখন এ-বোধোদয় হয় তখন সাধক দেখতে পায় যে, কেউই কেবলমাত্র নিজের জোরে চ'লে বলীয়ান্ হ'তে পারে না ["The true understanding could come only when one realized that one was completely impotent by oneself"]···

"তোমার এ-উপলব্ধির আর একটি আশাপ্রদ বিভাব (promising aspect) এই যে, তুমি প্রার্থনা করবামাত্র কৃষ্ণ সাড়া দিয়েছিলেন, জ্ঞান ও মুক্তির পথনির্দেশ দিয়ে—the way out was the change of the consciousness within,

* Sri Aurobindo came to Me, Pilgrims of the Stars, Sri Aurobindo's Letters.

the plasticity which makes the knowledge possible [চেতনার রূপান্তর হ'লে তবেই মুক্তি, আর কেবল নমনীয়তার কোলেই জ্ঞানের অভ্যুদয় হ'তে পারে], কারণ আমাদের আন্তর জ্ঞান আসতে পারে কেবল অন্তর্লোক বা উর্ধ্বলোক থেকে আর তার জন্যে মনের আত্মম্ভরিতার বিলোপ চাইই চাই। আমরা জানতে সুরু করি কেবল তখনই যখন আমরা টের পাই আমরা কী বিষম অজ্ঞান অবোধ [one must know that one is ignorant before one can begin to know.]"

শ্রীঅরবিন্দের গভীর পত্রাবলীর নিখুঁত অনুবাদ করা অসম্ভব। কিন্তু বাংলা স্মৃতি-চারণে অননূদিত ইংরাজী উদ্ধৃতি দেওয়া চলে না, তাই যেখানে যেখানে শ্রীঅরবিন্দের বাণী অমূল্য সেখানে সেখানে আমি তাঁর মূল ইংরাজী উদ্ধৃতি দিয়েছি কতকটা বাধ্য হ'য়েই বলব। SRI AUROBINDO CAME TO ME তথা PILGRIMS OF THE STARS এই দুটি স্মৃতিচারণে আমাকে বিপন্ন হ'তে হয় নি যেহেতু তাঁর নানা লেখার অনুবাদ করতে হয় নি। তবে আমার এইটুকু সাফাই গাইবার আছে যে, আমি "শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে" লিখতে বসেছি মূলত সেই সব বাঙালী পাঠকের জন্যে যাঁরা তাঁর এসব চিঠিপত্র মূল ইংরাজীতে পড়েন নি। আরো, বাংলা ভাষার প্রকাশশক্তির এখন ক্রমবিকাশ হচ্ছে ও হবে, তাই এসব অনুবাদের মধ্যে দিয়েও তাঁর লোকোত্তর মনঃশক্তি ও পরাপ্রজ্ঞার কিছুটা দীপ্তি মিলবে আশা করি। এ-টুকু হয়ত ভূমিকায় লেখা উচিত ছিল। কিন্তু মরুক গে—যা বলবার যখন বলেছি সাধ্যম'ত সবিনয়েই তখন লেখনীকে লেখকের সহজ প্রেরণার পথে চলতে দিলে সহৃদয় সমজদারদের ক্ষমা পাবই পাব আপ্ত বাক্যে আছে বলেঃ "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ?" [চেষ্টা ক'রেও যদি বিফল হই তবুও প্রচেষ্টা শুভ হ'লে অপরাধ হ'তে পারে না।] এবার হারিয়ে-যাওয়া খেই ধরি ফের।

বলছিলাম আশ্রমে এসে নানা পাকে পড়ার কথা। অত্র আর একটু বক্তব্য আছে এই যে, আমি শুধু আমার নানা সমস্যার খবর দিতেই এসব অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস পেশ করি নি, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীঅরবিন্দের ধৈর্য জ্ঞান স্নেহ ও নানা প্রোজ্জ্বল সমাধানের সংবাদ দেওয়া। এজন্যে আমাকে নিজেকে পদে পদেই পেশ করতে হয়েছে—তাতে কী? স্মৃতিচারণ তো আসলে লেখকের আত্মজীবনীই বটে। কিন্তু একথা গৌরচন্দ্রিকায় বলা সত্ত্বেও পুনরুক্তি করলাম আত্মসমর্থন ক'রে আমাদের আত্মা-ভিমান নিখর্চায় আনন্দ পায় ব'লে। অলমতিবিস্তরেণ।

তাই এবার বলব একের পর এক যোগের আখড়ায় কি ভাবে আমার নানা যৌগিক অনুভূতি হয়েছিল। দর্শনাদি অনুভূতি নাই বা হ'ল—গুরুর কাছে কী পাই নি সেটাই

তো সবচেয়ে বড় কথা নয়—কী পেয়েছি সেই খবর দেওয়াই সার্থক। একথা শুধু গুরুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়—প্রতি বন্ধু জ্ঞানী বা উপদেষ্টার সম্বন্ধেও খাটে—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এক তিল প্রাপ্তির সুস্বাদ যে এক তাল অপ্রাপ্তির বিষণ্ন বিস্বাদকে ভুলিয়ে দেয় একথা জানেনই জানেন বিশেষ ক'রে তাঁরা যাঁরা ইষ্টের কৃপায় গুরুচরণে শরণ চেয়ে পেয়েছেন পদে পদে আঁধারে-আলো।

॥ বারো ॥

ইতিপূর্বে হয়ত একটু বেঠিক জায়গায় জোর দিয়ে ভুল ক'রে ফেলেছি। মানে, হয়ত পাঠক ভেবেছেন আমি স্বধর্মে ধ্যানী নই ব'লেই আমার ধ্যানভূমি হয়ে এসেছে একটানা অফলা। তা নয় মোটেই। অনেক সময়েই ধ্যানে যা পাব আশা করেছিলাম তা পাই নি বটে, কিন্তু উল্টোপিঠে পেয়েছি অনেক কিছুই যা আদৌ আশা করি নি। এর মধ্যে একটি লাভের কথা বলি যার মূল্য আমি সে সময়ে না দিলেও পরে খুব বেশি ক'রেই দিয়েছি—অর্থাৎ কবিতা বা গান। বহুবারই এমন হয়েছে যে, ধ্যান করতে বসলাম ঠাকুরের দর্শনার্থী হ'য়ে, কিন্তু মিলল তাঁর সাড়া কবিতায় বা গানে। শ্রীঅরবিন্দ এতে খুবই খুশী হ'তেন, যদিও আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করত: "এ কী হল? নাকের বদলে নরুণ পেলেও বলতে হবে তাক ধুমা ধুম ধুম?" কিন্তু পরে সেসব গান গেয়ে বা কবিতা আবৃত্তি ক'রে যখন ভক্তিতে উজিয়ে উঠেছি তখন মনে হয়েছে বারবারই গুরুকে সামনে পেলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতাম—এমন গানের ও কবিতার প্রেরণা দিয়েছিলেন ব'লে। দু'একটি উদাহরণ দিলে অবান্তরের অবতারণা হবে না।

একদিন কেমন যেন মনকে অশান্তি এসে ছেয়ে ধরল। "জয় গুরু" ব'লে ধ্যানে বসতেই-মাথায় নেমে এল দুর্নিরোধ্য শক্তি। আমি লিখলাম ["অনামিকা-সূর্যমুখী"তে পুরো গানটি দ্রষ্টব্য, ১২০ পৃঃ) :

মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী, লক্ষ্যহীন অশান্ত প্রাণে।
ক্লান্তে করো দিগ্বিজয়ী তোমার দুঃসাহসের গানে।
অবিশ্বাসের পাষাণকারা
ধ্বংস করো—বিশ্বে সারা
জাগিয়ে তোমার তামসজয়ী জ্যোতির প্লাবন বিজয় দানে।
অন্ধকারে হিরন্ময়ী, বহ্নিমন্ত্র জ্বালাও প্রাণে।

[আরো তিনটি স্তবকে আঠারো লাইন—গাইতাম পরে মহোল্লাসে ধ্রুপদ ধামারে]

আর একদিন বাঁকা চাঁদ উঠেছে, ছাদে ধ্যানে বসতেই গান এল—মনে তখন সেন্টিমেণ্টাল বিষাদ—কিন্তু সে-ব্যথায় আনন্দ মিশিয়েঃ

উঠে বাঁধলাম গান (অনামিকা সূর্যমুখী পৃঃ ১২৩) ঃ

সুন্দর ! এসো ভেসে চাঁদের খেয়ায়,
সান্ধ্য তিমির যবে অন্তর ছায়।
আনন্দে দিলে দেখা অরুণঝলকে কত,
স্বর্ণসীমন্তিনী আশার অলকে নত,
হিমান্ত এনেছিলে বসন্তে অনাহত
ফুলে ফুলে বরণমালায়।
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভ'রো ডালা নিশিগন্ধ্যায়।
নব নব দোললীলা রঞ্জন-ছন্দে
আধজাগা কিশলয় সাধ অফুরন্তে
এসেছ পান্থ, আজ এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায়।
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

আর একদিন প্রার্থনা করছি—কী ভাবে ডাকতে হবে ? গানে এল পিঠ পিঠ সাড়া ("অনামিকা সূর্যমুখীতে পুরো গানটি আছে পৃঃ ১২৪) ঃ

ডাকিতে তো চাই, কেমনে ডাকিব বলো না—
তুমি যদি এসে না ডাকাও—করো ছলনা ?
কে কোথা পাথারে তারাপানে তরী বেয়েছে,
বেসুরার বুকে সুরেলার গান গেয়েছে,
তুমি না মন্ত্র দিলে অন্তরমাঝারে—
যারে জপি' পায় আলো সে গভীর আঁধারে ?
তাই ডাকি ঃ আর কোরো না কোরো না ছলনা,
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না ?

কখনো ধ্যানে বসলে যেন একটা আবছা নির্দেশ মতন আসত—গানের পথে গানাতীতের আবাহন করা চাই ঃ

আজিও তোমারে সাধিতে শিখি নি-গানে,
চেয়েছি আঁধারে দীপটিকা অভিমানে।
ছন্দে তোমার এসেছে আভাস,
গন্ধ তোমার এনেছে বাতাস,
ফুলের ফোয়ারা করায়েছি কলতানে,
শুধু ধ্রুবতারা বরণ করি নি প্রাণে।

পুরো গানটি "অনামিকা স্বর্ণমুখী" ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এ-গানটি আমি কলিকাতায় গিয়ে প্রায়ই গাইতাম, গ্রামোফোনেও দিয়েছিলাম, কারণ এ-গানটির মধ্যে সুরের অভিনবত্ব তথা তালফের-এর জন্যে অনেকেই শুনে খুশী হতেন।

কখনো বা কোনো বিদেশী গানের সুর মনের তারে ঝঙ্কার তুললে গানে তার জুড়ির প্রেরণা মিলত। যথা, একটি জগদ্বিখ্যাত নিগ্রো স্পিরিচুয়ালের :

I have got a robe. you **have got a robe**
All God's children got a robe…

ধ্যানে বসতেই এই সুরে গান বেজে উঠল :*

শিশু :

আমি যদি চাই দাও তুমি তাই,
তোমারি কৃপায় মাগো পাই।
তবু বলো ভুলি কেন ? জেনেও জানি না যেন
বলি অভিমানে হেন : নাই, নাই, নাই !
এলো যে চরণতীরে, কেন বলে আঁখিনীরে : নাই নাই !
কবে বলো হাসিমুখে বলিব অপার সুখে : পাই পাই—
সরল ডাকে মা যেই চাই।

মা :

আমি যে ভুলাই, হাসিতে ফিরাই,
তাই আগে দুঃখে কাঁদাই,
কালো ব্যথা পেয়ে তবে আলো সাথে চেনা হবে,
কালো যাবে আলো রবে, তাই—তাই—তাই।
নয়ন মুছালে পরে দিবি তোর শিশু করে—তাই তাই।

সেই দিন হাসিমুখে গাহিবি মায়ের বুকে : পাই, পাই,
কাঁদিয়া হাসিতে ফিরে যাই।

জর্মন সুরকার curschmann এর (কুর্শমান) একটি বিখ্যাত ঘুমপাড়ানি গানের সুর এত সুন্দর যে, আমি তারও এমনি একটি প্রতিরূপ রচনা করি একদিন ধ্যানের পরে। মূল গানটি এই :

So schlaf in Ruh! So schlaf in Ruh!
Die sterne lenchten hell und klar,
Es kommt von dort der Engelschar,
Die Aeuglein zu, mein Kindlein du,
Nun schaf und schlaf und schaf in Ruh!

[শান্ত হ'য়ে ঘুমা তুই ঘুমা রে!
তারারা দেখ্ জ্বলছে আলো মেখে,
দেবদূতেরা আসছে সেখান থেকে,
চোখের পাতা খুলে রাখিস না বে!
শান্ত হ'য়ে ঘুমা তুই ঘুমা রে!]

এ-জর্মন গানটির আরো তিনটি স্তবক আছে—জর্মন ভাষায় গেয়ে আমি আনন্দ পেতাম, তাই গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কবলাম ধ্যানে ব'সে : এ-গানটির এমন একটি প্রতিরূপ চাই এম্‌নি ঘরোয়া ভাষায় যাতে ক'রে সেটিও অবিকল এই সুরে গাওয়া যায়। যোগেশ্বর সাড়া দিলেন পিঠ পিঠ—মহানন্দে উঠে গান বাঁধলাম ও গাইলাম ঐ একই ছন্দে সুরে :

শিশু :

ঘুম যাই মা, আজ ঘুম যাই মা।
তোর বুকে আজকে ঘুম যাই মা।
আমি আর কোথাও না চাই ঠাই মা!
শোন্, আর যা চাই পেলেই হারাই,
তাই চাই যেথা হারানো নাই।

মা :

আয় রে আয়, কোলে আয় আয়!
ছেলে তো মার কোলেই ঘুমায়,
দিনের শেষে সাঁঝের ছায়ায়।
শোন্, মা-ও চায়, শিশুকে চায়,
তাই ফিরাতে তাকে কাঁদায়।

শিশু :

প্রাণ জানত না, মা, জানত না,
মা, তোকে তো প্রাণ জানত না,
তাই তোর সুধা মন টানত না,
সে জানত না, তাই মানত না—
দেয় মা বিনা কে সান্ত্বনা !

মা :

মা জানত রে, সে জানত রে,
ছেলে কী চায় মা জানত যে !
আড়াল থেকে তাই টানত সে।
সে জানত যে, অশান্ত রে—
মা চিনবি হ'লে ক্লান্ত রে !*

পরে আর একদিন ধ্যানে ব'সেই এর ইংরাজী অনুবাদটি (ঠিক এই ছন্দে সুরেই গেয়) এল—যেটি PILGRIMS OF THE STARS ও HARK ! HIS FLUTE-এ ছাপা হয়েছে। তাই শুধু প্রথম দুটি স্তবক দিয়েই ক্ষান্ত হব :

CHILD :

I will now sleep in thy love's deep
And toy no more with things that pall.
I have at last heard thy far call :
Without thy dream naught will redeem
Nor hearts sing like a waterfall.

MOTHER :

O come to me . I'll croon for thee
My coral-cadenced lullaby
And heal thine ail with rain of sky.
For thee I wait at Heaven's gate
For which I made thee pine and cry.

---

* এ-গানটি পরে শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তর সঙ্গে আমি ডুয়েটে গ্রামোফোনে গেয়েছিলাম। গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এখন এ-রেকর্ডটি আর পাওয়া যাওয়া যায় না।

আমার ইংরাজী কবিতার কথা পরে বলব, আগে বাংলা কবিতার অধ্যায় শেষ করি। মুস্কিল হয়েছে এই যে, অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে বেশি বলতে গেলে পাঠকেরা বিরূপ হবেনই আমার প্রতি, কারণ কবিতা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফুল এবং গান কবিতার শ্রেষ্ঠ ফল হ'লেও জগতে সব দেশেই কবিতা (স্বদেশী বা 'টপিকাল' না হ'লে) তাতে বেশি লোক সাড়া দেন না—গদ্যের তুলনায় সিকি সংখ্যকও নয়। কিন্তু না-ই দিলেন—আমি কিছু অন্তত এ সম্বন্ধে বলবই বলব বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, মহাকবি শ্রীঅরবিন্দের কাছে কবিতায় নতুন ক'রে যে-দীক্ষা নিয়েছিলাম তার মূলে ছিল তাঁর যোগশক্তি এ আমার কল্পনা নয়—তিনি আমাকে লিখেছেন তাঁর অগুন্তি আশীর্বাদী পত্রে। ফলে আমি এ-বিশ্বাসে স্থিতিলাভ করেছিলাম যে, ধর্মীয় কবিতার উৎস-প্রেরণা ধ্যানের আলোর উদ্দীপনার সগোত্র হ'তে পারে—যদি অবশ্য সে-ধ্যান না হয় হিজিবিজি আর কবিতা না হয় শূন্যগর্ভ।

এ গানটির সঙ্গে একটি বিষাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একটু অবান্তর হবে—হোক। মহাজনের স্মৃতি তো—প্রত্যবায় কেটে যাবে।

হয়েছিল কি, ৩০-এ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন একটি বক্তৃতা দিতে গানের সঙ্গতে—যাকে বলে lecture demonstration: বিষয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের নানা সাদৃশ্য। এ নিয়ে আমি কিছু গবেষণা করেছিলাম ১৯২১ সালে বার্লিনে, পরে কলকাতায়।

এ গানটি শিখিয়েছিলাম শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তাকে—যার সঙ্গে এ গানটি গ্রামোফোনেও গেয়েছিলাম, বলেছি।

প্রথমে আমি কুর্শমানের জর্মন ঘুমপাড়ানি গানটি গাই। তার পরে ইংরাজি অনুবাদটি—ঐ একই সুরে। সবশেষে শ্রীমতী মঞ্জু সুরু করলেন—আমার হার্মোনিয়ম সঙ্গতে:

> ঘুম যাই মা আজ ঘুম যাই মা...

তার মধুর কণ্ঠে এ-গানটি বড় সুন্দর শোনাত। কিন্তু হায় রে, গানটি গাওয়া হ'ল না। এক অধ্যাপক এসে আমার কানে কানে বললেন: "মহাত্মা গান্ধিকে দিল্লীতে এক আততায়ী গুলি করেছে, রেডিয়োর খবর।"

চমকে উঠে শ্রোতাদের বললাম। সভাভঙ্গ হ'ল। একটি ছাত্র চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল—হিস্টিরিয়া। পরে মূর্ছা। তোলপাড়। তার বর্ণনা সম্ভব নয়।

রাতে বাড়ি ফিরে কেবল ঐ গানটির ধুয়া আমার মনে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। রাতে স্বপ্নে শুনি—যেন মহাত্মা গান্ধিকে জগন্মাতা তাঁর কোলে ডেকে নিয়ে গাইছেন:

আয় রে আয় কোলে আয় আয়,
ছেলে তো মা-র কোলেই ঘুম যায়,
দিনের শেষে সাঁঝের ছায়ায়· ·

স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখের জলে তর্পণ করলাম মহাত্মাজির অমর প্রাণের।

॥ তেরো ॥

শ্রীঅরবিন্দ একটি সুদীর্ঘ পত্রে কৃষ্ণপ্রেমের নানা সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে সায় দিয়ে আমাকে লেখেন (১৭.৩.৩২)* **"Art, poetry, music are not Yoga, not in themselves things spiritual any more than philosophy is a thing spiritual or Science······but they can be turned to a higher end and then, like all things that are capable of linking our consciousness to the Divine, they are transmuted and become spiritual and can be admitted as part of a life of Yoga. All takes new values not from itself, but from the consciousness that uses it; for there is only one thing essential, useful, indispensable : to grow conscious of the Divine Reality and live in it and live it always."**

এর অনুবাদ করা সুকঠিন, কারণ এ-ধরণের গভীর বোধের প্রকাশ প্রাঞ্জল না হ'য়ে আড়ষ্ট হ'লে সব মাটি। তাই আমি শুধু এ-লাইন ক-টির ভাবার্থ পেশ ক'রেই মান বাঁচাব। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে, যদিও কবিতা, সঙ্গীত, শিল্পকলা বা দার্শনিক গবেষণার চলতি ছন্দ বা প্রয়োগকে যোগ পদবী দেওয়া যায় না, তবু তারা আমাদের চেতনাকে দিব্য চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, আর এ-সংযোগ হ'লে তারা যোগ সাধনার অঙ্গ ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। সব কিছুই রূপান্তরিত হয় কোনো মহত্তর চেতনার বাহন হ'লে—আর মহত্তম আদর্শ হচ্ছে দিব্য জীবন যাপন করা।

আমি অন্যত্র [বিশেষ ক'রে আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" তর্পণে] লিখেছি যে, আমি পণ্ডিচেরিতে যোগে দীক্ষা পেতে গিয়ে আশ্রমে তাঁর কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কাছে চেয়েছিলাম—

---

* চিঠিটি আমার AMONG THE GREAT-এ শেষের দিকে আছে (২৮৮-২৯৩ পৃঃ) তবু পরিশিষ্টেও দিলাম।

এক, তাঁর নানা ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদের অনুমতি ;

দুই, আমার নানা যৌগিক (ওরফে ধর্মীয়) অনুভব উপলব্ধির কাব্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় তাঁর আশীর্বাদ ;

তিন, তাঁর কাছে ইংরাজী ছন্দে দীক্ষা চেয়ে একের পর এক বহু ইংরাজী কবিতা লিখে তাঁর সংশোধন ও নির্দেশ পাবার দুর্লভ অধিকার ;

চার, ১৯৪৯ সালে তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী" প'ড়ে তাঁর নানা চরণের বাংলা অনুবাদ ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে ধন্য হ'তে। আমার আনন্দের সত্যিই অবধি ছিল না যখন আমার নানা অনুবাদে তিনি তুষ্ট হ'য়ে আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন : "you are a unique translator" (অনুবাদে তুমি অনন্য)।

এবার সংক্ষেপে বলি এ-চারটি জীবন-পর্বের কথা। যদি উৎসাহের মাত্রা বেশি চ'ড়ে যায় তাহ'লে হয়ত কথায় কথায় কথা বেড়ে যাবে—তবে সান্ত্বনা এই যে, মহাজনের প্রসঙ্গে উদ্দীপনার আধিক্য হ'লে ভাগবত অশুদ্ধ হয় না। স্বয়ং মহাকবি কালিদাস যখন মহাজনদের এত ভক্ত ছিলেন যে, মেঘদূতে লিখতে কুণ্ঠিত হন নি : "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"।*

পণ্ডিচেরি আশ্রমে যখন আমি গিয়েছিলাম তখন শুধু মণি (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী) ছাড়া কেউ কবিতা লিখতেন না—শ্রীঅরবিন্দের কোনো কবিতার অনুবাদ করা তো দূরের কথা। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ফরাসী ভাষায় রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখতেন আর বাংলায় লিখতেন নানা সুচিন্তিত প্রবন্ধ। তাই বোধ হয় একথা বললে ভুল হবে না যে, শ্রীঅরবিন্দের কবিতার বাংলা অনুবাদ কেউ করেন নি আমার আগে। আমি আমার "যুগর্ষিতে" আমার "কবি" অধ্যায়ে যেসব কবিতার অনুবাদ পরিবেশন করেছি সে-সব কবিতাকে তিনি রসোত্তীর্ণ হয়েছে ব'লে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। পরে সাবিত্রীর দুটি অধ্যায়ও অনুবাদ করেছিলাম—তিনি অকুণ্ঠে সার্থক অনুবাদ ব'লে রায় দিয়েছিলেন। সাবিত্রীর আরো বহু লাইন আমি অনুবাদ করি—তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে—যখন পণ্ডিচেরি থেকে চ'লে এসে সাবিত্রী বার বার পড়ি—শুধু তার কাব্যরসের জন্যে নয় তার নানা ভাবধ্বনিতে আমার মন ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠতে ব'লে। সাবিত্রীর অনেক সর্গের অনেক চরণই আজো আমার কাছে দুরবগাহ—কিন্তু যেটুকু রস ও প্রেরণা পেয়েছি তাই মাথায় তুলে নিয়েছি। ইংরাজী অমিত্রাক্ষরে এমন মহাকাব্য আর কেউ লেখেন নি, অদূর ভবিষ্যতেও আর কেউ লিখবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সে অন্য কথা—সাবিত্রীর নানা বাণী আমার বুকের তারে বেজে উঠেছিল, যার

---

* মহাজনের কাছে চেয়ে না'ও যদি পাই তবুও ছায় না মনে গ্লানি।
শুধু, অধমজনের কাছে চেয়ে যদি পাইও তবু হয় হ'য় মানহানি। (মেঘদূত)

ফলে আমার অনেক কিছু অমূল্য সম্পদ লাভ হয়েছিল শুধু কবিতার মধুবনেই নয় সাধনার সাম্রাজ্যেও বটে। আমার অনুবাদ-সাধনার সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না, যা বলবার বলেছি আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দে"-র শেষ দুই অধ্যায়ে— (কবি ও ঋষি)—কেবল এই কথাটি হয়ত কোথাও বলা হয় নি যে, তিনি আমাকে একবার লিখেছিলেন—তাঁর IN THE MOONLIGHT কবিতাটি অনুবাদ করার সুলগ্নেই আমি তাঁর আন্তর জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করি। [You came into my light when you were translating my poem, *In the Moonlight.*]

॥ চৌদ্দ ॥

এর পরে এল আমার নিজের কবিতা লেখার পর্ব। এ সম্বন্ধে বলার কথা আছে অনেক, কিন্তু সে তো ঠিক স্মৃতিচারণ হবে না, হবে আমার কবিতাকে ভালোবাসার ইতিহাস দেওয়া। তাই সে অপচেষ্টা না ক'রে বলি শুধু এই কথাটি যে, আমার জীবনে দেবী ভারতী দুটি প্রেম বপন করেছিলেন ছেলেবেলায়ই : গান ও কবিতা। আজও আমি বলতে পারি জোর গলায়ই যে আমি সুর ও কাব্য দুই-ই সমান ভালোবাসি। তবে পণ্ডিচেরিতে আমি বেশি ঝুঁকেছিলাম কবিতার দিকে প্রধানত গুরুদেবের উৎসাহ পেয়ে। কবিতার পরে কবিতা লিখে তাঁর কাছে পাঠাতাম আর তিনি শুধু যে আশীর্বাদ করতেন তাই নয়, আমাকে পদে পদে নির্দেশ দিতেন—কি ভাবে, তার পরিচয় দিতে তাঁর প্রথম দিকের শুধু একটি চিঠির কয়েক লাইন উদ্ধৃত করব [আমার "মধুমুরলী" কবিতাগুচ্ছের শেষে তাঁর নানা সুদীর্ঘ তথা অমূল্য মন্তব্য ও অভিনন্দন আছে আমার নানা কবিতা সম্বন্ধে] :

"Dilip,

It is again a beautiful poem that you have written, but not better than the other· Why erect mental theories and suit your poetry to them, whether your father's or Tagore's? I would suggest to you not to be bound by either but to write as best suits your own inspiration and poetic genius. Each of them wrote in the way suited to his own inspiration and substance;

but it is the habit of the human mind to put one way forward as a general rule for all. You have developed an original poetic turn of your own, quite unlike your father's and not by any means a reflection of Tagore's. Besides, there is now, as a result of your *Sadhana*, a new quality in your work, *a power of express ing with great felicity a subtle epsychic delicacy and depth of the thought and emotion which I have not seen any where in modern Bengali verse.* If you insist on being rigidly simple and direct as a mental rule, you might spoil something of the subtelty of the expression, even if the delicacy of the substance remained. Obs- curity, artifice, rhetoric have to be avoided. but for the rest follow the inner movement."

[ভাবার্থ: তুমি এবারও একটি চমৎকার কবিতা লিখেছ, যদিও এটি যে আগেরটির চেয়ে বেশি চমৎকার এমন কথা বলা চলে না।* কিন্তু তুমি তোমার পিতৃদেবের বা রবীন্দ্রনাথের ছন্দে চলতে যেও না—চলো তোমার আপন কদমেই—যেভাবে তোমার কাব্যপ্রতিভা তোমাকে চালায় সেই তো তোমার স্বধর্ম। মানুষ প্রায়ই ভুল করে সর্বত্রই একটা মনগড়া সূত্র মেনে চলতে চেয়ে। তোমার একটি নিজস্ব শৈলী গড়ে উঠেছে এঁদের শৈলী থেকে স্বতন্ত্র। তাছাড়া যোগ সাধনার ফলে তোমার কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে তোমার একটি অনন্য ধারা—সূক্ষ্ম আন্তর চিন্তা ও গভীর আবেগ প্রকাশ করার সহজ শক্তি—আধুনিক বাংলা কাব্যে আমি যার দেখা পাই নি। অস্পষ্টতা, চাতুরী, বাগাডম্বর পরিহার্য বটে, কিন্তু খতিয়ে তোমাকে চাইতে হবেই নিজের পথে চলতে যার নির্দেশ দেয় তোমাকে তোমার অন্তর।]

এ-পত্রে তিনি আমাকে যেভাবে উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন তাতে আমি সত্যিই চমকে উঠেছিলাম ব'লেই একটু হদিশ দেবার

---

* আগেরটির নাম ছিল "মৃদুল", শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এটির ফরাসী গদ্যছন্দে তর্জমা করেছিলেন—যেটি আমার "অনামী ১ম সংস্করণে" ছাপা হয়েছিল। এর প্রথম স্তবকটি হ'ল:

মাগো, সুরখানি তোর এতই মৃদুল—একটু কোলাহলে
ডুবে যায় তোর ঐ আয় আয় ডাক অশ্রুত অতলে।
যদি শুনতে সে-স্বর মধুরধারা না চাই মা—হয় সে হারা
হাটের কলরোলে যেমন বাঁশির সুরছন:
ফোটে নীরবতার মর্মেই তোর গভীর আবাহন।

চেষ্টা করলাম কেন আমি তাঁকে শুধু যোগের নয় কবিতারও দিশারি ব'লে গুরুবরণ করেছিলাম। বলা বাহুল্য তাঁর কাছে আমি আমার কবিতা সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসা পেয়ে গর্বিত তথা পুলকিত হয়েছিলাম, কিন্তু আরো উল্লসিত হয়েছিলাম আমার মত সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতকে তিনি অকুণ্ঠে প্রেরণা দিতেন ব'লে—শুধু তাঁর পূর্ণ সমর্থনে নয়, আরো বেশি তাঁর দীপ্ত দেশনায়—গাইডান্সে। সাহিত্যে মপাসাঁ ফ্লবের-কে (Flaubert) গুরুবরণ ক'রে তাঁর নির্দেশে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন পড়েছিলাম তাঁর জীবনীতে। কিন্তু আমার ভাগ্যেও যে শ্রীঅরবিন্দের মতন সাহিত্যগুরুর দিশা মিলতে পারে এমন কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এ-নির্দেশের মধ্যে ছিল দুটি নির্দেশ জড়িয়ে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে—সাহিত্যের তথা যোগের। কত যে বিদেশী কবির নাট্যকারের কথকের আশ্চর্য মূল্যায়ন মিলত তাঁর কাছে দিনের পর দিন—সে সময়ে ভাবি নি সে-আলোর অচিন্তনীয়তার কথা, কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে যখনই লিখতে বসতাম তখনই মনে প'ড়ে যেত তিনি কবে কী বলেছিলেন নানা থাকের প্রতিভাধর সম্বন্ধে: ব্যাস, বাল্মীকি, নেপোলিয়ন, বার্নার্ড শ, গেটে, আনা-তোল ফ্রাঁন্স, সুইনবর্ণ, শেক্সপীয়র, মিলটন, সেণ্ট অগষ্টীন, লরেন্স·· কত নাম করব? কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে তাঁর নানা পত্র অন্যত্র ছাপিয়েছি—আশ্রমে তার পত্রগুচ্ছেও মুদ্রিত হয়েছে—তাই এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি কেবল আমার একটি সংকটদুর্লগ্নে-লেখা কবিতা উদ্ধৃত ক'রে যার মন্তব্যে তিনি আমাকে এমনই অভিভূত করেছিলেন যে, চোখের জলে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখেছিলাম একটি কবিতায় (স্বপ্ন-দেবতা, মধুমুরলী):

হৃদয়ে আমার আছ জেগে তুমি, দেবতা।
দৈন্যেরো মাঝে রাজে সেই স্মৃতি বরদা।
তোমারি তারকা প্রাণের তুফানে
তাই আজো তব শুভবাণী আনে,
যত গরজায় অন্ধ অশনি তত যাচি নীলে, দেবতা!
জানি—এ-দুরাশা দেবে তব দিশা, ধুলায় নিরকাবারতা।*

আমার কবিতাটির আমি শিরোনামা দিয়েছিলাম "বিদ্রোহীর নিবেদন"। এ-ধরণের শিরোনামার নটভঙ্গির আমেজ মেলে বৈ কি, কিন্তু আমার মধ্যে যে বেঁচে বর্তে ছিল এক অভিনেতা, সে হার মেনেও মানতে চাইত না, নৈলে কি সাধকের মুখে ফোটে এমন গর্বিত ক্রন্দন, দেখেও দেখতে না চাওয়া—কেন অশ্রুর গৌরবে বিদ্রোহী

* যে-কবিতাটি লিখেছিলাম সেটি খুঁজে না পেয়ে এইটিই পেশ করলাম—এই ধরণের ওচাপড়াই আসত ব'লে—বিদ্রোহের পরে বিনতি।

আত্মপ্রসাদ চায় ? কি কারণে এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে আমার কোনো গূঢ় ক্ষোভ যে তাঁর স্নেহের সান্ত্বনা চেয়েই সে বিদ্রোহের ভঙ্গি করেছিল একথা বলা চলে নৈশ্চিত্যের সুরেই। এ-সূত্রে আর একটি কথাও বলতে চাই : যে, নটভঙ্গিমাও মর্মস্পর্শী হ'তে পারে যদি বিদ্রোহীর সাধনার মধ্যে আন্তরিক পূজার প্রণতি থাকে। তাই আমি বিদ্রোহীর ভঙ্গিতে প্রস্থান করব ব'লেও প্রণাম ক'রেই চেয়েছিলাম তাঁর মন গলাতে—কারণ মনে ভরসা ছিল ষোলো আনাই যে, তিনি আশীর্বাদ ক'রে ফের আমাকে ডাকবেন তাঁর অপার স্নেহের সহিষ্ণু ক্ষমার পর্ণপুটে :

নিবেদন শ্রীচরণে : অন্তরের এক কোণে দিও ঠাঁই এ-অপরাধীরে।
তুমি ক্ষমাময় নাথ, ক্ষমি' কোরো আশীর্বাদ মতিভ্রান্ত মূঢ় বিদ্রোহীরে,
যে তোমাকে বন্ধু বলি' বরি' প্রাণে সমুচ্ছলি' এসেছিল প্রিয় পরিজনে
ছাড়িয়া তোমার পায় ঐকান্তিক সাধনায় ধন্য হ'তে সর্বসমর্পণে।
চাহিয়াছিলাম আমি তোমাকে দিতে প্রণামী যাহা কিছু গণি আপনার :
শুধু, মিথ্যা অভিমানে পারি নাই আত্মদানে বিসর্জন দিতে অহংকার।

আজ বিদায়ের ক্ষণে সত্য কহি—প্রাণে মনে প্রার্থিয়াছিলাম শ্রীচরণ :
ছেয়ে এল প্রশ্নবাধা, সংশয়ের দ্বন্দ্বে সাধা হ'ল না সে বাঞ্ছিত অর্চন।
নাই অভিযোগ, প্রভু ! কৃতজ্ঞতাডোর তবু নিষ্করুণ কাটিলাম কেন—
প্রহেলি বুঝিতে হায় পারি না—লভি' কৃপায় শুভব্রত ভঙ্গ হ'ল হেন
কোন্ মোহে, কোন্ লোভে ? কোন্ মায়ামনঃক্ষোভে কাণ্ডারীবিহীন পারাবারে
চলিলাম দিতে পাড়ি প্রণতি নোঙর ছাড়ি'—বুঝি না তো মানসবিচারে।

তবু অঙ্গীকারি আমি : তোমাকেই অন্তর্যামী, স্থাপিয়া এ-হৃদয়মন্দিরে
তোমায়ই শরণ্য জানি', তোমায়ই বরেণ্য মানি' তব তাল ধ্রুবাশামঞ্জীরে
সাধিতে চেয়েছিলাম বন্দনায় অবিরাম—পূজায় আমার সে-নূপুর
উঠিল না রণি' কেন ? অঢেল পেয়েও হেন কোথা যেতে চাই—কোন্ দূর
অকূলপাথারে—যেথা আশাভঙ্গ-অশ্রুব্যথা মেঘে নিভে যায় ধ্রুবতারা ?
শুনি' আলোশঙ্খ কানে ধায় হায় কার টানে তিমির তুফানে পথহারা ?

তোমার পদারবিন্দ-পরিমলে হে অনিন্দ্য, ফুটেছিল অন্তরে আমার
প্রেমের কদম্ব কত, ছুটেছিল অনাহত আনন্দের কালিন্দী অপার—
স্মরি যদি প্রাণ চায় ফিরিতে তোমার পায়—সে-দুর্লগ্নে ক্ষমাবরদান

দিয়ে তব পদপ্রান্তে ডেকে নিও পথভ্রান্তে—স্নেহাশিস ঝরায়ে মহান্ !
অক্ষমে অক্ষম বলি' কোরো কৃপা—কৃতাঞ্জলি এ-মিনতি করে অসহায় !
শেষদিনে পরাজয় মাঝে দিও বরাভয়-পারানি অহেতু করুণায়।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যে সুধাস্নিগ্ধ পত্র লিখলেন সেটি আমি "মধুমুরলী"-র পরিশিষ্টে ২১৮ পৃষ্ঠায় দিয়েছি আদ্যন্ত। তা থেকে এখানে একটু অনুবাদ দেই, সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ :

"কী অপূর্ব কবিতা! তবু তুমি বলো তুমি 'সাইকিক' (আত্মিক) প্রেরণার খবর রাখো না! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের প্রতিটি 'সাইকিক' প্রেরণা থেকে লেখা—তোমার অননুকরণীয় ঢঙে; এ-কবিতাটির উৎসও তোমার অন্তর। তাই তো আমি তোমাকে বরাবরই বলেছি যে যোগশক্তি তোমার সহজাত—যদিও শুধু সে সেইজন্যেই তোমাকে এ-আশ্বাস দিয়েছি তা নয়। তুমি ভেবো না—তোমার কোনো ক্ষোভের দরুণই আমি ভুলে যেতে পারি তোমার এই আসল স্বরূপ। তোমাকে বিদায় দেওয়ার কথা তুমি কল্পনা করতে পারো, কিন্তু আমি ভাবতেও পারি না যে, আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে এভাবে ছেদ পড়তে পারে। তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—যতই কেন না দুঃখ পাও ভুলো না সে-ডাক যে তোমার অন্তরে বেজে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে, ভুলো না যে, আমাদের স্নেহ টলতে পারে না কোনোদিনই।"

॥ পনেরো ॥

আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME-তে আমি ফলিয়েই লিখেছি (তৃতীয় সংস্করণ, নবম অধ্যায়ে) যে, শ্রীঅরবিন্দকে **poet-maker** নাম দিলে অত্যুক্তি হবে না একটুও। এ ছাড়া "ছান্দসিকী" তথা "সাধু গুরুদয়াল ও কবি নিশিকান্ত" বই দুইটিতেও লিখেছি ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কীভাবে প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন—বিশেষ ক'রে আমাকে ও কবি নিশিকান্তকে। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে তিনি আমাদের দুজনের নানা বাংলা ছন্দের ইংরাজী প্রতিরূপ লিখে আমাদের উদ্দীপ্ত করতেন। তাই এখানে সেসব কথার পুনরুক্তি না ক'রে সংক্ষেপে শুধু লিখব—আমি নিজে কী ভাবে তাঁর কাছে ইংরাজী ছন্দ শিখে বিদেশী ভাষায় কবিতা লেখার দীক্ষা পেয়েছিলাম।

আশ্রমে তিনি সর্বপ্রথম আমাকে ইংরাজী ছন্দ শেখাতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অমলকিরণকেও লিখতেন চিঠিপত্র ইংরাজী কবিতার নানা চালচলন সম্বন্ধে। তারপরে নীরদবরণকে লিখেছিলেন নানা পত্র ইংরাজী ছন্দ সম্পর্কে—তার ইংরাজী

কবিতার শোধন ও পরিমার্জনের সঙ্গে মন্তব্যও করতেন তার নানা ইংরাজী কবিতার গুণাগুণ সম্বন্ধে। আবো অনেক পরে চ্যাড্‌উইককে লিখতেন দর্শন তথা ইংরাজী quantative ছন্দ সম্বন্ধে। কবি নিশিকান্তেরও কয়েকটি ইংরাজী কবিতা তিনি দেখে দেন, কয়েকটি ঢেলে সাজান তাঁর কবিত্বের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে। কিন্তু সব প্রথমে আমাকেই তিনি ইংরাজী ছন্দে দীক্ষা দিয়েছিলেন ব'লে আমার কথাই বলি সব আগে।

ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে আদৌ কিছু জানতাম না তা নয়। স্কুল কলেজে রেটরিক ও প্রসডির সঙ্গে বর্ণপরিচয় হয়েছিল কৈশোরেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ইংরাজী ছন্দের খুঁটিনাটি শেখাতেন নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তথা বুঝিয়ে কেন এসব খুঁটি-নাটি না জানলে ইংরাজী কবিতা লেখায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। প্রথমেই—স্পষ্ট মনে আছে—আমি একটি ইংরাজী শ্লোক লিখে তাকে পাঠাই। তিনি লেখেন এ-ছন্দ এত নিয়মিত যে এভাবে কবিতা লিখলে কবিতা একঘেয়ে হয়ে যায় ব'লেই রসোত্তীর্ণ হয় না। ব'লে আমার জন্যে কয়েকটি চমৎকার লাইন রচনা ক'রে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কী ভাবে মডুলেশন এনেছেন .

All eye has seen and all the ear has heard
Is a pale illusion by some greater voice
And mightier vision : no sweet sound or word,
No passion of hues that make the heart rejoice
Can equal these diviner ecstasies.
A mind beyond our mind has sole the ken
Of those yet unimagined harmonies,
The fate and privilege of unborn men.

এ কয়টি লাইনের পর্ব ভাগ ক'রে (প্রতি লাইনে পাঁচটি পর্ব—যার নাম five-foot iambic) দেখালেন কোথায় trochee, কোথায় anapaest, কোথায় spondee, কোথায় pyrrhic-এর কদম এসে ছন্দকে বৈচিত্র্যদান করেছে।

ছয়ফুট-আয়াম্বিক ওরফে Alexandrine ছন্দেও তিনি এক কবিতা রচনা করেন আমার জন্যে আমাকে বোঝাতে এর স্বরূপ—এর নানা লাইনে নানা যতি দিয়ে :

I walked / beside / the waters // in a world of light
On a / gold ridge // guarding two seats of high-rayed night*

* Sri Aurobindo Came to Me-তে নবম অধ্যায়ে পুরো কবিতাটি আছে।

তারপর আমি তাঁর নির্দেশে নানা কবির কবিতা প'ড়ে scan (ছন্দ বিশ্লেষণ) ক'রে তাঁকে পাঠাতাম (তাঁর নিজের কবিতাও প্রায়ই থাকত এদের মধ্যে) আর তিনি আমার বিশ্লেষণে ভুল ধরিয়ে দিতেন—ঠিক scansionটি কী দেখিয়ে।

অতঃপর আমি তাঁকে পাঠাতে আরম্ভ করি আমার স্বরচিত কবিতা, সপ্তাহে দুটি তিনটি চারটি···তিনি প'ড়ে শুধরে দিতেন, ভালো হ'লে তারিফ করতেন, ভুল হ'লে দেখিয়ে দিতেন কোথায় কোথায় চ্যুতি ঘটেছে। প্রথম দুটি কবিতা আমি আমার HARK! HIS FLUTE-এ ছাপি নি—কারণ প্রায় আদ্যন্ত তিনি সংশোধন করেছিলেন ব'লে "আমার কবিতা" ব'লে প্রকাশ করা চলত না। কিন্তু তৃতীয় কবিতাটিতে নানা চরণে ভুল থাকলেও মোটের উপর তাতে দৈলিপী চাল ফুটেছিল অনেকটা। তবু ব'লে রাখি—এ-কবিতাটিরও নানা চরণ তাঁর কলম চালানোর দরুণই এত রসাল হ'য়ে ফুটেছিল। এইটুকু ভূমিকা ক'রেই পেশ করি কবিতাটি। এখানে ব'লে রাখি: বৎসর দুই পরে আমার কবিতা তিনি আর সংশোধন করতেন না। লিখেছিলেন: ইংরাজি ছন্দে তোমার আর পদস্খলনের ভয় নেই—তবে লিখে চলো তোমার নিজের প্রেরণার পথে।*

SOUL'S SPRING

My heart is freed from the ail of dust—grown near
 Like love's own lips to music-mooded air···
 Life's chains ring even as bells···
And my mind, delivered from the cynic gloom,
Flushes with faith—a sudden blaze and bloom
 No frost of winter quells··

The spring has come to stay···sun-songs have kissed
My languor of clay to fragrance it had missed···
 Pain's sands with honey are drenched···
In jewelled showers of moon some wizards weave
A silver dream in the dusky eye of Eve···
 Earth's ache for Light is quenched.

---

* আমি গুণে দেখিনি, তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পণ্ডিচেরিতে বাংলায় অন্তত তিন চার শো কবিতা লিখেছিলাম, ইংরাজীতে দুশো—এগুলির প্রত্যেকটি তিনি পড়েছিলেন ও বহু কবিতার গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যা থেকে আমি অঢেল লাভ করেছিলাম।

He quickens the soul with a faery frankincense
And round our rapture throws His joy's intense
Garland of union ····

His starlit Grace redeems life's phantom flames
And His touch, a thrill, gives homeless hopes new claims
To a kingdom no king has won !

আর একটু বলার আছে: এ-কবিতাটি আমার সাম্প্রতিক কবিতাগুচ্ছ HARK ! HIS FLUTE-এ ছাপা হ'লেও এখানে ফের বিন্যস্ত করলাম দুটি কারণে: এক, সে সময়ে আমার মন কিরকম স্বপ্নরঙিন বসন্তলোকে বাস করত তার কিছুটা পরিচয় দিতে ;* দুই, দেখাতে যে, ইংরাজী কবিতার রসরাজ্যে আমি পরদেশী হ'লেও গুরুদেবের আশীর্বাদী নির্দেশে আমি কী ভাবে বিদেশী কাব্যের রসালতা আত্মসাৎ ক'রে দিনের পর দিন নানা ইংরাজী ছন্দে কবিতা লিখে চলতাম পরমানন্দে। এই আনন্দই আমাকে ছন্দ চচায় দিনের পর দিন হাঁকিয়ে নিয়ে চলত যেমন ঘোড়াকে হাঁকায় ঘোড়-সওয়ার। কী ভাবে—একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে নানা কবির কবিতা পড়তে বলতেন, দেখিয়ে দিয়ে তাঁরা কোথায় কী ভাবে 'মডুলেশন' এনে ছন্দ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। সময়ে সময়ে আমি তিন-চার ঘণ্টা একটানা নানা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ (scansion) ক'রে তারপর নিজে কেমন যেন হঠাৎ প্রেরণা পেয়ে বড় বড় কবিতা লিখে ফেলতাম দ্রুতবেগে। একদিন মনে আছে ঘটল এক অবাক কাণ্ড। রাত দশটায় আমার সাগরমুখী বারান্দায় ব'সে এইভাবে ছন্দ বিশ্লেষণ ক'রে লিখে ফেললাম বেশ একটি দীর্ঘ কবিতা EYE OF LIGHT: আমার HARK ! HIS FLUTE ! এর ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এ-কবিতাটি আছে—তাই এখানে ব'লে চলি আরো যা বলতে চাই।

বলেছি, ইংরাজী ছন্দ কাব্যসাধনায় বসেছিলাম রাত দশটায়। হঠাৎ চমক ভাঙল পূর্বদিকে রাঙা আলোর ঝঙ্কারে! এ কী কাণ্ড! সারা রাত লিখে চলেছি—ঘুম আসে নি !!

---

* শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে লিখেছেন:

"Dream's truth made false earth's vain realities...
The world quivers with a God-light at its core

স্বপ্নের সত্যের পাশে বাস্তবের সত্য মনে হয়
অলীক পাণ্ডুর।···ভুবনের কেন্দ্রে ভুবনেশ্বরের
জ্যোতির মহিমময় স্পর্শে ওঠে শিহরি' ধরণী।

এবার কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি অকুণ্ঠেই কেন না গুরুদেব এটি প'ড়ে অত্যন্ত খুশী হ'য়ে রায় দিয়েছিলেন যে এ-কবিতাটি শুধু যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাই নয়, এর গাঢ়বন্ধে ইংরাজী কবিতার ভাবধ্বনি (austerity) বেজে উঠেছে :

A wide expanse of liquid grey···a shimmer
On the horizon of some amber clouds···
Between the dusk-enveloped twigs a glimmer
Of an eager planet wrestling with the shrouds

Woven by Nature on the looms of eve···
The supine sea-scape hums a monotone
Of apathy that would not even receive
The joy of phosphorescence as its own.

A sudden moon-rise, haloed with lambent gold···
A sudden soughing of the boughs···slow heaves
Of darkling waters to the manifold
Loveliness rained by dwindling light on leaves

And flowers and creepers pining for delight···
Then the answer rings out to the ancient cry
Of loneliness, and Beauty quells the blight
Of shadows, sounding lunar conchs on high.

A sudden victory, yet how swift, complete
And wondrous : it would seem—an angel train
Sieged in a mood of magic, passing sweet :
A new Advent through night when day-tides wane :

A moment mere, an adventitious gleam,
A fleeting glance aslant of the infant moon,
A whiff from the heights and lo, doom yields to dream ;
A Star's rebirth when olden rushlights swoon ;

Would it not be even so with Soul's sunrise
(On the crest of Life's clouds—pallid, commonplace)
Spurring our listlessness to the enterprise
Miraculous of a new-born consciousness,

Of diamond glinting out from the heart of cinder,
Of sleep ensouling slumbers girt by gloom,
Of the bliss incredible in all-surrender
To the All who builds Love's pantheon on hate's tomb ;

এ-প্রসঙ্গে গুরুদেবের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন প্রায়ই যে, কোনো রসসৃষ্টিই নিটোল হয় না ঐকান্তিক সাধনা না থাকলে—শুধু প্রতিভায় লক্ষ্যভেদ হয় না। তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমারকে তিনি একদা লিখেছিলেন বাংলায় যে, বাঙালীর কল্পনা আছে বুদ্ধি আছে কিন্তু নিষ্ঠা নেই মারাঠীদের মতন। তাই আমরা জপ করতাম তাঁর মন্ত্রঃ সাধনা বিনা সিদ্ধি অসম্ভব—নিষ্ঠা না থাকলে পথের পাথেয় মেলে না।

আমার নিজের একটি মস্ত বাঁচোয়া ছিল এই যে, আমি যাই ভালোবাসতাম বাসতাম মনে প্রাণে। এখানে আমার ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। ধ্যানধারণাকে আমি তেমন ভালোবাসতে পারি নি ব'লেই ধ্যানে জপে বেশি এগুতে পারি নি। কিন্তু গান কবিতা ছন্দ তাল এসবই আমাকে মাতিয়ে তুলত—শুধু বাংলায় নয়, ইংরাজী ও সংস্কৃতেও। আমি প্রায়ই বলি বন্ধুবান্ধবকে যে, আমার কোনো সিদ্ধিই হয় নি অনায়াসে। বহু সাধনার, বহু ওঠাপড়ার, বহু বিফলতার অন্তে তবে আমি কতকটা পেরেছি লক্ষ্যের কাছে পৌছতে। অবশ্য আদর্শের তীর্থে পৌছই নি—বলাই বাহুল্য। কি সঙ্গীতে, কি কবিতায়, কি উপন্যাসে, কি রম্যন্যাসে—সর্বত্রই কিছুটা সাফল্য লাভ করতে পারলেও নানা খুঁৎ-ই আমার চোখে পড়েছে, মনে হয়েছে—"ভালো হ'ত আরো ভালো হ'লে।" এজন্যে দুঃখ পেয়েছি কিন্তু হার মানি নি, কারণ (যেকথা গুরুদেবও বলতেন প্রায়ই) আমাদের প্রেরণা হাজার সত্য হ'লেও আমাদের মন তাকে কিছুতেই পারে না রূপায়িত করতে ষোলো আনা নিখুঁৎ বর্ণে রেখায় স্বরে ছন্দে। সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন :

The genius too receives from some high fount···
The work that gives him an immortal name···

He listens for inspiration's postman knock
And takes delivery of the priceless gift
A little spoilt by the receiver mind.

(Savitry ; 7/6)

প্রতিভা গ্রহণ করে এক সুমহান উৎস হ'তে
প্রকাশের কীর্তি যার করে তাকে অমর ধরায়।
কান পেতে শোনে সে—কখন প্রেরণার বার্তাবহ
হৃদয়ের তারে তার করিবে আঘাত। সে বরণ
করে সে-অমূল্য দান। শুধু, করে যে-মন গ্রহণ
সে-প্রসাদ—পারে না সে রাখিতে তাহারে বিনির্মল।

প্রেরণার প্রসঙ্গ এসে গেল, ভালোই হ'ল, কারণ এ-প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার আছে যা বলার মতো। হ'ত কি, ধ্যানে বসলে আমার দর্শনবর্গীয় কোনো উপলব্ধি হ'ত না বটে, কিন্তু প্রায়ই ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নামত এক উজ্জ্বল শক্তির পুলকপ্রবাহ—সে আমাকে আসনে স্থির থাকতে দিত না— আমাকে ঠেলে উঠিয়ে যেন বলত: "ধ্যান থাক্ বৎস, এখন লেখো তো লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে!" ফলে কখনো লিখতাম কবিতা, কখনো গান, কখনো গল্প বা প্রবন্ধ। আর লেখার সময় মনে হ'ত কে যেন আমাকে মোক্ষম চেপে ধরেছে। সে-সময়ে কোনো প্রিয় বন্ধু এলেও বিরক্ত হ'তাম, কেউ কোনো প্রশ্ন করলে বলতাম: "এখন না, পরে হবে।" গুরুদেবকে লিখে জানালে তিনি মহানন্দে লিখতেন লিখে চলতে কবিতা গান উপন্যাস। একবার লিখেছিলেন: "I note the lyrical nature of your sonnets which you have preserved through out. That a is feat! Glorious crop of poetry! Go on in the path of Yoga without doubt of the ultimate success. Surely you cannot fail!"

একবার ধ্যানে বসার পরে এই দুর্নিবার শক্তি নামতে আমি একটি উপন্যাস লিখি—"বহুবল্লভ"—দুদিনে ২৪ ঘণ্টায়।* শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি ঈষদ্ধাস্য ক'রে আমাকে লিখেছিলেন "A novel in twenty four hours!—a hundred page novel!! Good Lord! You are the Sir Malcolm Campbell of the Novel speed! Congratulations! (March, 43)"

এমনও হয়েছে বহুবারই যে, ধ্যান করতে বসেছি বিষণ্ণ মনে জেনে যে, ধ্যানে

* এটির দ্বিতীয় সংস্করণে নামকরণ হয় "দোটানা" (প্রকাশক: বাক্‌সাহিত্য)

কিছুই মিলবে না—কিন্তু তারপরে ঐ শক্তিস্রোত এসে বসতেই কবিতা এসে গেছে, বা গান বেঁধেছি যার ফলে সব বিষাদ কেটে গেছে।

পাছে পাঠক ভুল বোঝেন তাই ব'লে রাখি যে, আমার যে শুধু শক্তির অনুভূতিই হ'ত তা নয়। সময়ে সময়ে পরমানন্দ অভয় ও শান্তির নির্ভাবনা এসেও আমাকে নিশ্চিন্ত করত। একবার হয়েছিল একটি বিচিত্র অনুভূতি, পরে একবার নিশিকান্তেরও হয়েছিল—প্রায় যমজ অনুভূতিই বলব: মন এমন বিষাদে ছেয়ে গেল যে, কিছুতেই মন বসে না, না ধ্যানে, না লেখায়, না গানে। গুরুদেবকে লিখে প্রার্থনা করতে করতে চোখে জল এল। সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা। নীল আকাশে চন্দ্রসভার আনন্দ ঝঙ্কার। কিন্তু আমার মন অবসন্ন। গুরুদেবকে ডাকতে ডাকতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত চারটেয় ঘুম ভেঙে গেল, দেখি এক ফালি চাঁদ আমার বিছানায় আর মনের মধ্যে সে কী নিটোল শান্তি! উঠে রাত-চারটেয় একটি গান বাঁধলাম - চোখের জলে! (২ ১০.৪৪):

অর্ঘ তোমার তুমিই রচো আড়াল থেকে সঙ্গোপনে
কেউ জানে না কেমন ক'রে ফুল ফুটিয়ে কাঁটাবনে!
যে-পথে চাই তোমার সুবাস
পাই না তো সে-পথের আভাস,
উষায় চাওয়া লীলাবিলাস হয়ত মিলাও সান্ধ্য মনে
ফুটিয়ে ক্লান্তিহারা গোলাপ অশান্তির এই কাঁটাবনে।

আমরা করি ম্লান তুমি যা রচো গগনবিতান থেকে।
আমরা ঘুমাই, তুমি চলো অনাগতের ছবি এঁকে।
দেখে না সে-ছবি নয়ন
হৃদয় যখন তন্দ্রামগন,
হঠাৎ এলে আলোর লগন, জেগে দেখি প্রাণগহনে
ছবি নয় সে—গোলাপ অরুণ কান্নাকরুণ কাঁটাবনে।

বন্ধু! তোমার গান যখনি গাই আমি গভীরের সুরে,
তোমার বাঁশি দেয় সাড়া: "শোন, কাছেই আছি, নয় তো দূরে।"
মন মানে না, বলে: "কোথায়?"
পায় না খুঁজে তোমায় ব্যথায়,
তবু কে সে আনে আমায় শ্রীচরণের জাগরণে!
শুধাই তখন: "এ কী! গোলাপ কে বিছালো কাঁটাবনে!"

তাই বলতে পারি সানন্দেই যে শিশু নিখুঁৎ চাঁদকে ডেকে হাতে না পেলেও বলতে পারে জ্যোৎস্নার করুণার কথা—অমর কবি নিশিকান্তের মধুর ভাষায়ঃ

"আমার কৃষ্ণ রাতে ভাঙল যে ঘুম শুক্ল রাতের তীরে।"

॥ ষোল ॥

জীবনের সন্ধ্যায় অনেক কিছুর নিহিতার্থ দেখতে পাওয়া যায় যাদের রঙরেখা প্রাণোচ্ছলতার মধ্যাহ্নলগ্নে ঝাপসা দেখায়। আমার বেশ মনে আছে—পণ্ডিচেরিতে যখন আমি প্রথম আসি তখন আমার বয়স একত্রিশ হ'লেও শক্তিসামর্থ্যে আমি শুধু যে যুবক ছিলাম তাই নয়—অক্লান্ত অশ্বারোহী। দৈহিক বলিষ্ঠতায় আশ্রমের অনেকে আমাকে ছুয়ো দিতে পারতেন বটে, কারণ আমি যাকে পালোয়ান বলে তা ছিলাম না। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য ছিল নিটোল, আশা অগাধ, সর্বোপরি, শ্রমশক্তি বিস্ময়কর। শ্রীঅরবিন্দ অকারণ নীরদবরণকে লেখেন নিঃ "Dilip has a magnificent vitality which, whatever road he goes on carries him galloping towards the goal. Only he has not yet learned how to put it at the service of the inmost psychic for spiritual realisation."

[দিলীপের প্রাণশক্তি বিপুল, যে-পথেই সে যাক না কেন এ-প্রাণশক্তি তার বাহন হ'য়ে ছুটোয় তাকে লক্ষ্যমুখে। কেবল সে এখনো শেখেনি কী ক'রে এ-শক্তিকে তার আন্তর সত্তার বাহন করা যেতে পারে আত্মিক উপলব্ধির জন্যে।]

এ-চিঠিটি প'ড়ে আমার হয়েছিল মহানন্দ প্রথম দিকে, কিন্তু তারপরেই এলো প্রতিক্রিয়াঃ এ কেমন কথা? আমাকে দিয়ে প্রাণশক্তি কি আমাকে নাহক ছুটিয়েই মারবে? এ তো আমি সইব না। এখানে এসেছি আমি কি ছাই কেবল নানা পার্থিব সিদ্ধি লাভ করতে, না আত্মারাম হ'য়ে নিশ্চিন্ত হ'তে? তাই শ্রীঅরবিন্দকে আমি থেকে থেকে লিখতাম—আমার প্রাণশক্তি যদি আমাকে অস্থির ক'রে ঘুরিয়েই মারে তবে গুরুর শরণ নেওয়ার বিড়ম্বনা কেন শুনি? আমার একটি গানে ছিল—"হারলে আমি তুমি পারো।" অতএব হে গুরু দয়াল, দয়া ক'রে আমার প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ ক'রে আমাকে মুক্তি দাও—ফলে তুমিও তো কিছুটা মুক্তি পাবে।" এই ধরণের চটুল আবদার করতাম তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে। তিনি মনে মনে হাসতেন জানতাম, কিন্তু আমি যে কেঁদে মরি তার কী? গান

গাওয়া তো হ'ল যথেষ্ট। অতুলপ্রসাদ সেনের একটি গান সাহানা দেবী গ্রামোফোনে চমৎকার গেয়েছিলেন, গানটি আমারও বিশেষ প্রিয় ছিল আরো এই জন্যে যে, তার সুরটি ছিল আমারই। গানটির আস্থায়ীতে ছিল :

কত গান তো হ'ল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?*

একেবারে অক্ষরে অক্ষরে আমার মনের ছবি! কিন্তু গুরুদেব কি কান দেবার পাত্র? বললেন আমাকে যে, আমার প্রাণশক্তি (vitality) শুধু আমার পরম সম্পদ নয়, তাঁর কাছেও পরম আদরণীয়। ভরসা দিয়ে লিখলেন : "Don't be afraid of vital energy in work. Vital energy is an invaluable gift of God without which nothing can be done…it is given that His work may be done. তবে টুকলেন : আমাকে শিখতে হবে সেই কৌশলটি—(গীতায়ও বলে নি কি যোগঃ কর্মসু কৌশলম্?) যার প্রসাদে আমি তাকে খাটিয়ে আত্মিক মুনাফা কামিয়ে কৃতকৃত্য হ'তে পারি। উত্তরে আমি লিখলাম : "তাতো বুঝলাম গুরুদেব, কিন্তু সংশয়গ্রন্থি যে কেটেও কাটে না। তবে আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি আসলে আস্তিকই বটে, কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগে : ভগবানকে কি মানুষ সত্যি তেমন প্রত্যক্ষ ক'রে ছুঁয়ে পেতে পারে যেমন পাবে তার প্রিয় বন্ধুকে? তিনি কি আসলে এক উড়ন্ত দুলন্ত অবন্ধ সত্তা নন মাটির মানুষ যার নাগাল পেতেই পারে না ?

প্রত্যুত্তরে তিনি লিখলেন : মানুষের সংশয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করা না গেলেও ভগবান্ এমন একটি সত্য যার দেখা পেলে আর সংশয়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কেন না ভাগবত অস্তিত্বের সত্যতা বস্তুলোকের সর্ববিধ অস্তিত্বের সত্যতার চেয়েও প্রত্যক্ষ, জাজ্বল্যমান, অপ্রতিরোধ্য। লিখে জুড়ে দিলেন : "কিন্তু এ-সত্য মানস চিন্তালোকের সত্য নয়—আত্মিক উপলব্ধিলোকের সত্য। যখন ভগবানের শান্তি তোমার মধ্যে নামে; যখন তাঁর আবির্ভাব হয় তোমার অন্তরে, যখন ভাগবত আনন্দ কলোর্মির মতন তোমার 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন তাঁর দিব্য-শক্তির নিশ্বাসে তুমি ছিন্ন পত্রের মতন নিরুদ্দেশ যাত্রা করো; যখন নিখিল বিশ্বে তোমার প্রেম ফুটে ওঠে ফুলের মতন; যখন যা কিছু আবছায়া, অন্ধকার, আর্ত

---

* আমার গজল সুরে বাঁধা গানটি ছিল :

"যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও ?
যদি আশা নাহি রবে—কেন মিছে বোঝা বওয়াও ?"

অতুলপ্রসাদের এ-গানটি ভালো লেগেছিল তাই এর ছন্দে সুরে বেঁধেছিলেন তাঁর বিরহগীতি।

সব চক্ষের নিমেষে দিব্য জ্ঞানের আলোয় রূপান্তরিত হ'য়ে ঝলমল করে; যখন প্রতি অণুটিকে দেখা যায় এক অদ্বিতীয় সত্তা থেকে অভিন্ন যে তোমাকে ঘিরে তোমাকে দেয় তার আন্তর স্পর্শ, দেখা দেয় তোমার দিব্য নেত্রে পশ্যন্তী চিন্তালোকে প্রাণস্পন্দে—এমন কি দৈহিক অনুভবে; যখন সর্বত্র তুমি দেখ, শোনো, ছোঁও কেবলমাত্র ভগবানকে—তখন তুমি কেমন ক'রে মনে আর তাঁর সম্বন্ধে সংশয়কে ঠাঁই দিতে পারো? সূর্য চন্দ্র আলো হাওয়াকে নাস্তি বলার চেয়েও বেশি অসম্ভব এ-হেন দিব্য সত্তাকে নাস্তি বলা। কারণ পার্থিব কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ের এজাহারকে অসংশয়ে মঞ্জুর করতে পারো না, কিন্তু ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতির পরেও আর তাঁর সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অসম্ভব।" মূল চিঠিটা এবার উদ্ধৃত করি:

Dilip,

I have started writing about doubt, but even in doing so I am afflicted by the 'doubt" whether any amount of writing or of anything else can ever persuade the eternal doubt in man which is the penalty of his native ignorance. In the first place, to write adequately would mean anything from 60 to 600 pages but not even 6,000 convincing pages would convince doubt.

All the same I have started writing, but I will begin not with Doubt, but with the demand for the Divine as a concrete certitude, quite as concrete as any physical phenomenon caught by the senses. Now, certainly, the Divine must be such a certitude not only as concrete but more concrete than anything sensed by ear or touch in the world of Matter; but it is a certitude not of mental thought but of essential experience. When the Peace of God descends on you, when the Divine Presence is there within you, when the *Ananda* rushes on you like a sea, when you are driven like a leaf before the wind by the breath of the Divine Force, when Love flowers out from you on all creation, when Divine knowledge floods you with a light which illumines and transforms in a moment all that was before dark, sorrowful and obscure, when

all that is becomes part of the One Reality, when it is all around you felt at once by the spiritual contact, by the inner vision, by the illumined seeing thought, by the vital sensation and even by the very physical sense, when everywhere you see, hear, touch only the Divine, then you can much less doubt it or deny it than you can deny or doubt daylight or air or the sun in heaven—for of all these physical things you cannot be sure that they are what your senses represent then to be, but in the concrete experiences of the Divine, doubt is impossible.

বলা বাহুল্য, এ-শ্রেণীর অপরোক্ষ অনুভব আমার হয় নি। তবে যে-সব অনুভব উপলব্ধি আমার হয়েছিল—শুধু ধ্যানে নয়, প্রার্থনায়, জপে গানের প্রেরণায় ভক্তির উচ্ছলনে যে, আমি যদি সত্যি চাইতাম তবে তাদের এজাহারে সংশয়ের প্রশ্নবাদকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারতাম বৈ কি। কিন্তু—লিখতাম আমি সংশয়ের ওকালতি করতেই বলব—যদি সংশয়কে ঠেকাতে না পারি তাহ'লে কি সাব্যস্ত হবে যে, আমি আদৌ আত্মিক রাজ্যের পাসপোর্ট পাবার দাবি করতে পারি না? উত্তরে তিনি লিখলেন (২৭. ১. ৩৪): "না, সংশয়ের কুহক নিরস্ত না হ'লে কোনো লাভের মতন লাভ হ'তে পারে না এমন কথা আমি বলি না। কারণ সংশয় মানুষের চিরন্তন অনুষঙ্গী শত্রু। আমি শুধু বলতে চাই যে, এহেন শত্রুকে আমল দিও না, বোলো না আস্তাজ্ঞে হোক—সর্বোপরি, আগন্তুক দেবতাকে খেদিয়ে দিও না বিষাদ নিরাশার কুলোর বাতাসে [don't drive away the incoming Divine with that dispiriting wet blanket of sadness and despair].

"চাই সব আগে বিফলতার দুর্ভাবনা ছেড়ে সিদ্ধির মন্ত্র জপ করা এই রোখকে বরণ ক'রে: 'সিদ্ধি আমাকে চাইতেই হবে পেতেই হবে।' কী? এ অসম্ভব? না, অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই এ-সংসারে—মানি, আছে দুস্তর বাধা যা অতিক্রম করতে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, কিন্তু অসম্ভবকে বাতিল করাই পন্থা। মানুষ যখন দৃঢ় সঙ্কল্প করে কোনো সিদ্ধি লাভ করতে, আজ বা কাল সে-সিদ্ধি সম্ভবের পরিধির মধ্যে আসেই আসে—সাধনা সফল হয়ই হয়।* নিরাশার অন্ধকারকে হাঁকিয়ে দাও

*সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—

> The high gods look on man and watch and choose
> Today's impossibles for the future's base.
> আজ যাহা অসম্ভব মনে হয়—করেন বরণ
> ঊর্ধ্বলোকে দেবতারা ঘোষি' দৈববাণী—ভবিষ্যতে
> হবে তারা মানুষের সাধনার ভিত্তি ও সূচনা। (Savitri 3/4)

—তোমার কবিতা উপন্যাস যোগকে সাধনা ব'লে বরণ ক'রে। রাত পোহালে হৃদয়দুয়ার খুলবেই খুলবে।"

একদা আমি কুলার্ণব তন্ত্রের একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে পাঠাই :

ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি!
তন্ত্রের সাধনে ভোগ হয় যোগে রূপান্তরিত,
(দুষ্কৃতি সুকৃতি হয়, মোক্ষপদ লভে এ-সংসার)

এর নিচে টুক ক'রে লিখলাম হাল্কা সুরে : "এ ধরণের অপল্‌কা 'অপটিমিস্‌ম' কি ধোপে টেঁকে গুরুদেব? এসব কথা লিখবার সময় উজিয়ে ওঠা সহজ, কিন্তু অপল্‌কা আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাগানবাড়ি কি রূঢ় বাস্তবের আঘাতে বালির চরে প্রাসাদ গড়বার চেষ্টার ম'তই বিড়ম্বনা নয়? কী বলেন আপনি?"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন পিঠ পিঠ হাল্কা সুরেই :

"It is quite admirable, to say nothing of the writing which justifies all the optimism in the world ; and it states perfectly the right attitude. As for the sceptics—well, optimism even unjustified is still jnstifiable because it gives a chance and a force for getting things done, while pessimism even with the good reason that appearances can give to it, is simply a clog and a "No going" affair. The right thing is to go ahead and get done all that can be, if possible all that ought to be. That is the prophets and the gospel." (October 1936)

[ভাবার্থ : আশাশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিই ঠিক—এমন কি, যখন ধোপে টেঁকে না তখনও সমর্থনীয়—কারণ সে কাজ করবার সুযোগও দেয়, কাজ হাসিলও করে। পক্ষান্তরে, নিরাশাবাদীরা তাদের সভ্যভব্য যুক্তি দিয়ে সব শুভ প্রচেষ্টার পথই আগলে দাঁড়ায়। আমাদের চাইতে হবে যা করা যেতে পারে বা করা উচিত ক'রে ফেলা। এইই হ'ল নবীদের সুসমাচার তথা মহাবাক্য।]

সাধারণত, মানুষ আশাশীল হ'য়েই চলে সাধ্যমত। কিন্তু যখন পদে পদে আশাভঙ্গ হয়, স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, জাগরণে ফুল হ'যে ফোটে না—তখন সে হায় হায় ক'রে উল্টো গায়, বলে কেঁদে : "আশার ছলনে ভুলি' কী ফল লভিনু হায়!" বেদনার অতল অন্ধকারে প'ড়ে বলে : "আস্তিকেরা ভ্রান্ত—দেবতা যদি বর না দেন তবে তাঁকে চাইব কেনই বা?" আস্তিকেরা বোঝান : "দেবতাকে তাঁর দেব-

সত্তার জন্যেই চাওয়া চাই। তিনি বরদ বলে নয়।" আমার মন একথা যে মানত না তা নয়, তবু যখন বিষাদের শূন্যতা বা শুষ্কতার গুরুভার অসহ হ'ত তখন মন-টুকত : "আমরা তো খতিয়ে আনন্দের জন্যেই দেবতাকে চাই—তিনি আনন্দময়, তাঁর ছোঁয়াচে আমরাও আনন্দ পাব ব'লে। অতএব (ergo !) যদি তিনি দুঃখই দেন তবে তাঁকে ভজব কেন?" এ-কুযুক্তির উত্তর আছে—যদিও নাস্তিকেরা সে-উত্তরকে নামঞ্জুর করেন তাঁরা নাস্তিবাদী ব'লেই। কিন্তু মন যখন ব্যথিয়ে ওঠে তখন যেসব আদর্শকে সে মেনে এসেছে তাদেরকে অপদস্থ ক'রে একধরণের আত্মঘাতী রস পায় বিরসতার মধ্যেও। আমি তাই একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম (প্রায় জেরার ভঙ্গিতেই বলব) যে, ভগবানকে ভগবানের জন্যেই চাইতে হবে এ-অহৈতুকী ভক্তিকে মেনে নেব কেন? তিনি আমাদের দুঃখকষ্ট থেকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে না নিয়ে গেলে কেন বলব তিনি বরণীয়? মানে, এ কি শুধু একটা গাণিতিক axiom-এর মতন—যাকে প্রমাণ করা না গেলেও মেনে নিতে হবেই হবে? সব-শেষে করেছিলাম একটি মোক্ষম যদিবাদী প্রশ্ন—যাকে বলে hypothetical—লিখেছিলাম : "আচ্ছা বলুন তো—যদি ভগবান আনন্দময় না হ'য়ে সত্যিই নিরানন্দ হতেন তাহ'লেও কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত তার গুণগান ক'রে বলা যে, আমরা তাকে চাই সর্বান্তঃকরণে?"

উত্তরে তিনি লিখেছিলেন এক মস্ত চিঠি। সে চিঠিটি তার পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে তাই শুধু অল্প-স্বল্প উদ্ধৃতি দিয়ে পেশ করি আমাকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন কী ভাবে।

তাঁর প্রথম অনুচ্ছেদে ছিল: "Let us put aside the quite foreign consideration of what we would do if union with the Divine brought eternal joylessness, *nirananda* or torture. Such a thing does not exist and to drag it in only clouds the issue. The Divine is *Anandamaya* and one can indeed seek Him for the *Ananda* He gives; but He has also in Him many other things and one may seek Him for any of them—for peace, for liberation, for knowledge, for power, for anything else to which one may take a fancy. It is quite possible for some one to say: 'Let me have Power from the Divine and do His work or His will and I am satisfied even if the use of Power entails suffering also."

[ভাবার্থ: প্রথমেই নিরানন্দ ভগবানের কথাকে পাশ কাটানো যাক কেননা যা উদ্ভট, অসম্ভব তাকে ডাক দিলে সে মেঘ এনে আলোকে ঢেকে দেয়। ভগবান আনন্দময়, তাই মানুষ তাঁকে চাইতে পারে বৈকি আনন্দবর পেতে। কিন্তু তাঁর আরো অনেক সম্পদ বিভূতি আছে যার জন্যে মানুষ তাঁর কাছে হাত পাততে পারে, যথা—শান্তি, মুক্তি, জ্ঞান, শক্তি—যার যা ভালো লাগে। যেমন ধরো কেউ বলতে পারে: "আমি তাঁর কাছে শক্তি চাই যাতে ক'রে আমি তাঁর কাজ করতে বা তাঁর ইচ্ছার বাহন হ'তে পারি—যদি তার ফলে আমাকে দুঃখ সইতে হয় তাও সইব প্রসন্নমনে"—ব'লে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন ফলিয়েই যে, যেহেতু ভগবানের স্বরূপের ইতি করা যায় না, সেহেতু বলা চলে না যে, তাঁর সঙ্গে মিলনে আনন্দ মেলে ব'লেই আমরা তাঁকে চাই। কেউ যদি কোনো রাণীকে ভালোবাসে সে জানতে পারে যে, রাণী তার প্রেমে সাড়া দিলে সে রাজা হ'তে বা ধন গৌরব শক্তি পেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সম্ভব হ'তে পারে যে, সে রাণীকে ভালোবাসে এসবের জন্যে নয়—ভালোবাসে রাণীর জন্যেই—অর্থাৎ রাণী রাণী না হ'লেও তাকে চাইত, সমান ভালোবাসত।··· একথা সত্য নয় যে, দেশভক্তেরা দেশকে ভালোবাসে কেবল যখন দেশ হয় সমৃদ্ধ বলীয়ান, দেশ যখন পরাধীন দীন হীন তখনো তাকে ভালোবাসে তার জন্যে এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে পারে। মানুষ সত্যকে ভালোবাসতে পারে সত্যের জন্যে, তার জন্যে সানন্দে দুঃখ যন্ত্রণা এমন কি অকালমরণকেও বরণ করতে পারে।]

লিখে শ্রীঅরবিন্দ জুড়ে দিলেন: "That means what? That man, country, truth and other things besides can be loved for their own sakes···for something absolute that is either in them or behind their appearance or circumstance. The Divine is more than a man or woman; a stretch of land or a creed, opinion, discovery or principle. He is the Person beyond all persons, the Home and Country of all souls, the Truth of which truths are only imperfect figures. Can He not then be loved and sought for His own sake, as and more than these have been by men in their lesser selves and nature?"

[ভাবার্থ: মানুষ দেশ সত্য এসবকেই যখন তাদের স্বকীয় পরম সত্তার জন্যে ভালোবাসা সম্ভব—যে-সত্তা তার সব বিভাব ও পরিবেশের অতীত—তখন মানুষ কেন ভগবানকে তাঁর নিজের সত্তার জন্যে ভালোবাসতে পারবে

না—যে-সত্তা রূপান্বিত হয়েও রূপাতীত, সত্যের সত্য, সর্বভূতের নিধান, নিলয়, গতি ?]

শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখলেন : "আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বলছি না যে, আনন্দ অবান্তর। আত্মসমর্পণেই তো এক গভীর অবর্ণনীয় আনন্দ—আনন্দ লাভ করবার শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজ উপায়। কিন্তু আনন্দ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হ'লেও ভক্ত নিজেকে ভগবানের পায়ে নিবেদন করে না এই ফলের জন্যে, করে আত্মসমর্পণের তাগিদেই, ভগবান্ ভগবান্ ব'লেই।—বুদ্ধির কাছে একথা মনে হতে পারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—কিন্তু তবু আনন্দের জন্যে ভগবানকে চাওয়া ও ভগবানের জন্যে ভগবানকে চাওয়ার মধ্যে যে তফাৎ আছে সে অনস্বীকার্য, বাস্তব—কথার কথা নয়।"

আমার অনুবাদ মূলানুগ হয় নি, আর যেটুকু বাদ দিয়েছি সেটুকু অনুবাদ করা উচিত ছিল জেনেও করতে পারি নি। তাই গুরুদেবের পুনশ্চটুকু জুড়ে দিলাম :

P.S. Don't misunderstand me—I am not saying that there is to be no Ananda. Why, the self-giving itself is a profound Ananda and what it brings, carries in its wake an inexpressible Ananda—and it is brought by this method sooner than by any other, so that one can say almost : "A selfless self-giving is the best policy". Only one does not do it out of policy. Ananda is the result, but it is done not for the result, but for the self-giving itself and for the Divine himself—a subtle distinction, it may seem to the mind, but very real.

Sri Aurobindo

কথাটা নতুন নয়। অহৈতুকী ভক্তির ভিৎ—এই ভগবানের জন্যে ভগবানকে চাওয়াই বটে। শ্রীচৈতন্যদেবের বিখ্যাত "শিক্ষাষ্টকে" তিনি এই মন্ত্রেরি দীক্ষা দিয়ে গেছেন—বৈষ্ণবমহাজনদের কণ্ঠে আজও গীত হয় :

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

[চায় না আমার প্রাণ ধনজন যশোমান, দয়িতা তিলোত্তমা, কবিতামধু।
চাই শুধু—যেন থাকে ভক্তি অহৈতুকী জন্মে জন্মে তব চরণে বঁধু !]

ভাগবতে প্রহ্লাদও চমৎকার উপমা দিয়ে এই প্রার্থনাটিই ঝঙ্কৃত করেছেন :

যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্। (৭ ১০.৪)

[সে চায় তোমার কাছে কামনাতৃপ্তিবর
সে বণিক্, নয় নয় নয় তব কিঙ্কর]

ব'লে জুড়ে দিলেন (৭১০৭):

আমাকে তবুও যদি চাও দিতে বরদান,
দিও বর: যেন কোনো কামনা না জপে প্রাণ।

বিষ্ণুপুরাণেও পাই—যখন ঠাকুর এলেন প্রহ্লাদকে বর দিতে তখন সে চাইল শুধু এই বর:

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি॥

লভি সহস্র পশুযোনি মাঝে বার বার নাথ, জন্ম যদি,
তোমার চরণে অচলা ভক্তি যেন থাকে মোর হে, নিরবধি।
ধর্ম অর্থ কাম চায় না সে, মুক্তিকেও সে চায় না মনে—
বিশ্বের মূলে অচলা ভক্তি রাজে হৃদে যার তব চরণে।

॥ সতেরো ॥

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে অনেকগুলি চমৎকার পত্র লিখেছিলেন মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে। সে সব চিঠি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM-এ মুদ্রিত হয়েছে, প্রকাশক—ভারতীয় বিদ্যাভবন বম্বে। তবু সে-চিঠিগুলির মধ্যে কয়েকটি চিঠি আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমেরও দু'একটি চিঠি অনুবাদ ক'রে এখানে পেশ করতে চাই ব'লে কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেই হবে, আরো এই জন্যে যে, এক, সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম; দুই, তার কাছে আমি গুরুভক্তি তথা কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে অনেককিছুই পেয়েছিলাম ও শিখেছিলাম যা স্মরণীয়, বরণীয়, মহনীয়। তার সম্বন্ধে আমি প্রথম লিখে ইংরাজীতে প্রকাশ করি আমার AMONG THE GREAT-এ। [বাংলায়ও কিছু লিখেছিলাম আমার "আবার ভ্রাম্যমান" ভ্রমণ-কাহিনীতে—বোধহয় ১৯৪৩ সালে, কিন্তু সে-বইটি এখন পাওয়া যায় না।]

রোনাল্ড্ নিক্সন বোধহয় ১৯২০ সালে এসে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক

হন। আমার সঙ্গে যখন তার প্রথম পরিচয় হয়—১৯২৩ সালে—তখন সে ছিল অতিথি হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথচক্রবর্তী'র। তার স্ত্রী মণিকা দেবীকে নিক্সন মা ব'লে ডাকত—তিনি তাকে গোপাল ব'লে সম্বোধন করতেন। অতঃপর সে মণিকাদেবীর কাছে দীক্ষা নেয় কৃষ্ণমন্ত্রে—তিনি তাকে নাম দেন কৃষ্ণপ্রেম যখন সে মণিকাদেবীর সঙ্গে কাশীতে যায় অধ্যাপক হ'য়ে। তার দু'তিন বৎসর পরে মণিকা দেবী "যশোদা মা" নাম নিয়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে প্রয়াণ করেন আলমোরা থেকে ষোলো মাইল দূরে মিরতোলা গ্রামে এক কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে—গভীর অরণ্যে, মঞ্জুল পরিবেশে। আশ্রমের নাম হয় "উত্তর বৃন্দাবন"। আমি সেখানে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম পরমানন্দে বোধহয় ১৯৪৩ সালে—কিন্তু সে পরের কথা, পরে বলব।

আমাকে কৃষ্ণপ্রেম লখনৌয়ে ১৯২৩ সালে বলে শ্রীঅরবিন্দের ESSAYS ON THE GITA পড়তে। শ্রীঅরবিন্দের নানা ভাষ্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীরতার সে এত প্রশংসা করে যে, আমি বইটি পড়ি। অতঃপর কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে আমার বহু পত্রালাপ হয়েছিল—সে-আশ্চর্য পত্রাবলীর কয়েকটি আমি আমার AMONG THE GREAT-এ ছাপাই—পরে YOGI SRI KRISHNAPREM-এ আরো অনেকগুলি পত্র ছাপিয়ে প্রকাশ করি ১৯৬৫ সালে তার দেহান্তের পরে। সে কলকাতায় আমার অতিথি হ'য়ে ছিল কিছুদিন ১৯২৪ সালে। প্রয়াগে তার সঙ্গে পরে দেখা হয়। মণিকা দেবী আমার গান ভালোবাসতেন তাই তাকে ও কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রায়ই আমার নানা কৃষ্ণকীর্তন শোনাতাম। মণিকা দেবী "যশোদা মা" বলাই ভালো—আমাকে পরে আশীর্বাদ করেছিলেনঃ "ঠাকুর আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, গানের মধ্যে দিয়েই তোমার কৃষ্ণদর্শন হবে বাবা—ধ্যানের জন্যে বেশি ব্যস্ত হোয়ো না।"

এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি একটি বিশেষ অতীন্দ্রিয় দর্শনের পরে। সেটি এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৪৩ সালে যখন আমি 'উত্তর বৃন্দাবনে' গিয়ে যশোদা মা-র অতিথি ছিলাম তখন রোজই তাঁর মন্দিরে গাইতাম নানা ভজন, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণকীর্তন। এখানে মন্দিরটির একটু বর্ণনা দিতে হবে।

আমার ঘরটি ছিল যশোদা মা-র ঘরের পাশেই। তার পরে কৃষ্ণপ্রেমের ঘর। পাশে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি 'করিডোর'—শেষ হয়েছে মন্দিরের ওপাশে—যশোদা মা-র ঘর মন্দিরের এপাশে। মাঝে একটা চৌকাঠ, সেখানে বসত কৃষ্ণপ্রেমের শিষ্যা মোতিরাণী হাসিখুশী সরলা বালা—যশোদা মা-র ছোট মেয়ে। ওদিকে একটি কুটিরে থাকত হরিদাস—মা-র মন্ত্রশিষ্য—পূর্বাশ্রমের নাম আলেকসাণ্ডার। সে লখনৌয়ে

হাঁসপাতালের সার্জন ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছিল পরম বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের টানে। একটি ডিস্পেন্সারি খুলে সে পাহাড়ীদের দাওয়াই দিত। সে-গ্রামে মধ্যবিত্ত কোনো গৃহস্থই ছিল না।

কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে রোজ সৎকথা হ'ত। যশোদা মা-ও তাতে যোগ দিতেন—শরীর তাঁর খুব খারাপ হওয়া সত্বেও। কৃষ্ণপ্রেমের নানা উজ্জ্বল উক্তি আমি আমার ডায়রিতে টুকে রাখতাম—পরে আমার YOGI SRI KRISHNAPREM-এ প্রকাশ করি। কৃষ্ণপ্রেম আদৌ চাইত না তার সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসেই লিখতাম বাংলায় ও ইংরাজীতে—সেজন্যে সে সময়ে সময়ে বিষম রাগ করত, বলত বিজ্ঞপ্তিতে তার সাধনার ক্ষতি হয়। আমার সাফাই ছিল এই যে, মহাজনদের কথা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়—তুজনদের দাপাদাপির প্রতিষেধক হ'তে পারে কেবল সাধুদের জ্ঞানবাণী ও ধর্মজীবন। কিন্তু এখানে তার কথা সংক্ষেপেই বলতে হবে—অন্যত্র তার সম্বন্ধে ফলিয়েই লিখেছি ব'লে। তবু তার কথা বলতে হচ্ছে কারণ সে আমাকে তার বলিষ্ঠ সমর্থন দিত যখন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে কৃষ্ণপূজার জন্যে আমার অনেক গুরুভাই আমার 'পরে অপ্রসন্ন হ'য়ে বলতেন যে, যেহেতু কৃষ্ণ Overmental এর প্রবর্তক সেহেতু তাঁকে বরণ করা শ্রীঅরবিন্দের Supramental যোগে দুষ্য, কেন না শ্রীঅরবিন্দ সুপ্রামেণ্টাল অবতার। ফলে বিপন্ন হ'য়ে আমি যখন মাঝে মাঝে কৃষ্ণপ্রেমকে লিখতাম তখন সে জোরালো সুরেই বলত যে, কৃষ্ণ যখন আমার ইষ্ট তখন তাঁকে চাইলে আমার কোনো অপরাধ হ'তেই পারে না। কিন্তু এসম্বন্ধে পরে লিখছি, তাই এখানে থেমে বলি 'উত্তর বৃন্দাবনে' অপূর্ব অঘটনের কাহিনী [যদিও একথা লিখেছি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM তথা "ছায়াপথের পথিক"-এ]।

সেদিন মন্দিরে আমরা ভজন করতে বসেছি কৃষ্ণপ্রেম মাঝে—তার ডান পাশে আমি আসীন, বাঁ পাশে মোতিরাণী চৌকাঠের কাছে আসন পেতে—চৌকাঠের ওদিকে যশোদামার ঘর। কৃষ্ণপ্রেমের আরতির শেষে আমি ধরলাম তার সবচেয়ে প্রিয় গান আমার "বৃন্দাবনের লীলা"—গ্রামোফোনে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল—অনেকের মতে এই গানটিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন—কৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা। গাইতে গাইতে আমার বুকের তার বেজে উঠল। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবস্থা, মোতিরাণীর চোখের জলে নদী ব'য়ে গেল। গানের শেষে মন্দিরে থমথমে ভাব। আমরা সবাই নিশ্চুপ। এমন সময়ে হরিদাস এগিয়ে এসে (সে বসত আমাদের ঠিক পিছনে) কৃষ্ণপ্রেমকে বলল: "জানো, মা বাইরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে দিলীপের গান শুনছিলেন।"

কৃষ্ণপ্রেম (চম্‌কে উঠে) : সে কি ? মা ? খোলা বারান্দায় ?

মোতিরাণী (শিউরে উঠে) : মা-র বুকে সর্দি বসেছে যে !

হরিদাস (সায় দিয়ে) : বটেই তো—এই ঠাণ্ডায়—

কৃষ্ণপ্রেম : তাহ'লে মা নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে ঘুরে এসেছিলেন গান শুনতে। কারণ এদিকের চৌকাঠের কাছে মোতিরাণী ব'সে ছিল—চলো তো।

আমরা সবাই পর পর চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকলাম যশোদা মা-র ঘরে। দেখলাম—মা জলভরা চোখে খাটের উপর ব'সে—ঠায় মন্দিরের দেয়ালের দিকে চেয়ে।

কৃষ্ণপ্রেম : মা ! তুমি কী ব'লে—

মোতিরাণী : শ্‌—শ্‌ ! দেখছ না, মা ভাবসমাধিতে !

আমরা সবাই হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

কিছুক্ষণ পরে সাড ফিরে আসতেই যশোদা মা আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে ডাকলেন হাতছানি দিয়ে। আমি আসতেই ধরা গলায় বললেন : "বোসো বাবা —না মাটিতে নয়—আমার খাটে—কাছে স'রে এসো—আরো কাছে।"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বসলাম খাটে মা-র পায়ের কাছে—ওরা তিনজন রোজকার মতন মাটিতেই বসল সতরঞ্চের উপর।

মা (গাঢ় কণ্ঠে) : কিছু দেখতে পেলে না, বাবা ?

আমি (আশ্চর্য হ'য়ে) : দেখতে কী মা ?

মা (অশ্রুল কণ্ঠে) : ঠা···ঠাকুর।

আমার দেহের মধ্যে শিহরণ জেগে উঠল, বললাম : "ঠাকুর ? মানে কৃষ্ণ ?"

মা : ঠাকুর আর কে বাবা ? (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ জোর ক'রে পরিষ্কার ক'রে) তুমি যখন···শেষের দিকে·· মানে, আঁখর দিচ্ছিলে না চোখের জলে ?—ঠিক সেই সময়ে··· হ্যাঁ, ঠাকুর এসেছিলেন···হ্যাঁ বাবা, প্রথমে আমার ঘরে। তারপর ঐ চৌকাঠ পেরিয়ে ···মন্দিরে। আমি তো চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে পারতাম না—মোতিরাণী ব'সে ছিল না ?···কাজেই আমাকে···ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হ'ল···ঠাকুরের ডাক··· না গিয়ে পারি ?···তিনি তোমার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে গান শুনছিলেন···হ্যাঁ বাবা···আমি দেখেছি খোলা চোখেই···কিন্তু তুমি দেখতে পাও নি ?

আমি (বিহ্বল হ'য়ে) : না মা ··তবে···মানে···

মা (থেমে থেমে গদ্‌গদ কণ্ঠে) : হ্যাঁ বাবা···ঠাকুর নিজে এসেছিলেন ··আর ছিলেন শেষ পর্যন্ত। তোমার দিকে চেয়ে—ঠোঁটের কোণে হা·· হাসি। ও ঠা··· ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর !

আমি মায়ের পায়ে মাথা রাখলাম···চোখের জল আর বাধা মানল না।

আমার দর্শন হ'ত না—বলেছি। তাই মনে আমার আনন্দের আলো ছড়িয়ে পড়ার পরেই ফের ক্ষোভ জেগে উঠল। তবে মনে পড়ল—পরে মা আরো একটি কথার পুনরুক্তি করেছিলেন, তাতে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম—যে, তিনি দেখতে পেয়েছেন—গানের মধ্যে দিয়েই আমার বস্তুলাভ হবে ধ্যান না করলেও। এর পরেও ধ্যান করেছি প্রায় রোজই (না ক'রে পারি?) কিন্তু ধ্যানের পরে বিষাদ আর আমাকে ছেয়ে ধরত না, মনে পড়ত ব'লে যশোদা মা-র আশ্বাস।

কিন্তু এখানে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। কারণ অনেকে হয়ত আমাকে ভুল বুঝবেন, ভাববেন ধ্যানে আমি কখনোই কিছু পাইনি। যা চেয়েছিলাম—মানে ইষ্টদর্শন,—তা পাই নি বটে, কিন্তু এমন অনেক উপলব্ধি হয়েছিল যার ফলে আমার পথ চলা একটু একটু ক'রে সহজ হ'য়ে আসছিল—এমন কি, আমি কর্ম্মকেও যোগ ব'লে বরণ করতে আর তেমন বেগ পেতাম না। তাই আমার ধ্যানে পাওয়া কয়েকটি উপলব্ধির কথা এখানে বলব—যদিও PILGRIMS OF THE STARS-এ কিছু কিঞ্চিৎ বিবৃতি দিয়েছি।

ধ্যানে বসে অনেক সময়ে আমার মাথার ঠিক উপরে—ব্রহ্মরন্ধ্রে—একটা চাপ অনুভব করতাম—যার ফলে আমার মানসিক চঞ্চলতা গ'লে এক শীতল নৈঃশব্দ্য গাঢ় হ'য়ে উঠত—কখনো কখনো শান্তিতে ছেয়ে যেত দেহ মন—ফলে আমার মানস চেতনার গণ্ডী থেকে যেন কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পেয়ে স্নিগ্ধ বোধ করতাম। শ্রীঅরবিন্দকে সব বর্ণনা ক'রে একবার লিখেছিলাম: "On occassions I felt a heave in my heart—or shall I say, an ascent of my I-ness till it became very rarefied and faint."

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন (১৩. ১০. ১৯৩০)*:

"এটি যোগের একটি মূল উপলব্ধি (fundamental experience)—চেতনার আরোহণ ভাগবত চেতনার সঙ্গে যুক্ত হ'তে · এরই ফলে তুমি শান্তি পাও। তোমার এ সময়ে দেহ নিথর হয় নৈঃশব্দ্যের অভ্যুদয়ে। এইই হ'ল অধ্যাত্ম অনুভূতির ভিৎ—যার বিকাশ হবে চেতনার মুক্তিতে।"।

---

* এ চিঠিগুলি অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমি সংক্ষেপে ভাবার্থটুকু পেশ করেছি। যাঁরা জিজ্ঞাসু তাঁরা PILGRIMS OF THE STARS-এ ষোড়শ অধ্যায়ে মূলপত্রগুলি পড়তে পারেন। যাঁরা যৌগিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সম্বন্ধে তেমন উৎসুক নন তাঁরা এ-সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকে কিছু খবর অন্তত পাবেন—যোগে কী ধরণের অনুভূতি আমার হয়েছিল তথা আরো অনেক সাধকের হয়। আমি এ-অনুভূতিগুলির উদ্ধৃতি দিচ্ছি—শ্রীঅরবিন্দের চিঠিগুলির খবর দিতে।

আমার আর একটি উপলব্ধি হয়েছিল বড় বিচিত্র। ধ্যান করতে বসতেই অনায়াসে ধীর স্থির এক অবস্থা—যার মধ্যে শান্তির অখণ্ড রাজত্ব। আমি সচেতন অথচ যেন অর্ধতন্দ্রা—**half-sleep.**

শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করলেন (জুন ২, ৩১): "অর্ধতন্দ্রা নয়, সিকি তন্দ্রাও নয়, সিকির সিকি তন্দ্রাও নয়। হয়েছিল কি, তোমার চেতনা অন্তর্মুখী হ'তেই বাইরের কিছু আর ঢুকতে পারল না···এ হ'ল সমাধির শুরু (নির্বিকল্প নয় অবশ্য)। আমাদের চেতনা বড় বেশি বহির্মুখী ব'লে তাকে অন্তর্মুখী না করলে সে আন্তর লোকে বিচরণ করতে পারে না। কিন্তু অভ্যাস করলে মানুষ বাহ্য চেতনা বজায় রেখেও আন্তর চেতনায় স্থিতধী হ'তে পারে।·· তখন দিব্য নৈঃশব্দ্যের অনুভূতিলোকেও জাগ্রত অবস্থায়ই হবে এক মহত্তর ও শুদ্ধতর চেতনার অবতরণ।"

যোগীরা সবাই বলেন যোগে দীক্ষা পাবার পরে গুরুশক্তির ক্রিয়া সুরু হয় স্বপ্নেও। আমার নানা উপলব্ধি হ'ত স্বপ্নে। একদা দেখলাম এক বিষধর জ্বলন্ত সাপ (গোখরো) আমার কাছে স'রে এসে ধীরে ধীরে আমার মাথায়—ব্রহ্মরন্ধ্রে—ছোবল দিল। আমার মনে আতঙ্ক আসা তো দূরের কথা, আমার সমস্ত দেহে এক অবর্ণনীয় আনন্দের শিহরণ ব'য়ে গেল। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমি অর্ধসচেতন ছিলাম যদিও আমার দেহ ছিল ঘুমে অচল। শ্রীঅরবিন্দকে একথা লিখতে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন (১. ১১ ৩২ PILGRIMS ১৬২ পৃঃ):

"তোমার স্বপ্ন সুন্দর ও সব সত্য যদি প্রতীক ব'লে তাকে চিনতে পারো। প্রসঙ্গতঃ এ স্বপ্ন নয়—সংহৃত বহির্মুখী চেতনালব্ধ উপলব্ধি—তুমি জেগেই ছিলে কিন্তু ঠিক বাস্তব জাগরণের স্তরে নয়, আর এক স্তরে।

"সাপের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এ স্বপ্নটি তোমার কাছে এসেছিল ভগবানের উত্তর। তুমি প্রায়ই বলতে যে, ভগবান্ তাঁর ঠিক লীলা প্রকট করতে চান না—যদি তোমাকে জানিয়ে দিতেন যে, বাধারা তোমাকে ইষ্টমিলনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে তাহ'লে তোমার মন স্বস্তি পেত। এ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি তোমাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি তাঁর সঙ্গে খেলার ঠিক ছন্দটি জানলে তিনিও তোমার সঙ্গে খেলতে রাজী। সাপের ছোবল তোমাকে দেখিয়ে দিল যে, বেদনা বা বিপদও তোমাকে আনন্দ এনে দিতে পারে, পারে ভাগবত আবির্ভাবের দিশা দিতে।···

"আমি এ-সূত্রে তোমাকে আবার বলতে চাই—যদিও তোমার বাস্তব মন এখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারে না—যে, তুমি অন্তরে যোগীই বটে—যে পারে ধ্যান আনন্দ ভক্তির নাগাল পেতে···যদিও বাইরে তুমি ঠিক এর উল্টো—আধুনিক, বহির্মুখী, প্রাণোচ্ছল যে যোগ বা আন্তর জগতের খবর রাখে না। এ-সত্যটি তোমাকে

দেখবামাত্র আমার চোখে পড়েছিল—তোমার এর আগে নানা উপলব্ধিও যে এই সত্যেরি আভাষ দেয় একথা যে-কোনো যোগজ্ঞই বলবেন। যার মধ্যে এই আন্তর যোগী বিদ্যমান তাকে যোগপন্থী হ'তেই হবে ··অন্তিমে তার যোগসিদ্ধি অবধারিত।"

৪ ৯ ৩১ তারিখে তিনি আমার কোনো একটি আকস্মিক উপলব্ধির ভাষ্য দিয়েছিলেন এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখে। উপলব্ধিটি কুলকুণ্ডলিনীর সম্বন্ধে। এ-পত্রটির অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই শুধু এখানে সার মর্মটি দিই:

"এ-উপলব্ধিটি হ'ল তোমার বাহ্য চেতনা ও আন্তর স্বরূপের মধ্যে যে-পর্দা আছে তাকে ভেদ করা। এটি আসলে যোগের একটি প্রধান প্রগতির সূচনা। মূলে এ হ'ল চেতনার গভীর জাগরণের ফলশ্রুতি - অন্তর্মুখী তথা ঊর্ধ্বগতি।···এটিকে বলা যেতে পারে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের সগোত্র···যে-শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ষট্‌চক্রভেদ ক'রে সহস্রারে পৌঁছয় ভগবৎমিলন মুখে।"

I have said already that your experience was, in essence, the piercing of the veil between the outer-consciousness and the inner being. This is one of the crucial movements in Yoga. For Yoga means union with the Divine, but it also means awakening first to your inner self and then to your higher self—a movement inward and a movement upward. ···In your former experiences the inner being had come to the front and for the time being impressed its own normal motions on the outer consciousness to which they are unusual and abnormal. But in this meditation what you did was—for the first time, I believe —to draw back the outer consciousness, to go inside into the inner planes, enter the world of your inner self and wake in the hidden parts of your being. That which you were then was not this outer man, but the inner Dilip, the Yogin, the *bhakta*. When that plunge has once been taken, you are marked for the Yogic, the spiritual life, and nothing can efface the seal that has been put upon you. All is there in your description of this complex experience—combining all the signs of this first plunge. ···It is a movement analogous to that on which so much stress is laid in the *Tantrik* process, the awakening of the

***kundalini*, the Energy coiled up and latent in the body, and its mounting through the spinal cord and the centres (*chakras*) and the *Brahmarandhra* to meet the Divine above.**

গুরুদেবের জীবদ্দশায় আমার আরো কয়েকটি আন্তর উপলব্ধি হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি থাক, বলি দুটির কথা—যদিও ভাষায় এ-ধরণের আত্মিক অনুভূতির কথা লেখার পরে মন প্রশ্ন করবে: "যা অনির্বচনীয় তাকে কথার রেখা রঙে আঁকতে চাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়?"

মনে হয় এক এক সময়ে যে, মনের কুণ্ঠাকে মেনে চলাই ভালো—বিশেষ ক'রে দর্শনের কথা গোপন রাখা সম্বন্ধে। কিন্তু তার পরই মনে হয়—জিজ্ঞাসুরা সম্ভবতঃ একটু আশ্বস্ত হবেন ভেবে যে, আমার মতন সংশয়ীরও যখন দর্শন হয় তখন তাঁরা বিশ্বাস করলে হয়ত শেষ পর্যন্ত ঠকবেন না। ভাগবতে দুরকম বিধানই পাই—এক মন্ত্রগুপ্তির, অদিতিকে বলছেন কাশ্যপ মুনি—"সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্": "দৈব কাহিনী প্রকাশ না করলেই পুরোপুরি সক্রিয় হয়।" আবার দেখি নানা ভক্তের দর্শনের মনোহর বর্ণনাও আছে যা প'ড়ে ভক্তি জাগে। দ্বিবিধ বিধানই যখন আছে আর যখন দর্শনের কথা বলতে ভালো লাগে তখন বললে কি ঠাকুর সত্যি সাজা দেবেন তূর্ণ প্রস্থান ক'রে? একথা বলছি, কারণ নানা সাধক ভয় দেখান যে, দর্শনের কথা বললে আর দর্শন হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসন্তদাস, শ্রীরামদাস কোঙ্কনী, যশোদা মা, কৃষ্ণপ্রেমের ইন্দিরার মুখেও শুনেছি দর্শনবর্গীয় নানা উপলব্ধির কথা। তাই ভেবে চিন্তে ব'লেই ফেলি দুর্গা ব'লে।

প্রথমটি স্বপ্ন অনুভূতি—এব বিবৃতি আমার "অনামিকা সূর্যমুখী"-তে লিখেছি কবিতায়—২৪৩-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য:

পণ্ডিচেরিতে আমার ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শন ঘটে নি—স্বপ্নেও না। ১৯৫৩-এ হরিকৃষ্ণ মন্দিরে এসে ভজন পূজন সুরু করার পরে সর্বপ্রথম ১৯৫৫ সালে আমি হঠাৎ পর পর দুবার ঠাকুরের দর্শন পাই—কিন্তু অস্পষ্ট, ছায়াময়। প্রথমবার দর্শনের সঙ্গে সুগন্ধ পাই। কৃষ্ণপ্রেমকে খুলে লিখতে সে আলমোরা থেকে ১লা অক্টোবরে একটি বড চিঠি লিখেছিল এসম্বন্ধে। কিন্তু সে-চিঠিটি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM-এর ২৩০-১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ব'লে বলি এর পরের দর্শনের কথা ৩১. ১ ৬৯ তারিখে, নিশুত রাতে। মনে হ'ল—স্বপ্নের মধ্যে—যেন মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে শক্তি উঠছে —কুলকুণ্ডলিনীই হবে হয়ত। তার পরেই আকাশে গর্জন—বজ্রনাদ ও বজ্রপাত। আমার মনে ভয় আসে নি একটুও, আমি ঠাকুরের নাম জপ ক'রে চলি। বাজ পড়ল—তারপর আমি একটু ফলিয়েই লিখে রেখেছি দর্শনের রেকর্ড—রাখতে সাধ

হয়েছিল ব'লে। প্রথমে ভেবেছিলাম প্রকাশ করব না এ-স্বপ্নদর্শন। তারপরে মনে হ'ল—আমার নিজের স্বভাব ও বিবেক মেনে চলাই ভালো—মিথ্যা কথা যখন বলছি না তখন এ-বর্ণনা প্রকাশ করলে প্রত্যবায়ের প্রশ্ন উঠবে কেমন ক'রে? তাই আমার অনামিকা-সূর্যমুখী থেকে উদ্ধৃতি দিই :

গ'র্জে ওঠে কালান্তরের বজ্র নীলাকাশে :
"পৌরাণিকী কৃষ্ণগাথা রঙিন মায়াছবি।
ভক্ত! পাতিস কার কাছে হাত কল্পনা-উচ্ছ্বাসে?
কোন্ নাস্তির জয়ধ্বনি করিস মূঢ় কবি?...

"খুশখেয়ালে আমি গ'ড়ে এ-বিশ্ব খান খান
করি তাকে পরে আবার। নেই কোথাও আমার
প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দয়াল তারক শক্তিমান,
জ্বালিয়ে জ্যোতিষ্কদের তাদের ছাই করি আবার।

আমারি তেজ সূর্যচন্দ্র নীহারিকায় জ্বলে
চমকশিখা দীপালিকায়। আমারি আজ্ঞায়
অচিন্ত্য এক নিয়ম মেনে বৃন্দ তারা চলে
লক্ষ্যহীন অনন্ত ব্যোমে অশান্ত জ্বালায়।..."

ভক্ত হেসে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করে একমনে,
বজ্রনাদে জাগে শুধু অন্তরে প্রার্থনা :
"ভয় নেই আমার মরণকে নাথ, যদি শ্রীচরণে
দাও তুমি ঠাঁই ওগো আমার চির-আরাধনা!"...

বজ্রপাতে ঝল্‌কে ওঠে বহ্নি লেলিহান,
নীরন্ধ্র তমসায় কিছুই যায় না দেখা, ও কি?
কে সে আমায় ধ'রে আছে দয়াল, মহীয়ান্?
গেয়ে ওঠে "মা ভৈঃ মা ভৈঃ" কন্যাশিষ্যাসখী!

আর কেউই নেই কোথাও—শুধু বহুমূলের 'পরে
কোমল পরশ কার? কে টেনে আনে মহাবল?
দুটি চরণ...মরি মরি!...দেখি নয়ন ভ'রে :
"এ কি শ্যামল, সত্যি তোমার চরণ-শতদল—

"যার ধ্যান আমি করেছি নাথ, বাদলে কিরণে
কল্পনার অসাঙ্গরাগে মধুর স্বপ্ন বরি'—
যার গান গায় মুনি ঋষি ভক্তির কীর্তনে
এ কি তোমার মরণহরণ সেই শ্রীচরণ, হরি!

প্রশ্নের দেয় সাড়া পুলক অঝোর বন্যাধারে,
জিজ্ঞাসা তার থাকে কি আর যে পায় নিরাশ্রয়
শান্তিঝরা দুঃখহরা তোমার চরণপারে?
এ-জীবনের সব জ্বালা তার হয় পলকে লয়।

স্বপ্ন ভেঙে যায়, কিন্তু সে অপরূপ শ্রীচরণের মধুর স্মৃতিরেশ ছেয়ে থাকে দেহে মনে। মনে পড়ল গুরুদেবের একটি কথা: যে, অনেক সময় আন্তরচেতনা স্বপ্নে প্রকট হয় স্বপ্নের অবচেতন স্তরকে দাবিয়ে। এ-অমূল্য উপলব্ধিটির পরে কেবল দুটি খেদ আমাকে বিষণ্ণ করেছিল: এক, শ্রীঅরবিন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমের কাছে আমি বলতে পারলাম না আমার উচ্ছ্বাসের কথা, দুই, জাগ্রত ধ্যানে ঠাকুরের চরণদর্শন হ'ল না। তবে সান্ত্বনা ছিল এই যে স্বপ্নেও যখন আন্তর চেতনা সর্বেসর্বা হ'য়ে ওঠে তখন তার সত্যদীপ্তি হয়ত ধ্যানলব্ধ উপলব্ধির মহিমার জুড়ি হ'তেও পারে।

এ-দর্শনটির মধ্যে কিন্তু তবু একটি অতৃপ্তির কাঁটা আমাকে খচ খচ ক'রে বাজত: যে, ঠাকুরের চরণ দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হ'লেও তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি নি নয়ন ভ'রে—কারণ আমি দেখেছিলাম তাঁর মুখের একধার মাত্র—profile—আর তা-ও আবছায়া। হোক, তবু এ-দর্শন আমার জীবনে একটি অমূল্য দর্শনই বলব—তাঁর চরণ দর্শন কি সোজা কথা? পুরাণে ভাগবতে বার বার পাই কী সব অপূর্ব উচ্ছ্বাস ঠাকুরের চরণকমল নিয়ে।

প্রসঙ্গতঃ, আরো দুটি কথা বলার আছে: এক, যখন আকাশ থেকে বজ্রপাতে সব লুপ্ত হ'য়ে গেল তখন শুধু ইন্দিরা ছাড়া আর কেউ কোথাও ছিল না; দুই ঠাকুর হঠাৎ আমার দেহকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে রাখলেন তার পিঠের উপর, যেমন মা অনেক সময়ে রাখে শিশুকে। ভাবতে আজো আনন্দ হয় যে, এর মানে ঠাকুর আমার ভার নিলেন পুরোপুরি—আমার পার্থিব দেহকে বহন করতে রাজী হ'য়ে। করুণা আর কার নাম?

যে-তনু ক্লিন্ন, গুরুভার, মৃন্ময়,
পরশে তোমার হয় নাথ, চিন্ময়।

ধূলিও তখন উচ্ছ্বসি' গায় গান :
"আমাকেও পাখা দিতে পারে ভগবান্ !"

॥ আঠারো ॥

কৃষ্ণপ্রেমের কথা আরম্ভ করে আমার নানা যৌগিক উপলব্ধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে কৃষ্ণদর্শনের কথায় গত অধ্যায় সমাপ্ত করেছি। এবার ফিরে খেই ধরি, কৃষ্ণপ্রেমের—কৃষ্ণপ্রেমের কাছে ঋণ স্বীকার করতেও বটে।

হয়েছিল কি, আশ্রমে এসে দেখতাম—কৃষ্ণের কথা কেউ বলে না। আমার ধারণা হয়েছিল—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত উত্তরপাড়া-ভাষণ প'ড়ে—যে, কৃষ্ণই শ্রীঅরবিন্দের ইষ্ট। হয়ত ভুল ভাবি নি, কিন্তু আশ্রমে কারুর মুখেই একথা শুনি নি কোনোদিন। অথচ তাঁর উত্তরপাডা-ভাষণে কৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উচ্ছ্বাস প'ড়ে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আমি ধ'রে নিয়েছিলাম তিনি আমাকে কৃষ্ণের পায়ে পৌঁছে দেবেনই দেবেন। কৃষ্ণপ্রেম প্রায়ই বলত : "গুরু এক হাতে ধরেন শিষ্যের মাথা অন্য হাতে কৃষ্ণের পা—তারপর শিষ্যকে টেনে এনে মিলিয়ে দেন কৃষ্ণের সঙ্গে।" বৈষ্ণবাচার্যদের এজাহারেও পড়েছিলাম যে, কৃষ্ণভক্তদের একটি পরম উপলব্ধি হয় যখন গুরু শিষ্যকে টেনে এনে নিজে কৃষ্ণের পায়ে মিলিয়ে যান—জানিয়ে দিয়ে যে, গুরু কৃষ্ণ অভেদ। কিন্তু আমার ভাবতে বেশি ভালো লাগত আর একটি প্রসিদ্ধি : যে, গুরু কৃষ্ণের দাস সখা বা প্রতিনিধি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নন। কি জানি, কোনো মানুষ যে কৃষ্ণের "ভগবান্ স্বয়ং" পদবী পেতে পারেন এ চিন্তায় আমার মন কিছুতেই সাড়া দিত না। অথচ কৃষ্ণপ্রেমও বলত যে, গুরু কৃষ্ণ এক। কিন্তু আমার মনে এ-বিষয়ে দ্বিধা ছিল ব'লে আমি আকাশপাতাল ভেবে অস্থির হ'য়ে শেষে স্থির করেছিলাম : "এখন এ-জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে না চেয়ে সাধনায় এগুনো যাক তো, পরে "অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষুকে গুরু তাঁর জ্ঞানশলাকায় উন্মীলিত" করলে পর ঠিক করব—কৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দ হ'য়ে জন্মেছেন কি না, এখন তো যোগের বিশেষ কিছুই জানি না, তাই এ-তর্কের নিষ্পত্তি মুলতুবি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মোটামুটি, এই ছিল আমার অজ্ঞ মনের বিজ্ঞ রায়। আমার মনে হয় না যে, আমার এ-রায়ের পিছনে ছিল কোনো ছদ্ম অহঙ্কার যে মেনেও মানতে চায় না। অবশ্য আমার নানা গুণ গৌরবের অহঙ্কার, বহু পাঠিতার অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার ছিল বৈ কি, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার কোনোদিনই ছিল না। তাই মহাজনদের কাছে নত হ'তে আমার

কোনোদিনই যে শুধু বাধে নি তা নয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথায় আমার মন সানন্দেই সাড়া দিত যে :

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥*

কিন্তু আশ্রমজীবনে শুধু তো গুরু নয় আরো অনেক কিছুর অস্তিত্ব ও প্রভাব আছে যারা সহায়ও হ'তে পারে বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারে। আমার একটি বাধা হ'য়ে দাঁড়াল—আমার এই সেকেলে মনোভাব—আবাল্য মহাভারত রামায়ণ পুরাণ প'ড়ে এসেছি তো, কৃষ্ণঠাকুরকে বরণ ক'রেও এসেছি আমার স্বভাব-উচ্ছ্বাসী মন দিয়ে। আজো মনে পড়ে ছেলেবেলায় পিতৃদেবের কৃষ্ণভক্তি দেখে আমার কিশোর মনের উজিয়ে ওঠার কথা, বিশেষ যখন তিনি গাইতেন—যে-গানটি পরে আমিও গাইতাম যত্র তত্র, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে (লঘুগুরু ছন্দে গেয়) :

জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভবভয়হারী !
জয় কেশব মধুসূদন জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী !
গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী ! যমুনাতীর নিকুঞ্জবিহারী !
শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্তবিনোদনকারী !

গাইতে গাইতে তাঁর সুগৌর মুখ ভক্তির আবেগে রাঙা হ'য়ে উঠত—চোখেও জল ভ'রে আসত—যে-উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াচে আমার বুকেও ডমরু বেজে উঠত। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলি—অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একদা এক সন্ন্যাসী নীতিবাদী কৃষ্ণকে নিন্দা ক'রে এক প্রবন্ধ লেখেন। পিতৃদেব একটি সুচিন্তিত প্রতিবাদের শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন : "ভাবপ্রবণ বাঙালীর প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (সে প্রকৃতই হোক, প্রক্ষিপ্তই হোক বা রূপকই হোক) চিরকাল আদরের জিনিষ, আরাধনার বস্তু। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনো অন্তরের সহিত আর কাহাকেও গ্রহণ করিবে না, করিতে পারে না। আমরা মহাভারতের কৃষ্ণ বা রামায়ণের রামকে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারি, পূজাও

---

* আমার "কৃষ্ণকথাকাহিনী"-তে আমি এ শ্লোকটির অনুবাদ করেছি :

হয় না শুভমতি সঙ্গ বিনা সাধু মহাজনের, যাঁরা নিরভিমান,
সাধুর পদরজে অঙ্গ অভিষেক না করি' শ্রীহরিরে আত্মদান
করিতে কে বা পারে ? ভবে অনর্থের দুঃখবাধা যত লুপ্ত হয়
শুধু সে-সুলগনে যখন লভে জীব ভক্ত চরণের প্রেমাশ্রয়। (ভাগবত ৭/৫/৩২)

করিতে পারি। কিন্তু আরাধনা করিব, ধ্যান করিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব ঐ বৃন্দাবনের চপল, ননীচোরা, বংশীধারী রাসবিহারী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে।"*

এহেন পিতৃপ্রতিভামুগ্ধ কৃষ্ণোচ্ছ্বাসী পুত্র শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে দেবোপম গুরুর অজস্র স্নেহে ধন্য হ'লেও গুরুভাইদের কাছে তার কৃষ্ণভক্তির কোনো সাড়া না পেয়ে যে সময়ে সময়ে বিমর্ষ হ'য়ে পড়বে এ আর বিচিত্র কি?—শুধু বিমর্ষ নয়, আমি রীতিম'ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতাম যখন শুনতাম শ্রীঅরবিন্দের সুপ্রামেণ্টাল যোগে দীক্ষা নিলে সাধকদের থাকতে হবে কেবলমাত্র গুরুর মুখ চেয়ে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে এঁরা ঠিক বিরুদ্ধ মন্তব্য করতেন তা নয়—কেমন ক'রে করবেন? শ্রীঅরবিন্দ কি নিজেই একটি কবিতায় লেখেন নি (Last Poems, KRISHNA, ১৫.৯.৩৯ তারিখে লেখা, ১৭ পৃঃ):

At last I find a meaning of soul's birth
Into this universe terrible and sweet,
I who have felt the hungry heart of earth
Aspiring beyond heaven to Krishna's feet.
I have seen the beauty of immortal eyes,
And heard the passion of the Lover's flute,
And know a deathless ecstasy's surprise
And sorrow in my heart for ever mute.

জেনেছি অন্তিমে আজ—অন্তরাত্মা আমার লভিল
জন্ম কেন এই ঘোর শঙ্কাকুল মধুর ভুবনে,
ক্ষুধার্ত ধরার হৃদিস্পন্দ হৃদে করি' অনুভব
চেয়েছি শরণ কেন স্বর্গাতীত কৃষ্ণের চরণে।

দেখেছি সৌন্দর্য আমি তার মৃত্যুহীন নয়নের,
শুনেছি সে-বল্লভের উচ্ছ্বসিত মুরলীঝঙ্কার।
জেনেছি তাহার অমরণী মহানন্দের বিস্ময়,
দুঃখতাপ চিরতরে শান্ত হ'য়ে গেছে স্পর্শে যার।

শ্রীঅরবিন্দ যখন আলিপুর জেলে ছিলেন তখন সেখানে কী অঘটন ঘটেছিল তিনি

---

* শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলাল"। প্রাপ্তব্য: অধ্যয়ন ২০/১ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা, প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ।

জেলে থেকে বেরিয়ে এক ভাষণে বলেন (Uttarpara speech): তা থেকে কিছু অনুবাদ দিচ্ছি, বক্তৃতাটি সুলভ্য ব'লে:*

"আমি যখন পাদচারণ করছিলাম তখন তাঁর শক্তি আমার মধ্যে আবার প্রবেশ করল। আমি জেলের দিকে চাইলাম···দেখলাম বাসুদেব আমাকে ঘিরে রেখেছেন জেলরূপে। আমার কারাকক্ষের সামনের গাছের নিচে হেঁটে গেলাম—কিন্তু কোথায় গাছ? আমি দেখলাম সাক্ষাৎ বাসুদেব, কৃষ্ণ আমার মাথায় ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার কারাকক্ষের লৌহদণ্ড—সেখানেও ফের বাসুদেব—স্বয়ং নারায়ণ আমার পাহারা! আমি সেই কুটকুটে কম্বলে শুলাম, কিন্তু কম্বল তো নয়—আমার বন্ধু ও বল্লভ কৃষ্ণের ভুজবল্লী আমাকে আলিঙ্গন করেছে···আমি বিরোধী উকিলের দিকে তাকালাম—কিন্তু দেখলাম যে সেখানেও আসীন আমার বন্ধু ও বল্লভ। তিনি হেসে বললেন: ভয় কি? আমি সকলের মধ্যেই আছি···আমি তোমাকে রক্ষা করছি জেনো—মা ভৈঃ।"

উত্তরপাড়া ভাষণে আরো বহু চিত্তচমৎকার বাণী আছে কিন্তু সে সবের অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, এ-ভাষণটি প'ড়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, আমাদের মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণের বরেণ্য ভক্ত তথা মহীয়ান্ প্রতিনিধি।

এই হ'ল পটভূমিকা। এবার বলি আমি অস্বস্তি বোধ করা সুরু করলাম কেন ও কী ভাবে।

সময়ে সময়ে এর ওর তার মুখে গম্ভীর ভাব দেখতাম যখনই কৃষ্ণ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কিছু বলতাম। আমি স্পর্শকাতর মানুষ—ঘা খেতাম। সবাই জানে যদুবাবু যাঁকে পূজার্হ মনে করেন মধুবাবু তাঁকে "তেমন-কিছু নয়" ভাবলে যদুবাবু ও মধুবাবুর মধ্যে একটু ব্যবধান মতন আসেই আসে, যে-ব্যবধানের জন্যে দায়িক মুখ্যতঃ সেই স্রষ্টা যিনি উভয়ের মন গড়েছেন। যদুবাবু যদি ভগবান্ বলতে বোঝেন কৃষ্ণকে আর মিস্টার স্মিথ বোঝেন খৃষ্টকে তাহ'লে কেউই কিছু মনে করে না, ধ'রে নিয়ে যে, দুজনের ইষ্টদেব আলাদা হওয়ার মূলে আছে ধর্মভেদের জন্যে সংস্কারভেদ।

কিন্তু মুস্কিল হয় যখন গুরুদাসবাবু ও কৃষ্ণদাসবাবু একই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বসবাস করেন একই আশ্রমে একই সাধনা বরণ ক'রে। গোল বাধে না তত যদি গুরু কাউকে বলেন: "তোর ইষ্ট শিব"—কাউকে: "তোর ইষ্ট কৃষ্ণ বা কালী" —যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে দিতেন তাঁর ভিন্ন সংস্কারের শিষ্যদের। কিন্তু যেখানে সাধকেরা গুরুকেই ইষ্ট ব'লে বরণ করেন, আর গুরু ইষ্ট সম্বন্ধে কোনো কিছুই উচ্চবাচ্য

*Sri Aurobindo's Speeches...Pondichery Ashram pp. 50, 51

না করেন, সেখানে কৃষ্ণসংস্কার যার মনে দৃঢ়মূল তাকে একটু বিপন্ন হ'তেই হয়—যেমন হ'তে হয়েছিল আমাকে। কেউ আমাকে আমার কৃষ্ণপ্রীতির জন্যে সোজা আক্রমণ না করলেও নানা সাধক বক্র কটাক্ষ করতেন। শুধু কৃষ্ণকে নিয়েই নয়। একদা এক প্রবীণ সাধক আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ "pigmy"—বামন। আমি শুনে বিষম ঘা খেয়ে গুরুদেবকে লিখি যে, এ-মনোভাব আমার কাছে এতই হেয় মনে হয় যে, আমি এ-আশ্রমে থাকতে পারব না—এহেন গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যদি তিনি কিছুই না বলেন। এই গোঁড়া সাধকটি এমন কথাও বলেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দেরও এই ধারণা, তিনি খবর পেয়েছেন। ক্ষুব্ধ হ'য়ে আমি লিখলাম যে, আমি আবাল্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকেই মনে ক'রে এসেছি চরম বাণী, তার "কথামৃত"—কে এযুগের গীতা, তাঁর "ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য" এই মহাবাক্যই আমাকে প্রথম ব্রহ্মচারী হ'য়ে যোগব্রত বরণ করবার প্রেরণা দিয়েছিল। শেষে লিখলাম উদ্বিগ্ন হ'য়ে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি শ্রীঅরবিন্দেরও হীন ধারণা থাকে তবে আমি পড়ব ঘোর আদর্শসঙ্কটে—কারণ আমি উভয়কেই পরমপূজনীয় তথা মহাগুরু মনে করি।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখলেন সব্যঙ্গে: "I would have been surprised to hear that I regard Ramakrishna as a spiritual pigmy if I had not become past astonishment in these matters…I shall not be surprised or perturbed if one day I am reported to have declared that Buddha was a poseur or Shakespeare an overrated poetaster or Newton a third-rate college don without any genius. In this world all is possible…I have a faint sense of spiritual values.

"It is also a misunderstanding to suppose that I am against *bhakti* or against emotional *bhakti*—which comes to the same thing, since without emotion there can be no *bhakti*. It is rather the fact that in my writings on yoga I have given to *bhakti* the highest place."

[ভাবার্থ: শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি অধ্যাত্মজগতে বামন মনে করি একথা শুনে আমি আশ্চর্য হ'তাম যদি বহুদিন আগে আশ্চর্য হওয়া না ছেড়ে দিতাম। তাই আমি আশ্চর্য হব না যদি কোনোদিন শুনি যে, কেউ বলেছেন আমি বুদ্ধকে বাতিল করেছি নটরঙ্গী ব'লে, শেক্সপীয়রকে তুচ্ছ কবি ব'লে, নিউটনকে প্রতিভাহীন অধ্যাপক ব'লে। …এও আর এক অপবাদ রটেছে আমার নামে যে, আমি না কি ভক্তিকে বরখাস্ত করি

হৃদয়াবেগের অপরাধে—যেন আবেগহীন ভক্তি ব'লে কিছু থাকতে পারে। সত্য হচ্ছে এই যে, আমি আমার নানা লেখায় ভক্তিকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছি।]

সব আশ্রমেই সাধকদের মধ্যে নানা ভাবের ভাবী জমায়েৎ হন—কেউ উদার, কেউ নিরীহ, কেউ গতানুগতিক, কেউ সঙ্কীর্ণ, কেউ পরশ্রীকাতর, কেউ সদাশয়··· শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে উদার মহৎ ত্যাগী বিদ্বান্ তীক্ষ্ণধী গভীর রসিক চটুল···সর্ববিধ স্বভাবের সাধকেরই দেখা মিলত। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের মতন কৃষ্ণভক্ত সাধক একটিও দেখিনি। মানুষ ভক্তিবাদী হ'লে চায় ভক্তের সঙ্গ, জ্ঞানমার্গী হ'লে জ্ঞানীর সঙ্গ, কবি হ'লে কবির সঙ্গ। কবিত্বের দিক দিয়ে গুরুদেব আমাকে অঢেল দিয়েছিলেন যার পরে আর সব কবির সাহচর্যই আমার কাছে বাহুল্য হ'য়ে উঠেছিল। কবি নিশিকান্ত এসেছিলেন অনেক পরে—আশ্রমে আমার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন তিনিই—শুধু কবি নন, আমার সহযাত্রী ও পরম সহায়—কিন্তু তাঁর কথা আমার "সাধু গুরুদয়াল ও কবি নিশিকান্ত" গ্রন্থে লিখেছি: যে, এ-অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন আত্মভোলা, নির্বিবাদী, রসিক ও স্বভাবনম্র। তাছাড়া, কৃষ্ণসম্বন্ধে তিনি একাধিক চমৎকার গান বেঁধেছিলেন—কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার কোনোদিনই মনান্তর হয় নি। কিন্তু তিনি ছাড়া আরো অনেক সাধকদের সঙ্গে তো আমাকে ঘর করতে হ'ত—অথচ কোথায় যেন একটা আড়াল মতন আসত তাঁদের আর আমার মধ্যে—এই কৃষ্ণভক্তি নিয়ে। একদা একজন চিন্তাশীল সাধক আমাকে স্পষ্টতই বললেন: "Krishna was a historical failure"—কিন্তু যাক এসব ফালতো কথা।* এ নিয়ে গুরুদেবের কাছে দরবার করতে তিনি আমাকে পর পর পাঁচটি চিঠি লিখলেন (আমার YOGI SRI KRISHNAPREM-এ দিয়েছি) তা থেকে সবাই আন্দাজ করতে পারবেন আমার জিজ্ঞাসার ভূমিকা। এ চিঠিগুলির মূল—ইংরাজী—আমি পরিশিষ্টে দেব, এখানে শুধু ভাবার্থ দিই: প্রথম চিঠি (১৮. ৬ ৪৩)

"আমার মনে হয় আমি তোমাকে বলেছি যে, তোমার কৃষ্ণভক্তি তোমার সাধনার অন্তরায় নয়। আমার নিজের সাধনা তাঁর দ্বারা যেমন প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তারপরে কি বলা চলে তোমায় সাধনায় তাঁর প্রভাব অবাঞ্ছনীয়? সাম্প্রদায়িকতা হ'ল আচারভিত্তি, আত্মিক উপলব্ধির অঙ্গ নয়। কৃষ্ণধ্যান হ'ল ইষ্ট-দেবের পায়ে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণকে পাওয়া মানে ভগবানকে পাওয়া—তুমি যদি তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারো তবে আমার হাতেও তা পারবে। সে যাই হোক, এসবে কিছু যায় আসে না। আমরা তোমার আনুগত্য, ভক্তিশ্রদ্ধা, গুরুসেবা

*কৃষ্ণপ্রেমকে একথা জানাতে সে হেসে আমাকে লিখেছিল: "ইনি কী ক'রে জানলেন কৃষ্ণের ঠিক কী অভিপ্রায় ছিল? (How does he know what was Krishna's intentions?"

সবই গ্রহণ করেছি। এর পরে যা দরকার আসবে যথাকালে। তাই এখন তুমি এ নিয়ে মিথ্যে মাথা বকিয়ো না।…"

এর পরে অনেকদিন বেশ আনন্দে কাটল। কিন্তু তারপরে কে একজন বললেন বৈষ্ণব ভক্তি একসময়ে যোগীদের সাধনার অনুকূল ছিল, কিন্তু এখন আর শুধু ভক্তিতে শানাবে না, চাই শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস (Supramental)* যোগকে মনেপ্রাণে বরণ করা। আমি মনকে যতই শান্ত করতে চেষ্টা করি ততই অশান্ত হ'য়ে উঠি, বলি নিজেকে: "ভালো জ্বালা! আমি সুপ্রামেণ্টালের কিছুই জানি না, তাকে বরণ করি কেমন ক'রে? বৈষ্ণব ভক্তি—অহৈতুকী ভক্তি হ'লেই আমি কৃতকৃত্য হব।" কিন্তু বললে হবে কি? সুপ্রামেণ্টাল যোগ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আমাকে অশান্ত ক'রে তুলল—বিশেষ যখন শুনলাম সুপ্রামেণ্টাল যোগে দেহের প্রতি মর্ত্যকোষ দিব্যকোষ হ'য়ে সব রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে। মনে ভয় মতন এল—তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি কৃষ্ণৈকান্ত বৈষ্ণব ভক্তিকে বরণ ক'রে গুরু-আহূত সুপ্রামেণ্টালকে পাশ কাটিয়ে? হবেও বা। তাই গুরুদেবের কাছ থেকে ফের একটি ছাড়পত্র চাইলাম নিরুদ্বেগ হ'তে। তিনি লিখলেন (১৬. ৯. ৪৪):

"কৃষ্ণ ও ভক্তি সম্বন্ধে আমার মনে হয় আমি একাধিকবার তোমাকে লিখেছি যে, কৃষ্ণপূজায় বা বৈষ্ণবভক্তিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, সুপ্রামেণ্টাল ও বৈষ্ণব-ভক্তির মধ্যেও কোনো বিরোধই নেই। বলতে কি, সুপ্রামেণ্টাল যোগ কোনো মার্কামারা সর্ববিচ্ছিন্ন যোগ নয়: সব পথেই সুপ্রামেণ্টালের দরবারে পৌঁছনো যেতে পারে যেমন সব পথেই ভগবানের দেখা মিলতে পারে ··"

উত্তরে আমি আশ্বস্ত হ'য়ে লিখলাম যে, আমি তাহলে কপাল ঠুকে চলব, কিছুদিন বিজনবাস ক'রে দেখতে চাই নিঃসঙ্গ হ'য়ে কৃষ্ণৈকান্ত হ'তে পারি কি না। তবে আমার ভয় হয়, কৃষ্ণঠাকুর তাঁর কৃপার্থীদের বড় বেশি ভোগান ব'লে। ভাগবতে তো ঠাকুর খোলাখুলিই বলেছেন যে যাকে তিনি অনুগ্রহ করেন তাকে নিঃস্ব ক'রে পথে না বসিয়ে ছাড়েন না—"যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্" (ভাগবত, ৮/২২/২৪ বলিকে বলেছেন ভগবান)

উত্তরে তিনি লিখলেন পরদিনই ফের ঈষদ্ধাস্য ক'রে (১৭. ৯. ৪৪):

"একথা ঠিকই যে কৃষ্ণ চলেন খুশখেয়ালে, তাঁর লীলায় ভক্তদের উদ্ব্যস্ত ক'রে—যে-লীলাকে ভক্তেরা সবসময়ে তারিফ করতে পারে না। কিন্তু তাঁর খেয়ালের

* আমি সুপ্রামেণ্টাল ইংরাজী শব্দটিই বেশি পছন্দ করি, কেন না এর বাংলা অতিমানস শব্দে সুপ্রা-মেণ্টালের ঝঙ্কার নেই। ঐ একই কারণে আমি Overmind এর বাংলা অধিমানস ব'লে গৃহীত হ'লেও ওভারমাইণ্ড কথাটিই উপস্থিত চালু করতে চাই।

পিছনে গাঢাকা হ'য়ে থাকে তাঁর মৎলব যা অযৌক্তিক নয়। আর যখন তিনি এ-লীলার গুটি কেটে বেরিয়ে এসে ধরা দিয়ে চান ভক্তের সঙ্গে দহরম মহরম করতে তখন তাঁর অবর্ণনীয় রূপলাবণ্য তার সব দুর্ভোগেরই ক্ষতিপূরণ করে। তুমি বিজন-বাস করতে চাইছ—বহুৎ আচ্ছা।"

কিছুদিন পরে আমি গুরুদেবকে লিখলাম: "যতই কেন না কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি, মন যে মানা মানে না, বলে তিনি মানুষ হয়েও অনেক সময়েই অপ্রেমিক চালে চলেন—না চান ভক্তকে আমল দিতে না তার ভক্তিকে।"

গুরুদেব উত্তরে লিখলেন (২ ১০. ৪৪): "মূঢ়তা মানুষের একটি চিরন্তন অনুষঙ্গী। তোমার অনুযোগ তত অবোধ নয় যত অযৌক্তিক—বিষম অযৌক্তিক। কৃষ্ণ যদি হ'তেন স্বভাবে অপ্রেমিক ও ভক্তবিমুখ (হা হতোহস্মি! কৃষ্ণ অপ্রেমিক—ভক্তবিমুখ!) তাহ'লে আমাদের ভক্তি ও অভীপ্সা তাঁর নাগাল পেত কি ?···তাহ'লে তিনি শিবের মতই কৈলাসে সুখাসীন থাকতেন তুষারপীঠে একলাটি।"

তারপরে হ'ল কি, এক বুদ্ধিমান দার্শনিক বন্ধু আমাকে লিখলেন সাবধান করতে চেয়ে—to sound a warning-note—যে আমি মূঢ়ের মতন চলেছি ভুল পথে—শ্রীঅরবিন্দকে ছেড়ে কৃষ্ণকে বরণ করার বিড়ম্বনা কেন—"কৃষ্ণের শরণ নিলে তোমার মিলতে পারে বড় জোর ওভারমাইণ্ড, তার বেশি নয়, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের শরণ নিলে পৌছবে সরাসর সুপ্রামেণ্টালে।" তাঁর চিঠির প্রাজ্ঞ ভাষা উদ্ধৃত ক'রে গুরুদেবকে পাঠালাম: "If you stick to Krishna, the supermind would not be included in your realisation whereas if you turn to Sri Aurobindo, Krishna would be included in your realisation because he only had truck with the overmind not the supermind of Sri Aurobindo's."

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ধমকে লিখলেন (১০. ১২. ৪৪):

"আমি অথৈ জলে পড়েছি কৃষ্ণ বনাম সুপারমাইণ্ড সমস্যা নিয়ে। ক খ গ ঘ··· বম্বে নাগপুর দিল্লি···থেকে সুরু ক'রে ট ঠ ড ঢ · পেরিয়ে য র ল ব হ · কলকাতা পণ্ডিচেরি সর্বত্রই প্রাজ্ঞেরা সুপারমাইণ্ডের ল্যাজ ধ'রে টেনে এনে তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, কেবল বেচারী কৃষ্ণ পারবে না—সে শুধু বড়জোর ওভার-মাইণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে, তার বেশি নয়? ভগবান্ বাসুদেবের কী দুরদৃষ্ট—হায় হায়! আমি যা বলেছি তা এই যে, কৃষ্ণ অবতার হ'য়ে এসেছিলেন ওভারমাইণ্ডকে মর্ত্য বোধির মধ্যে আবাহন করতে, কারণ তাই ছিল সে-যুগে তাঁর কৃত্য—সে-সময়ে এর বেশি করার তাগিদ আসে নি। তিনি সুপারমাইণ্ডকে আবাহন

করেন নি কারণ মর্ত্যচেতনার বিকাশের সে-স্তরে তা সম্ভব ছিল না। আমি একথা বলতে চাই নি যে, যদি সে-সময়ে এ-অবতরণ ভগবৎ-আদিষ্ট হ'ত তাহ'লে কৃষ্ণ পারতেন না এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে। প ফ ম যেই এসে তোমাকে কিছু বলুক তুমি মনে করো বেদবাক্য—যার ফলে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। আমার মনে হয় কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে গায়েব হবেন না—আমাদের সহকারীই থাকবেন—যখন সুপারমাইণ্ড অবতীর্ণ হবে।"*

আমি কৃষ্ণপ্রেমকে এসব চিঠি পাঠাবার পরে সে লিখল :

"আমি তোমাকে এর আগেও লিখেছি, তবু ফের বলি—তোমার গুরু যখন তোমার কৃষ্ণভক্তিকে মঞ্জুর করেছেন তখন তুমি এর ওর তার মতামত নিয়ে মাথা বকাচ্ছ কেন? ওদের এসব উপদেশ পাগলামি যে, তুমি এ ও তা পাবে না যদি অমুক তমুক পথে চলো। সাধনায় এমন কোনো প্রাপ্তিই নেই যা কৃষ্ণের কৃপায় মিলতে পারে না। যদি তোমার গুরু তোমার কৃষ্ণবরণকে সমর্থন না করতেন তাহ'লে হয়ত আমি ইতস্ততঃ করতাম একথা জোর ক'রে বলতে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে দেখাই যাচ্ছে যে সে-প্রশ্ন আদৌ ওঠে না, কেন না তিনি তোমার সাধনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে তুমি বিপথে পা দাও নি।"†

আর একটি পত্রে কৃষ্ণপ্রেম আমাকে লিখেছিল কৃষ্ণমন্ত্র জপ সম্বন্ধে : "আমার মনে হয় তুমি কৃষ্ণের শরণ চাইবে না বা তাঁর নাম জপ করবে না এ হ'তেই পারে না। তাই আমি খুশী হয়েছি শ্রীঅরবিন্দ তোমাকে এ-বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন ব'লে। অতীতের মহাযশা মহাজনদের নাম ও কীর্তিকলাপ প্রত্যেকটিই গবাক্ষের মত, যার মধ্যে দিয়ে চিরন্তন সত্যের আলো সহজে ফুটে ওঠে উত্তরোত্তর।"

[To my thinking, it is quite out of the question for you to "give up wanting Krishna and using His Name." There can be no question of disloyalty to the Guru in so doing and I am glad that Sri Aurobindo has set your mind at rest on that point. The traditional names and acts of these great figures of the past are, every one of them, windows through which the Real is easily evolved.‡]

---

*পরিশিষ্টে এ-পাঁচটি চিঠি মূল ইংরাজীতে দ্রষ্টব্য। তথা আমার YOGI SRI KRISHNAPREM এ আছে।

† এ-চিঠিটি ও কৃষ্ণসম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেমের অন্য সব চিঠিই আমার "যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে—দ্রষ্টব্য।

‡ Extract from a letter in my YOGI SRI KRISHNAPREM.

কৃষ্ণপ্রেমের কথা আরো অনেক বলতে পারি ও বলতে ইচ্ছাও হয়, কিন্তু ভেবে-চিন্তে না-লেখাই স্থির করেছি কারণ তার সম্বন্ধে আলাদা একটি গোটা বই লিখেছি তার পুণ্য স্মৃতির তর্পণে—তাকে "মহাযোগী" উপাধি দিয়ে। তাই শুধু বলি এ-উপাধি তাকে সাজে। নানা দিক দিয়েই সে ছিল অনন্য। বুদ্ধিতে, পবিত্রতায়, মনীষায়, প্রকাশপ্রতিভায়, ব্যক্তিরূপে, সাধনায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, গুরুভক্তিতে—কিসে নয়? বহু সাধককেই সে আলোর পাথেয় দিয়েছে তাদের জীবন সংগ্রামে, সাধন সমস্যায়। তার চিঠি ছিল লিপিকা মাত্র নয় তার আশ্চর্য তপস্যার দেশনা (guidance)। আমি কত যে আনন্দ আলো ভরসা পেয়েছি তার নানা প্রোজ্জ্বল চিন্তার ভাষ্যে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "পশ্যন্তী বুদ্ধি"-র অবদানে। ১৯৩২ সালে আমি গুরুদেবকে পাঠিয়েছিলাম তার কয়েকটি চিঠি। প'ড়ে তিনি আমাকে লিখেছিলেন এক সুদীর্ঘ পত্র যেটি আমার AMONG THE GREAT-এ উদ্ধৃত করেছি কৃষ্ণপ্রেম পত্রগুচ্ছের সঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে লিখেছিলেন (আমি শুধু প্রথম অনুচ্ছেদটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি):*

"Dilip

It was a great refreshment to read the letters of Krishnaprem ; one feels here a stream from the direct sources of Truth that one does not meet so often as one could desire. Here is a mind that can not only think but see—and not merely see the surfaces of things with which most intellectual thought goes on wrestling without end or definite issue and as if there were nothing else—but look into the core. The Tantriks have a phrase *Pashyanti vak*, the seeing word. Krishnaprem has, it seems to me, much of the *Pashyanti Buddhi*, the seeing Intelligence···There must have been the gift of right vision lying ready in his nature."

(ভাবার্থ: কৃষ্ণপ্রেমের পত্রগুচ্ছ প'ড়ে গভীর তৃপ্তি পেয়েছি। এসব চিঠি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এদের ভাবধারা নিঃসৃত হয়েছে সত্যের গোমুখী থেকে। এরকম চিঠির বেশি দেখা পাই না—এই যা দুঃখ। কৃষ্ণপ্রেমের মন শুধু যে ভাবতে পারে

* এ-চিঠিটি আমার YOGI SRI KRISHNAPREM-এও ছাপা হয়েছে তৃতীয় বল্লীতে ১২৭ পৃঃ—পরিশিষ্টেও দিয়েছি।

তাই নয়—দেখতেও শিখেছে, আর সে-দেখা উপরভাসা নয় যেমন প্রায়ই হয় মগজী চিন্তার ক্ষেত্রে—অন্যভাষায়, চিন্তার কসরৎ মাত্র। তান্ত্রিকেরা 'পশ্যন্তী বাক্'-এর কথা বলে। মনে হয়, কৃষ্ণপ্রেমের আছে সহজাত 'পশ্যন্তী বুদ্ধি'—যথার্থ দৃষ্টির সহজ প্রতিভা।"

আমি প্রায়ই কৃষ্ণপ্রেমের কাছে শ্রীঅরবিন্দের নানা চিঠি ও কবিতা পাঠাতাম শুধু পাঠাতে ভালো লাগত ব'লেই নয়, তার কাছে সমর্থন পেলে (বিশেষ ক'রে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে) আমি ভরসা পেতাম ব'লেও বটে। কিন্তু এর ফলে সংকল্পে জোর পেলেও সময়ে সময়ে মনে প্রশ্ন উঠত—গুরুর সমর্থন পাওয়ার পরেও আর কারুর সমর্থন চাওয়াটা কি ভালো? এ-দুর্ভাবনা হ'ত আরো এইজন্যে যে, আশ্রমে কেউ কেউ আমাকে "গুরুদাস" নাম দিতে চাইতেন না। তাঁদের এজন্যে খুব দোষ দিতেও পারি না, যেহেতু আমারও মনে হ'ত যে আশ্রমে গুরুর কাছে এত অজস্র স্নেহ পাওয়া সত্বেও গুরু ছাড়া আর কারুর সমর্থন চাওয়ার মধ্যে অনৈশ্চিত্যের ভাব আছে—যার বিলিতি নাম 'ভ্যাসিলেশন'। তবে আমার সাফাই এই যে, আমি আবাল্য স্বভাবে দোমনা—তাই নানা আদর্শসঙ্কটে প'ড়ে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতাম। ব্যাসদেব বলেছেনঃ "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ"—স্বভাবকে ডিঙিয়ে যাওয়া সুকঠিন। বটে, কিন্তু গুরুবাদী হ'য়েও এরকম অব্যবস্থিত চিত্ত হ'লে যে শুধু ভুগতে হয় তাই নয়, নানা ক্রিটিকের তির্যক কটাক্ষকেও সইতে হয়—অর্থাৎ বলা চলে না যে, তাঁদের বক্রকটাক্ষ অন্যায়। কিন্তু মানুষ পারৎপক্ষে 'গিল্‌টি প্লীড' করে না, নানা সুযুক্তি কুযুক্তিকে তলব ক'রে থাকে নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করতে। তবে কৃষ্ণপ্রেমের ক্ষেত্রে আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল এই যে, গুরুদেব নিজে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বকে শুধু যে বারবারই আশীর্বাদ করতেন তাই নয়, তার বেশির ভাগ রায়ের সঙ্গেই সায় দিতেন সস্নেহে—তাঁর নানা চিঠির নানা মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে পড়লে পাঠকেরাও একথা মানবেন।

কিন্তু "এহো বাহ্য"। আসলে কৃষ্ণপ্রেমের স্নেহের ও যুক্তির সমর্থন আমি চাইতাম কারণ তাকে সত্যিই আমি মহাযোগী ব'লে চিনতে পেরেছিলাম। তাই তার সব চিঠিই আমি সাদরে টাইপ করিয়ে আমার দপ্তরে রেখেছিলাম যেগুলি আমার কৃষ্ণপ্রেমতর্পণে পরে ছাপিয়ে সারা জগতের পাঠক পাঠিকার কৃতজ্ঞ অভিনন্দন পেয়েছি। শ্রীঅরবিন্দও বলতেন যে কৃষ্ণপ্রেমের চিঠির মধ্যে যুগপৎ আত্মিক শক্তির ও পশ্যন্তী দৃষ্টির আলো মেলে। স্বাধীন চিন্তা, বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও সাধনলব্ধ জ্ঞানের এমন সমন্বয় সব দেশেই বিরল। তাই আজ মনে হয়—কৃষ্ণপ্রেমকে অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছিলাম আমি বিধাতারই বিধানে।

কিন্তু আর নয় এখানে কৃষ্ণপ্রেমের চিঠি থেকে আরো কিছু পরিবেষণ ক'রে ইতি করা যাক কি রকম চমৎকার চিঠি সে লিখত তার কিছুটা পরিচয় দিতে :

You say you find it hard to go on. That is a good sign. This path is the hardest path in the world and as long as we find it easy we may be sure we are not getting very far but just free-wheeling easily along a level road. Oh yes, we may be happy and peaceful for a time but that happiness or peace is illusory : anything can disturb it and we achieve nothing. *His* peace is something quite different, something that has its being in the very heart of tremendous winds, winds which would shatter us to atoms, It is only when the strain begins to tell on us, when the breath comes short, that we can know that we are really climbing. Till then all that we have done at most is to go over rapidly the ground we covered in a previous life. This life begins when the strain comes on—scarcely before. There is no attainment of Him, until the egg-shell of self is broken. Why then should we complain when the breaking-strain begins to come on ? With pain we are born both physically and spiritually, but it is the inner life that we seek and not the self-enwrapped bliss of uterine existence.

Fill yourself with Krishna, occupy your thoughts with Him and let all your actions be for Him. Surely you will find Him. Do not think that this will be disloyal to anyone, for this is the "surrender" of which you write and he who teaches you will teach you this.

Why worry over what your fellows around you say or do ? Each of us has to have his own egg-shell cracked. Some are cracked one way, some another, but all are broken in the end. As for the "personal independence" of which you write that is a dream. You can never have it and even if you did, it would be hell, for it means separateness.

As for those who say that seeking Krishna has no part in their *Yoga*—that is the ignorant talk of those who do not know who Krishna is and vainly plume themselves on their own vain ignorance of "all that old stuff." Paris fashions in *Yoga*.

[ভাবার্থ: তুমি লিখেছ যে, যোগের পথ তোমার কাছে ক্রমশই দুরারোহ মনে হচ্ছে। খুব ভালো কথা। এ-পথ হ'ল জগতের সবচেয়ে দুর্গম পথ, তাই যারা যোগপন্থী হ'য়ে ভাবে সরাসর খাসা চলেছে তাদের অবস্থা কতকটা সাইক্লিস্টদের সমতল পথে হু হু ক'রে চলার ম'ত। তারা ভাবে—কী চমৎকার প্রগতি হচ্ছে—স্রেফ ভুলে গিয়ে যে তারা একটুও উঠছে না, আর লক্ষ্য তাদের ভাগবত শিখর। যখন হাঁপ লাগে তখনই কেবল আমরা বলতে পারি যে, উঠছি উপর দিকে। কী? তারা বেশ নিটোল শান্তিতে আছে? হায় হায়, এ-শান্তি কি সেই সত্যিকার শান্তি যে ঘোর বাত্যার মধ্যেও অচল অটল থাকতে পারে। এ-চল্‌তি শান্তি একটুকরো ঝাপটায়ই টলমল ক'রে ওঠে।

কৃষ্ণৈকান্ত হও ভাই। ভাবো কেবল তাঁর কথা। সব কর্ম করো কেবল তাঁর জন্যে। নৈলে অহন্তার গুটি ভাঙবে কেমন ক'রে—আর গুটি না ভাঙলে উড়বে কেমন ক'রে? আর এ-গুটি ভাঙলে তুমি তাঁকে পাবেই পাবে। এতে তোমার গুরুনিষ্ঠা টলতেই পারে না। আর যারা বলে কৃষ্ণ তাদের যোগে অবান্তর—তাদের কথা ধোরো না, তারা অজ্ঞান ব'লেই জানে না কৃষ্ণ কী বস্তু, তাই বড়াই করে নিজেদের অহংকারের, বলে: কৃষ্ণ সেকেলে, বাজে।)

এ-চিঠিটি সে লিখেছিল আলমোরা থেকে ১৭. ১. ৪২ তারিখে—যখন আমার স্পর্শকাতর মন আশ্রমে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা তর্কাতর্কির তাপে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। তাই আমি তার পূর্ণ কৃষ্ণৈকান্ত সমর্থনে তার প্রতি এত কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও আমার মনে ক্রমশ অস্বস্তি জ'মে উঠেছিল এই ভেবে যে, গুরুবরণ করার পরেও গুরু ছাড়া আর কারুর কাছে উপদেশ বা সমর্থন চাওয়া হয়ত অনুচিত। এ-দ্বিধাভাব আসত আরো এই জন্যে যে, কৃষ্ণপ্রেম বারবারই আমাকে বলত—গুরুর কথা শুনে না চললে গুরুবাদীর পথের পাথেয় জুটতেই পারে না। তবে আমার সাফাই এই যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা পত্রেই যেভাবে কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করতেন তাতে আমি একরকম ধ'রেই নিয়েছিলাম যে আমাকে যে কৃষ্ণপ্রেম বিপথে টেনে আনবে না এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কারণ তিনিও বলতেন যে, গুরুবাদীর সাধনায় গুরুর আনুগত্য অনুকূল, আর গুরুনিষেধ-উপেক্ষা করা অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু তবু তিনি আমাকে একটিবারও বারণ করেন নি কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দরবার ক'রে

নিঃসংশয় হ'তে। আশ্রমে অনেকে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি প্রীতিকে ঠিক বুঝতে পারত না ব'লেই আমার মনে হ'ত। তাই আমি আরো রুখে উঠে বারবারই কৃষ্ণপ্রেমের কাছেই যাচাই করতে চাইতাম আমার নানা মনগড়া ধারণা সত্য না অসত্য। শেষে তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে লিখলাম যে, আমি বড় ধাঁধায় পড়েছি আমার স্বধর্ম ঠিক কী ঝাপসা ঠেকছে ব'লে। উত্তরে তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যার নিটোল স্নেহের কথা ভেবে আমি চোখের জল রাখতে পারি নি—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে আমার মনে হয়েছিল—আমি শুধু সংশয়ী নই, ঘোর অকৃতজ্ঞ। কেন এমন কথা মনে হয়েছিল তাঁর বক্ষ্যমান পত্রটির অপার ঔদার্য ও তিতিক্ষা থেকে প্রাঞ্জল হবে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"I have not the slightest idea of disowning you or asking you to go elsewhere or giving you up or asking you to abandon the Yoga or this Yoga. It is not that I insist on your finding the Divine through me and no one else or by this way and no other. I want you to arrive and would be glad to see you do it by whatever way or with whatever help. But even if you followed another way, your place with me would remain, inwardly, physically and in every way. Even if you walked off to the Himalayas to sit in seclusion till you got something, as I think you sometimes wanted to do, your place would remain waiting for you here. I want you to understand that clearly, and not imagine all sorts of things about our cutting off or displeasure or abandonment and the rest of it. Nothing could be further from our minds or from our feeling for you."

[ভাবার্থ ঃ আমি মোটেই চাই না তোমাকে বরখাস্ত করতে, বা বলতে—তুমি যোগব্রত ছেড়ে দাও বা আমার যোগ ছেড়ে দাও। আমার এমন রোখ নেই বলবার যে, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ধ'রে এ-পথে চলতে যেও না। আমি শুধু চাই তুমি সফলসাধন হও—যে পথেই হও না কেন, বা যার সাহায্যেই তোমার লক্ষ্যে পৌছতে পারো না কেন, আমি খুশী হব জেনো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু বলতে চাই যে, তুমি যদি আর কোনো পথে চ'লে যাও তাহ'লেও আমার কাছে তুমি তেমনিই স্বাগত থাকবে।]

বলেছি, মনীষা প্রতিভা প্রমুখ মনোবৃত্তি মানুষকে চমকে দেয়, উদ্দীপ্ত করে,

মহত্ত্ব ঔদার্য স্নেহ প্রমুখ হৃদয়বৃত্তিই আমাদের কাছে টানে, মুগ্ধ করে, আপন ক'রে নেয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে জ্ঞানের মণি অজস্র পেয়েছি—তাঁর ধ্যানলব্ধ অবদান প্রতিভা-সম্ভূত সম্পদ। সে-সব আমার মনের মন্দিরে চিরদিনই থাকবে আলো ক'রে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁকে ভালোবেসেছি তাঁর অহৈতুকী স্নেহপ্রীতির জন্যেই, তাঁর লোকোত্তর জ্ঞানগৌরব বা সুপ্রামেণ্টাল আবাহনের জন্যে নয়। বলতে কি সুপ্রামেণ্টাল আবাহন বলতে ঠিক কী বোঝায় শুধু যে আমার কাছেই অজ্ঞাত তা নয়, আর কারুর কাছেও সুবিদিত নয়—একথা তাঁর মুখেই শুনেছি। আমার AMONG THE GREAT-এ তিনি বলেছিলেন আমাকে খোলাখুলিই (৩৫৮-৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য *) যে সুপ্রামেণ্টালকে নিয়ে আর কারুর মাথা না বকানোই ভালো। বলে ঈষৎ ব্যঙ্গই করেছিলেন তাদের হাঁকডাক নিয়ে যারা সুপ্রামেণ্টালকে টেনে নামাতে চেয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিল।...শেষে হেসে জুড়ে দিয়েছিলেনঃ "সুপ্রামেণ্টালকে নিয়ে অনধিকারচর্চা না ক'রে যে সাধনার যে-স্তরে আছে সে-স্তরে থেকে যা করবার করাই ভালো—সুপ্রামেণ্টালকে নিয়ে যা করবার আমিই করব যথাকালে এই বিশ্বাসে ভর ক'রে।"†

আমি একথাগুলি বলছি কারণ অনেকে ভুল বুঝে ধ'রে নিয়েছিলেন—আমি সুপ্রামেণ্টালের প্রতি বিমুখ যেহেতু আমি কৃষ্ণকে পেলেই তুষ্ট। এঁদের মধ্যে কয়েকটি শ্রদ্ধেয় মনীষীও ছিলেন তাঁদের তাই করজোড়ে নিবেদন করতে চাই যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের এ-ধরণের নানা মন্তব্য থেকেই ধ'রে নিয়েছিলাম যে, সুপ্রামেণ্টাল উপস্থিত কেবলমাত্র শ্রীঅরবিন্দের মতন ঈশ্বরকোটির কাছেই সত্য, আমাদের মতন মানসজগতের বাসিন্দাদের কাছে নয়। আমার মনে হয় না যে, এ-সিদ্ধান্তকে বলা চলে সুপ্রামেণ্টালের প্রতি বিমুখতা। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি সীমিত, অহন্তা ম'রেও মরতে চায় না—যার জন্যে বহু মনঃকষ্টের মধ্যে দিয়েই আমাকে যেতে হয়েছে —যার খবর কেবল শ্রীঅরবিন্দ রাখতেন আর কেউ নয়, কেন না আমি চিরদিন চলতে চেষ্টা করেছি এই সূত্র মেনেঃ

---

* আমার এ-রিপোর্টটি তিনি নিজে দেখে দিয়েছিলেন ও কোথাও কোথাও কিছু শোধন ক'রে ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলেন—ছাপাও হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায়।

† He smiled: "Haven't you yourself met some who tried to pull it down themselves and be the first Supramental beings with disastrous results?" He laughed again and added: "*People ought not to meddle with the Supramental at all in their present stage, but do what has to be done in the place where they are and leave the Supramental to me as my business*". (এই গোটা ছত্রটি তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন আমার অনুলিপি শোধন করবার সময়)

যত পারো রেখো বেদনা অশ্রু লুকায়ে মনের তলে,
অপরকে শুধু বিলায়ে হরষ আলো হাসি প্রতি পলে।
যত পারো দাও সুখ সকলকে, দুঃখকে চাও যদি
জানায়ো কেবল গুরুকে—কে আছে এমন ব্যথার ব্যথী?
যা কিছু সঁপিবে তাঁর শ্রীচরণে সরল গভীর প্রেমে,
প্রেমল শ্যামল বরিবেন স্নেহে গুরুবুকে এসে নেমে।

এ আমার মুখের কথা নয়। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত বেদনা বা বিষাদের বিবৃতি আমার নানা গল্পে বা কবিতায় লিখেছি। কিন্তু সখা সখীদের কাছে সাধ্যমত গোপন রেখেছি আমার দুঃখব্যথার কথা—এমনও হয়েছে একাধিকবার যখন আমি পণ নিয়েছি—আজ প্রস্থান করবই করব—(কেন মিথ্যে গুরুদেবকে ভোগানো যখন আমি স্বভাবে কবি শিল্পী সুরকারই বটে— যোগী মুনি যতি নই?)—কিন্তু আশ্রমে কাউকেই বলি নি—কেউ এলে হাসি মুখেই কথা কয়েছি—এমন কি গান গাইতেও বাধে নি। কাঁদুনি গাইতাম এর ওর তার কাছে নয়—কেবল গুরুর কাছেই। তাই তো আরো ব্যথা বাজত বার বার যে, গভীর নিরাশার দুর্লগ্নেও তাঁর পূর্ণিমাপ্রশান্তির কাছে গিয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে হাত পেতে বলবার সুযোগ পেতাম না: "গুরু, ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝে দূর করো আমার অশ্রু আঁধার তোমার হাসির জ্যোৎস্নায়।" অবশ্য এজন্যে তাঁকে দোষ দিই নি,—দেব কেমন করে?—তিনি তো প্রথমেই বলেছিলেন যে, তিনি কারুর সঙ্গেই কদাচ কথালাপ করবেন না। এই শর্ত মেনেই যখন তাঁর শিষ্য হয়েছিলাম তখন কোন্ মুখে বলি তাঁকে "নিষ্ঠুর"? তাছাড়া নিষ্ঠুর তো তিনি নন স্বভাবে। তাঁর কাছে চিরদিনই পেয়ে এসেছি অজস্র স্নেহ দরদ অনুকম্পা—এমন প্রেম যার জুড়ি মেলে নি আর কোথাও। কিন্তু হ'লে হবে কি, এম্‌নি আমাদের মন যে সে "যত চায় ততই নালায়"—তাই আমি সব বুঝেও অভিমান করতাম এই ভেবে যে, আমি চ'লে গেলেও তাঁর আরাধ্য সুপ্রামেণ্টালের অবতরণে একটুও দেরি হবে না—তিনি চলবেন সমানে অটল পদক্ষেপে, মহামুনি মহাজ্ঞানী ভগীরথের মতনই টেনে নামাবেন আকাশগঙ্গাকে কেবল আমিই অমৃতভাণ্ডারীর কাছে এসেও সুধার প্রসাদে বঞ্চিত হ'য়ে ফিরে যাব—আর কোথায়?—ধনমানকলগানের মায়ার খেলায়—যেখানে মেলে নি সেই পরম প্রাপ্তি—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ":—

কাম্য শুধু সেই পরম প্রাপ্তি—পরে যার
কোনো কিছুই মহত্তর গণে না মন আর।

কিন্তু এ-ও একদিক দিয়ে যাকে বলে দুষ্টু শিশুর আদর কাড়তে চাওয়া। তাই

আমি শান্ত হ'তাম যেই পেতাম তাঁর চিঠির আদর—যার ছত্রে ছত্রে ঝরত তাঁর অপার স্নেহ ঝর্ণার ঝঙ্কারে।

এ-ঝঙ্কার সব চেয়ে গভীর হ'য়ে বেজেছিল কোনো এক অবিস্মরণীয় দুর্লগ্নে। কলকাতা থেকে বার বার ডাক আসছে, অথচ যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। কেমন ক'রে গুরুকে ছেড়ে যাব তাঁর প্রসন্ন অনুমতির প্রসাদ না নিয়ে? কিন্তু তবু এমনি আমাদের মন সে ততই টলমল করে যত সে চায় অটল হ'তে। মনে হ'ল ফের—চাই তাঁর দর্শন। কিন্তু যদি বলেন "না"? অদর্শনও সয়—কিন্তু প্রত্যাখ্যান? না না না। শেষে চোখের জলে তাঁকে লিখলাম যে আমি জানি—তাঁর সুপ্রামেণ্টাল সাধনায় আমার মন সাড়া দিতে পারে না ব'লেই আমি তাঁর তপোবনে বার বার তাঁর স্নেহের অজস্র প্রসাদ পেয়েও এমন অশান্ত হ'য়ে উঠি—ইংরাজীতে বলে না—round peg in a square hole? উত্তরে তিনি লিখলেন কী মধুর—না, সান্ত্বনা নয়, অন্তরের অঙ্গীকার:

"তোমার সঙ্গে আমার নিবিড় ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উদ্ভব হয়েছিল—যেদিন তোমাকে আমি প্রথম দেখি সেদিন নয়—তারো আগে। আর শুধু সেই জন্যেই আমি চেয়ে এসেছি আমার সমগ্র আন্তর সমর্থন দিয়ে নিরন্তর তোমার সাধনার সহায় হ'তে। আমার এ-অনুভবের ভিত্তি কোনো কবোষ্ণ নৈর্ব্যক্তিক স্নেহ নয়। আমার দিক থেকে সে-স্নেহ কোনোদিনই শিথিল হবে না জেনো।"

এ-চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন ২৬.২.৩৫ তারিখে। আমি তাঁর "অনেক আগে-"র (even before-এর) ভাষ্য চাইতে তিনি লিখেছিলেন, ২৮.২.৩৫ তারিখে:

"আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি তার আগেও তোমার কথা আমার অগোচর ছিল না, আর তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-এর দিনেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তোমার আমার সম্বন্ধ এক জন্মের নয়—বহুজন্মের। তাই আমি বরাবর সাদরেই তোমার গতিবিধির খবর রেখে এসেছি। এ-হেন অন্তরঙ্গতার অনুভূতি কখনো ভুল হয় না—সে যে আমার জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ, ভুল হবে কেমন ক'রে? এ সম্বন্ধের মূল হ'ল এই যে, অতীতে তুমি ছিলে আমার সাধনসঙ্গী—তাই এ-যুগেও তুমি ফিরে এসেছ আমার কাছে—এ তোমার ভবিতব্য ব'লে। অপিচ, এই আন্তর পরিচিতিই তোমাকে টেনে এনেছে এখানে। তোমার বাহ্য চেতনা এখনো এ-সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয় নি কেননা যখনই কোনো নবজন্ম হয় একটা আড়াল ঢেকে রাখতে চায় সে-চেতনাকে। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা সর্বদাই জানে এ-অন্তর্লীন সত্যকে।"

[কেন আমি পূর্ণ সচেতন হ'তে পারি নি তার কোনো সুবোধ্য কারণ আমি

আজো খুঁজে পাই নি—তাই আমার অজ্ঞানকে এজন্যে দায়িক ক'রে শ্রীঅরবিন্দের এ-প্রাণস্পর্শী পত্রটি উদ্ধৃত করি মূল ইংরাজীতে, করার প্রয়োজন আছে—কী প্রয়োজন বলেছি ইতিপূর্বে।]

Dilip,

It is a strong and lasting personal relation that I have felt with you ever since we met and *even before* and it is only that has been the base of all the outward support, consideration, care and constant helping endeavour which I have always extended towards you and which could not have arisen from any tepid impersonal feeling. On my side that relation is not likely to change ever. (26.2.35)

I meant that even before I met you for the first time, I knew of you and felt at once the contact of one with whom I had that relation which declares itself constantly through many lives and followed your career (all that I could hear about it) with a close sympathy and interest. It is a feeling which is never mistaken and gives the impression of one not only close to one but part of one's existence. The relation that is so indicated always turns out to be that of those who have been together in the past and were predestined to join again (though the past circumstances may not be known) drawn together by old ties. It was the same inward recognition (apart even from the deepest spiritual connection) that brought you here. If the outer consciousness does not yet fully realise, it is because of the crust always created by a new physical birth that prevents it. But the soul knows all the while. (28.2.35.)

এ-চিঠিটি পেয়ে আমি প্রথম দিকে সত্যি বিশ্বাস করতে পারি নি। কারণ আমার মধ্যে যত অহঙ্কারই গাঢাকা হ'য়ে থাকুক না কেন, গুরুদেব যে আমাকে তাঁর জীবনের "অচ্ছেদ্য অংশ" ব'লে মনে করতে পারেন এমন কথা আমি স্বপ্নে শুনলেও কাউকে বলতে পারতাম না যে, আমি "শুনেছি তাঁর পরম বাণী, তাই আমি আজ জানি জানি —নিলেন তিনি কোলে টানি।"

তবু গুরুদেব দেহরক্ষা করার পরে আমি শ্রীমাকে বিষণ্ণ মনে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে তিনিও এ-অঙ্গীকার সত্যি শুনেছিলেন কি না। উত্তরে শ্রীমা সায় দিয়ে-আমাকে লিখেছিলেন ২৮.৪.৫১ তারিখে: "He considered you as part of the realisation; so there is no ground for depression."*

তাই লিখেছিলাম গুরুদেবের তর্পণে:

কত কতবার নিরাশা বিষাদ জানি
গেছে কেটে স্মরি' তোমার অমৃতবাণী:
"এসেছ যে হ'য়ে বন্ধু সাথী দিশারী
জনমে জনমে করিতে পার, হে পারী!"

কিন্তু ফিরে আসি হারানো খেই ধরতে—সুপ্রামেণ্টালের, যদিও জানি যা বলতে চাই অনেকেই ভুল বুঝতে পারেন। তবু বলতে চাই বিশেষ ক'রে তাঁদের জন্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আমি স্বভাবে কৃতজ্ঞ, সত্যাশ্রয়ী তথা নির্বিবাদী।

॥ উনিশ ॥

আশ্রমে আসবার আগে আমি শ্রীঅরবিন্দের সুপ্রামেণ্টাল যোগ সম্বন্ধে সমাচার প্রথম শুনি ১৯২৭ সালে, নীসে। প্রবক্তা ছিলেন পল রিশার—যাঁর সঙ্গে আমার কথালাপ আমি প্রকাশ করি প্রথমে আমার "এদেশে-ওদেশে"-তে, তার পরে "স্মৃতির শেষ পাতায়"। পল রিশার আমাকে প্রথম বলেন যে মানুষের চেতনা পশুর চেতনা থেকে যত ঊর্ধ্বে সুপ্রামেণ্টাল চেতনা মানস চেতনা থেকে তার চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। এ-তুঙ্গ চেতনার আবাহন করছেন শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে—বলেছিলেন পল রিশার জোরালো স্বরেই। শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন: "কিন্তু এ-চেতনা প্রথমে মাত্র দুচারজনের মধ্যেই জাগবে—পরে কালাতিপাতে ক্রমশ ব্যাপ্ত হবে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির বৃন্তে—এক থেকে বহুর মধ্যে।"

শুনে কিছুটা ভরসা পেয়েছিলাম বৈ কি—কিন্তু আমার স্বভাব সংশয়ী মন টুকেছিল: "দেখা যাক আগে কার মধ্যে জাগে, আর কী ভাবে সে-জাগৃতি পার্থিব চেতনার ভূমিকায় ফলপ্রসূ হয়।" তবে এ ছিল আমার অজ্ঞান মনের স্বগতোক্তি, কারুর

* শ্রীমার স্বহস্তে লেখা এ-চিঠিটি আমি সযত্নেই রক্ষা করেছি ও সম্প্রতি পণ্ডিচেরিতেও রক্ষিত হয়েছে এর মাইক্রোফিল্ম্। আমার কাছেও আছে।

কাছে প্রকাশ করি নি করার দরকার হয় নি ব'লেও বটে। আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমাকে নানা পাকে পড়তে হয়েছিল ব'লেও বটে। স্যামুয়েল জনসনের একটি প্রায়োক্তির প্রায়ই আমি প্রতিধ্বনি করতাম, বলেছিলেন তিনি বসওয়েলকে: "There is no such thing as public worry Sir, there is only private worry." একথা মহামানবদের সম্বন্ধে হয়ত পুরোপুরি প্রযোজ্য না হ'তে পারে, কিন্তু মাদৃশ উদ্বিগ্ন কৃষ্ণসন্ধানীর কাছে সেরা প্রাইভেট দুর্ভাবনা হ'ল—কী ক'রে তাঁর প্রসাদ মেলে—একলা ডাকাডাকি ক'রে যদি না মেলে তবে অগত্যা গুরু করণ ক'রে দেখতে হবে কি? আর গুরু পাবই বা কোথায়?… ইত্যাদি।

ইতিপূবে বলেছি একাধিকবার যে, আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হ'লেও তাঁকে গুরু ব'লেই বরণ করেছিলাম—ইষ্ট ওরফে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব'লে নয়। আশ্রমে পৌঁছে দেখলাম শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যেরা তাঁকে যুগপৎ দুটি পদবী দিয়েই বরণ করতেন—অর্থাৎ তিনি গুরুরূপে ইষ্টের প্রতিনিধি হ'লেও পূর্ণ স্বরূপে স্বয়ং ভগবান কি না, ইষ্টও বটে।

এইখানেই আমার কৃষ্ণমুখী মন প্রথম ঘা খেল, কেন না আমি তাঁকে স্বয়ং ভগবান্ (ultimate Divine) ব'লে বরণ করি নি—মহাকবি, মহামুনি, মহাযোগী, মহামনীষী সর্বোপরি যুগর্ষি ব'লেই সনাক্ত করেছিলাম যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, ধ্যানসিদ্ধ, ঈশ্বর কোটিদের মুকুটমণি। এ-অঙ্গীকার অবিমিশ্র গুরু ভক্তিরই স্বাক্ষর। তাই আমার মনে কোনো গ্লানিই আসে নি যে, এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার গুরুভাইদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই।

মুস্কিলের প্রথম অভ্যুদয় হ'ল যখন শুনলাম—সদ্গুরু বা যুগর্ষি ব'লে মানলেও শ্রীঅরবিন্দকে পূর্ণ মানদান করা হয় না—মানা চাই তাঁকে একমাত্র আরাধ্য ব'লে ইষ্টের বেদীতে বসিয়ে, নৈলে তাঁব সুপ্রামেণ্টাল যোগের অধিকারী হওয়া যাবে না—যেহেতু সুপ্রামেণ্টালকে এমন কি কৃষ্ণ-যে-কৃষ্ণ তিনিও আবাহন কবতে পারেন নি পার্থিব চেতনার স্তরে। এ-বিষয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পাঁচ ছয়টি পত্র আগেই উদ্ধৃত করেছি—যে পত্রগুলি আমাকে গভীর দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন ব'লে যে আমার কৃষ্ণাকুলতা আমার সাধনার অন্তরায় হ'তে পারে না—তিনিও চান আমাকে কৃষ্ণের চরণে পৌঁছে দিতে—বা যেভাবে আমি ভাগবত মিলন চাই সেই ভাবেই।*

---

* তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রায় দুবৎসর আগে (২৭.৪.৪৯) গুরুদেব আমাকে লিখেছিলেন: "As for me, the will to help you towards divine realisation is one of the things that has been constantly nearest to my heart and will be always there."

তা তো হ'ল। কিন্তু ততঃ কিম্? সুপ্রামেণ্টালকে সনাক্ত করি কী ক'রে কৃষ্ণের চেয়েও গরীয়ান্ ব'লে? কৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগত, ডাকতে আরো ভালো লাগত, সবচেয়ে ভালো লাগত ভজন-কীর্তনের পাখায় তাঁর চরণে পৌঁছবার সাধনা করতে। আমি ভক্ত এ-অভিমান আমার সত্যিই ছিল না—আশা করি এখনো নেই—কিন্তু আমি তাঁর দাসানুদাস এ-পদবী ছিল আমার বহুবাঞ্ছিত—ভক্তি যার বাহন তথা মুকুট। আমার ওখানে একটি ছোট কৃষ্ণমূর্তি ছিল—রোজ ফুল দিতাম তাঁর শ্রীচরণে—গান গাইতাম তাঁর কৃপার্থী হ'য়ে—পড়তাম গীতা ভাগবত মহাভারত। এ-আবাহনে সুপ্রামেণ্টালের ঠাঁই করি কী ক'রে এই হ'ল এক মহাসমস্যা। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন বটে যে, সুপ্রামেণ্টালের নাগাল কোনো সাধকই পায় নি—সুপ্রামেণ্টালের পূজারী কেবল তিনিই—কিন্তু সাধকেরা প্রায়ই বলাবলি করত যে, কৃষ্ণকে ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দকে ও শ্রীমাকে না ধরলে সুপ্রামেণ্টালকে বরণ করা হ'তেই পারে না—কেন না কেবল শ্রীঅরবিন্দই এ-যুগে সুপ্রামেণ্টালের একমাত্র কাণ্ডারী তথা ভগীরথ।

"কাণ্ডারী" মানতে আমি নারাজ ছিলাম না কোনোদিনই—বরং মন আরো ভ'রে উঠত ভাবতে যে এ-দুস্তর ভবার্ণবে শ্রীঅরবিন্দ পারী হ'য়ে এসেছেন তাঁর জ্যোতির্ময় গুরুশক্তির মাধ্যমে আমাদের পারের পায়ানি দিতে। কিন্তু এ-গুরুশক্তি কি ইষ্টেরই ধারক শক্তি নয়? এইখানেই চিন্তা ঘুলিয়ে যেত যখন মনকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে, সুপ্রামেণ্টাল শক্তির আরাধনা না করলে শ্রীঅরবিন্দের গুরুশক্তি সক্রিয় হ'তে পারে না। মন একথা কিছুতেই মানতে চাইত না। বলত মধুসূদন সরস্বতীর ভাষায়ঃ "কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।" বাঁধলাম গানঃ

কৃষ্ণাতীতঃ

ওরা বলেঃ তোমার পরেও আছে আরো অনেক কথা!
আমি জানিঃ আমার প্রাণে মূর্তি তোমার জাগে সদা।
তারপরেও যদি থাকে, তুমিই দেবে দেখিয়ে তাকে—
তোমার জগৎ, তোমার লীলা, তোমার বিকাশের বারতাঃ
বিনা সে নয়নের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা।

আমি জানিঃ তোমা বিনা শূন্য আমার জীবনখানি।
আর কী হবে জানতে—দিও জানিয়ে তোমার পায়ে টানি'।
যে-চরণের তালে তালে কাটব আমি মায়াজালে,
সেই চরণে ঠাঁই না পেলে গাইব তোমার কোন্ বারতা?
বিনা সে-শরণের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা।

তোমায় যদি না পাই প্রভু, কী হবে হায় বাণী নিয়ে ?
মেঘও কাঁদে দামিনী যায় মিলিয়ে যখন ঝিলিক দিয়ে।
স্থির চপলা হ'য়ে এসো, কালোর বুকে আলো হেসো,
তারপরে যা চাও হৃদয়েশ, ফুটিয়ো হিয়ায় সেই বারতা :
বিনা সে-হৃদয়ের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা।

আজ বুঝতে পারি আমার ছেলেমানুষি—বার বার এই কৃষ্ণ বনাম গুরু সমস্যা নিয়ে মাথা বকাতে সুরু করে সুপ্রামেণ্টালের সমস্যায় মিথ্যেই বিপন্ন হওয়া। আমার মনে হ'ত না কোনোদিনই যে সুপ্রামেণ্টাল সত্য নয়—মরীচিকা মাত্র। তবে এ-প্রশ্ন উঠত বৈ কি—"সুপ্রামেণ্টালের অবতরণ হ'লে কী এমন মহাপ্রসাদ পাব যা কৃষ্ণকান্ত হ'য়ে তাঁর চরণে শরণ পেলে মিলবে না ?" রজনীকান্তের "কেন বঞ্চিত হব চরণে ?" গানটি গাইতাম সুপ্রামেণ্টালের উদ্দেশে : অর্থাৎ যদি কৃষ্ণকে চাই তুমি, সুপ্রামেণ্টাল, বিরূপ হবে কেন—তুমি তো কৃষ্ণাতীত সত্য নও ? আজ বুঝেছি যে, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সুপ্রামেণ্টালের প্রসাদ সম্বন্ধে তর্কাতর্কি ক'রে খুবই ভুল করেছি কেন না সুপ্রামেণ্টাল যখন কৃষ্ণাতীত সত্য নয় তখন কৃষ্ণকে চাইলে সুপ্রামেণ্টাল বিমুখ হ'তেই পারেন না। তবে চল্লিশ বৎসর আগে নানা উড়ো মেঘের জটলা আমার চিত্তাকাশের সমস্ত আলোকে ঢেকে দিত যার ফলে আমার মনে হ'ত সুপ্রামেণ্টাল কৃষ্ণের মতন মধুর লীলাময় সুরেলা নন—বিশ্বতোমুখ হ'তে পারেন, কিন্তু গুরুগম্ভীর, হিমশীতল, নিঃশব্দ সুদূর নিরাকার—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁর আবির্ভাবে আনন্দঘন বিরহ-মিলনের প্রাণকাড়া বৃন্দাবনলীলা থেমে যাবেই যাবে। কাজ নেই—সুপ্রামেণ্টাল আমার মাথায় থাকুন—কৃষ্ণ আসুন হৃদয়ে তাহ'লে চোখের জলেও ফুটবে হাসির ইন্দ্রধনু, বেদনা বাদলেও জাগবে অলোক আলোর চমক-চেতনা।

শ্রীঅরবিন্দ অবশেষে বাধ্য হয়ে লিখলেন আমাকে এক দীর্ঘপত্র ১৪ ১, ৩২ তারিখে। এ-চিঠি তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে, তাই এখানে শেষ অনুচ্ছেদের অল্প একটু উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব :

"The Supremental is not grand, aloof, cold and austere ; it is not something opposed to or inconsistant with a full vital and physical manifestation ; on the contrary, it carries in it the only possibility of the full fullness of the vital force and the physical life on earth. It is because it is so, because it was so revealed to me and for no other reason that I have followed after it and

persevered till I came into contact with it and was able to draw down some power of it and its influence. I am concerned with the earth, not with worlds beyond for their own sake; it is a terrestrial realisation that I seek and not a flight to distant summits. All other Yogas regard this life as an illusion or a passing phase; the supramental Yoga alone regards it as a thing created by the Divine for a progressive manifestation and takes the fulfilment of the life and the body for its object. The Supramental is simply the Truth-consciousness and what it brings in its descent is the full truth of life, the full truth of consciousness in Matter. One has indeed to rise to high summits to reach it, but the more one rises, the more one can bring down below. No doubt, life and body have not to remain the ignorant, imperfect, impotent things they are now; but why should a change to fuller life-power, fuller body-power be considered something aloof, cold and undesirable? The utmost Ananda the body and life are now capable of is a brief excitement of the vital mind or the nerves or the cells which is limited imperfect and soon passes: with the supramental change all the cells, nerves, vital forces, embodied mental forces can become filled with a thousandfold Ananda, capable of an intensity of bliss which passes description and which need not fade away. How aloof, repellent and undesirable! The supramental love means an intense unity of soul with soul, mind with mind, life with life, and an entire flooding of the body consciousness with the physical experience of oneness, the presence of the Beloved in every part, in every cell of the body. Is that too something aloof and grand but undesirable? With the supramental change, the very thing on which you insist, the possibility of the free physical meeting of the embodied Divine with the *Sadhak* without coflict of forces and without undesira-

ble reactions becomes possible, assured and free. That too is, I suppose, something aloof and undesirable? I could go on—for pages, but this is enough for the moment. (14. 1. 1932)"

[ভাবার্থ : সুপ্রামেণ্টাল গুরুগম্ভীর, সুদূর, হিমশীতল, রুক্ষ নয়। এমনও নয় যে, সে প্রাণিক বা দৈহিক স্তরে লীলাবিলাস আদৌ চায় না। বরং ঠিক উল্টোটাই সত্য : যে, কেবল তারি মধ্যে নিহিত আছে প্রাণশক্তির ও পার্থিব জীবনের পূর্ণতা।—এই মহাসত্যটি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল ব'লেই আমি তার উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেছিলাম যার ফলে অবশেষে আমি তার সংস্পর্শে এসে তার কিছুটা শক্তি ও প্রভাবকে টেনে নামাতে পেরেছিলাম। আমার মূল সাধনা পৃথিবীকে নিয়েই, অপার্থিব আমার লক্ষ্য নয়। আমি চাই পার্থিব উপলব্ধি, অভ্রভেদী কৈলাসবিহার নয়। আর সব যোগই মনে করে বিশ্বলীলা মায়া বা ক্ষণিক। কেবল সুপ্রামেণ্টাল যোগই বলে : "এ-বিশ্বরঙ্গেই ভগবান্ চান তাঁর ক্রমারোহী উচ্ছলন, জীবনের তথা দেহের পূর্ণ সিদ্ধি। আসলে, সুপ্রামেণ্টাল এক পরম সত্য চেতনা যার অনুষঙ্গী— জীবনের পূর্ণ সত্য, বস্তুলোকে অলোকচেতনার পূর্ণ অবতরণ। অবশ্য এজন্যে মানুষকে উঠতে হবে তুঙ্গ শিখরে, কিন্তু যতই সে উঠবে ততই সে পারবে মর্ত্যে স্বর্গকে টেনে নামাতে। মানি, এ-সিদ্ধির জন্যে মানুষকে তার নানা অজ্ঞান, অসঙ্গতি ও ক্ষমতার বন্ধন থেকে মুক্তি চাইতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে কি কোনো পূর্ণতর প্রাণশক্তি বা দেহশক্তিকে নাম দেবে—'সুদূর, হিমশীতল, অবাঞ্ছনীয়? আজকের দিনে দেহ ও প্রাণ পারে বড়জোর সজাগ মন স্নায়ু বা দেহকোষের চকিত সীমিত উত্তেজনার বাহন হ'তে। সুপ্রামেণ্টাল রূপান্তরের পরে মন প্রাণ দেহকোষ সবই হাজার গুণ আনন্দে টইটুম্বুর হবে যার নিবিডতা অবর্ণনীয়, যা ক্ষণায়ু নয়। বলবে কি, এ-হেন প্লাবনও সুদূর, দুর্বিষহ, অবাঞ্ছনীয়? সুপ্রামেণ্টাল প্রেমলোকে মিলন হবে আত্মার সঙ্গে আত্মার, দেহচেতনায় বান ডেকে যাবে দৈহিক ঐক্যবোধের, দেহের প্রতি মহলে প্রতি অনুকোষে প্রেমাস্পদের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের। বলবে কি—এ-ও সুদূর, গুরুগম্ভীর, অবাঞ্ছনীয়? সুপ্রামেণ্টাল রূপান্তর সাধিত হ'লে তুমি যা চাইছ তারস্বরে তা সম্ভবের কোঠায় আসবে--অর্থাৎ ভাগবতী তনুর সঙ্গে সাধকের শুভদৃষ্টি তথা অবাধ আদান প্রদান। এ-ও কি সুদূর, অবাস্তব, অবাঞ্ছনীয় বলবে? আমি আরো অনেক কিছুই লিখতে পারতাম পাতার পর পাতা, কিন্তু আপাততঃ এখানেই ইতি করি—পরে আরো লিখব।]

এ-প্রাণস্পন্দিত সুদীর্ঘপত্রের অভিঘাতে শুধু যে সুপ্রামেণ্টাল সত্যের বাস্তবতা ও অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে আমার সব সংশয়ের নিরসন হয়েছিল তাই নয়—আমি আরো

নানা যোগের বাণী ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে পেয়েছিলাম যথেষ্ট পথের পাথেয়। কিন্তু একটি সংশয়ের কাঁটা তবু কেমন যেন থেকে থেকে খচ খচ ক'রে বাজত আমার অবোধ মনেঃ যে, সুপ্রামেণ্টাল জ্যোতি যদি এ-হেন সর্বার্থসাধিকা হয় তবে পূর্ণাবতারী ভগবান্ কৃষ্ণ কেন তাকে আবাহন না ক'রে 'রুধিরপ্রদিগ্ধ' কুরুক্ষেত্রের সারথি হ'লেন? শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ যখন এ-অবতরণ চান নি তখন শ্রীঅরবিন্দ কেন চাইলেন? তিনি অবশ্য পরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রাঞ্জল ভাষায়ই যে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ এ-অবতরণ চান নি তখন কাল পূর্ণ হয় নি ব'লেই। (তাঁর সে-চিঠি আগেই উদ্ধৃত করেছি।) কিন্তু সে-চিঠিটি আমি পাই ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে। তাই ১৯৩৫ সালে আমার মনে ফের প্রশ্ন উঠল—শ্রীঅরবিন্দ লোকোত্তর মহাপুরুষ ব'লেই কি চাইছেন সুপ্রামেণ্টালকে আবাহন ক'রে অসাধ্যসাধন করতে—যা কেউ পারে নি তাই ক'রে জগতে এক মহাকীর্তির শক্তিপীঠ প্রতিষ্ঠা করতে? মনে আমার কোনো সংশয়ের মেঘ উঠলেই আমি গুরুদেবকে জানাতাম—কারণ জানতাম তিনি আমাকে কখনই ভুল বুঝবেন না। তাই মনে হ'ল মেঘকে কাটানোই ভালো—যদি তিরস্কারের ঝাপটায় কাটে তাই সই। গুরুর তিরস্কার তো পুরস্কারই বটে। ভাগবতে'বলে নি কি কৃষ্ণকে বলেছিলেন কালিয়নাগের নাগিনীরাঃ "ক্রোধো হি তেহনুগ্রহ এব সম্মতঃ তোমার ক্রোধও যে অনুগ্রহ প্রভু!" তাই সোজা প্রশ্ন করলাম—শ্রীঅরবিন্দ মহৎ থেকে মহত্তর কীর্তির স্তরে উত্তীর্ণ হ'তে চাইছেন ব'লেই কি সুপ্রামেণ্টাল সিদ্ধি চাইছেন? শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ যা চান নি সে-অবতরণকে চাওয়া কি দুঃসাহসিক নয়? উত্তরে তিনি লিখলেন তাঁর একটি প্রেমোদ্বেল পত্র যার ঝঙ্কারের স্মৃতি আজো আমার মনে ভক্তিপুলকের শিহরণ জাগায়ঃ

Dilip,

These egoistic terms are not those in which my vital moves. It is a higher Truth I seek, whether it makea men greater or not is not the question, but whether it will give them truth and peace and light to live in and make life something better than struggle with ignorance and falsehood and pain and strife. Then even if they are less great than the men of the past, my object will have been achieved. For me mental conceptions cannot be the end of all things. I know that the supermind is a truth.

It is not for personal greatness that I am seeking to bring

down the supermind. I care nothing for greatness or littleness in the human sense. I am seeking to bring some principle of inner Truth, Light, Harmony, Peace into the earth consciousness ; I see it above and know what it is—I feel it ever gleaming down on my consciousness from above and I am seeking to make it possible for it to take up the whole being into its own native power, instead of the nature of man continuing to remain in half-light half-darkness. I believe the descent of this Truth opening the way to a development of divine consciousness here to be the final sense of the earth evolution. If greater men than myself have not had this vision and this ideal before them, that is no reason why I should not follow my Truth-sense and Truth-vision. If human reason regards me as a fool for trying to do what Krishna did not try, I do not in the least care. There is no question of X or Y or anybody else in that. It is a question between the Divine and myself—whether it is the Divine will or not, whether I am sent to bring that down or open the way for its descent or at least make it more possible or not. Let all men jeer at me if they will or all Hell fall upon me if it will for my presumption,—I go on till I conquer or perish. This is the spirit in which I seek the Supermind, no hunting for greatness for myself or others. (10.2.35)

এ-আশ্চর্য লিপিকার দীপ্র বাণী আমার কাছে শুধু যে আঁধারে আলো হ'য়ে এসেছিল তাই নয়—আমার নানা সঙ্কটেও আমাকে দিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি—যার প্রসাদে আমি অনেক কিছু দেখতে পেয়েছিলাম যা আগে আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু সেকথা পরে বলব—যদি বলবার প্রেরণা পাই। আপাতত এ-অগ্নিলিপির অনুবাদ দিই—যদিও জানি ইহার ভাবানুবাদও আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

[ভাবার্থ: আমার প্রাণশক্তি এ-ধরণের অহমিকার বৃত্তে চারণ করে না। আমি একটি ঊর্ধ্বতর সত্যের সন্ধানী। সে-সত্য মানুষকে মহত্তর করবে কি না তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই। আমি শুধু চাই—এ মহাসত্যের অবতরণের ফলে মানুষ যেন সে-অবদানের শক্তি ও দীপ্তির অধিকারী—মর্ত্য জীবন যেন অজ্ঞান মিথ্যা বেদনা

ও সংঘর্ষকে দাবিয়ে উঠতে পারে এক উচ্চতর স্তরে।* যদি পারে তাহ'লে আজকের মানুষ অতীতযুগের মানুষের চেয়ে কম মহীয়ান্ হ'লেও আমার লক্ষ্যসিদ্ধি হবে। আমার মনে হয় না যে, মানুষকে চিরকাল কেবল মানসিক ধারণার সঙ্গেই ঘরকন্না করতে হবে। আমি যে জানি—অতিমানস একটি মহাসত্য।

আমি অতিমানসকে আবাহন করতে চাই আমার ব্যক্তিগত মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে নয়। মহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রতা বলতে মানুষ যা বোঝে তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি পার্থিব চেতনার মধ্যে ডাক দিতে চাইছি কোনো আন্তর সত্য, জ্যোতি, সুষমা ও শান্তিকে। আমি উর্ধ্বলোকে তাকে দেখতে পেয়েছি, তাই জানি সে কী বস্তু। আমার চেতনার' পরে তার আনত তুঙ্গ প্রভাকে আমি অনুভব করেছি, তাই চাই সে-প্রভা মানুষের সমগ্র সত্তাকে তার স্বকীয় দৈবী সত্তায় টেনে তুলে নিয়ে সার্থক করুক—আজকের মর্ত্য প্রকৃতি যে আধ-আলো আধ-আঁধারের সঙ্গে ঘরকন্না করছে সে-দুরবস্থার অবসান হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এ-মহাসত্যের গঙ্গাবতরণের ফলে মর্ত্যলোকে এক দিব্যচেতনার পথ খুলে যাবে, আর সেই উন্মুক্তিই হবে পার্থিব বিবর্তনের অন্তিম ফলশ্রুতি। আমার চেয়ে মহত্তর মানুষ যদি এ-দৃষ্টি বা আদর্শ বরণ ক'রে না থাকেন তাহ'লে বলবে কি—আমার নিজের সত্যপ্রেরণার বা দৃষ্টির পথে চলা আমার অকর্তব্য? যদি মানুষের যুক্তি বলে—কৃষ্ণ যে-সাধনা বরণ করেন নি তার আবাহন করতে চাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা—বলুক, আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। এক্ষেত্রে অমুক তমুকের রায় অবান্তর—এ হ'ল ভগবানের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার প্রশ্ন—অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছানুবর্তী কি না, আমাকে তিনি আদেশ দিয়েছেন কি না অতিমানস শক্তিকে আবাহন করতে, বা এ-অবতরণের পথ খুলে দিতে—অন্তত সুগম করতে। যদি সবাই আমার স্পর্ধার জন্যে আমাকে বিদ্রূপ

*সাবিত্রীর শেষ বল্লীতে দৈববাণীর এই ঝঙ্কারই ফুটে উঠেছে:

"O Force-compelled, Fate driven earthborb race'
Petty adventurers in an infinite world
And prisoners of a dwarf humanity,
How long will you tread the circling tracks of mind,
Around your little self and petty things?
But not for a changleess littleness you were meant;
Not for Vain repetition were you built;
Out of the Immortal's substance you were made;
Your actions can be swift revealing steps,
Your lile a changeful mould for growing gods." (4. 3)

করে—করুক, যদি নরকের সমস্ত শক্তি আমার এই মূঢ় সংকল্পের পরে চড়াও হয়—হোক : আমি চলবই চলব আমার তীর্থলক্ষ্যের পানে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' প্রতিজ্ঞা জপ ক'রে। আমার অন্তরাত্মার এই নির্দেশ মেনেই আমি অতি-মানসসাধনার উদ্বোধন চেয়েছি—আমার নিজের বা আর কারুর মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কামনায় নয় নয় নয়।]

॥ কুড়ি ॥

শ্রীঅরবিন্দের এই লিপিকার হেমপ্রভা আমার মনে শুধু যে এক গভীর আলোড়ন এনেছিল তাই নয়, আমার মূঢ় ধারণার নিরসন করেছিল যে শ্রীঅরবিন্দ কোনো কাতির কৈলাসবাসী হ'তে চান। কৈশোরে আমার অন্তরে প্রথম এ ধরণের আলোড়ন আসে যখন "কথামৃতে" পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী : "ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।" শ্রীঅরবিন্দের এ-পত্রটির মধ্যে আমি শুধু যে তাঁর বীর্যের স্পন্দন শুনেছিলাম তাই নয়, হৃদয় আমার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল তাঁর প্রেমে। পরে তাঁর সাবিত্রীতে পড়েছিলাম এই দীপ্ত প্রেমের উচ্ছলন – ভাগবতী বাণী :

> Ask not the imperfect fruit, the partial prize,
> Only one boon, to greaten thy spirit demand ,
> Only one joy, to raise thy kind desire.
> চাহিও না কখনো এ-জীবনে অপরিণত ফল,
> অপূর্ণ কীর্তির সিদ্ধি। চাহিও কেবল এ-ধরায়
> আত্মার প্রসার তব। একটি পরম বর শুধু
> করিও কামনা—তব সাথী মানবের উন্নয়ন।

এই-ই চিরদিন চেয়ে এসেছে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রেমিক অন্তরাত্মা। তাই তিনি আমাকে লিখেছিলেন তাঁর একটি প্রাণস্পর্শী গভীরদর্শী পত্রে* : "ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর থেকে আমার যোগ চিরদিনই হ'য়ে এসেছে ঐহিক তথা পারমার্থিক।…আমি বম্বেতে আপলো বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার নানা আত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল, কিন্তু কোনো মাটিছাড়া উপলব্ধি নয়…আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল যে, সৃষ্টির সবই ব্রহ্মে অনুস্যূত† · আমার যোগে ঐহিকতা ও

---

* SRI AUROBINDO' LETTERS—FOURTH SERIES pp. 28-33-২৮.৪.৪৯

† শ্রীঅরবিন্দ বারবারই সমর্থন করেছেন উপনিষদের মহাবাক্য : "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—বিরক্ত বৈরাগী-দের মায়াবাদ যে, "জগৎ মিথ্যা"—এ বাণীতে তিনি কোনদিনই সাড়া দেন নি।

পারমার্থিকতা দুইই পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে এসেছে।...এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি থেকেই আমি আমার 'লাইফ ডিভাইন' ও 'সাবিত্রী' লিখি। ভগবানকে পেতে হবে অবশ্যই, কিন্তু তাঁকে ভালোবেসে তাঁর সেবা করা কর্মের মধ্যে দিয়ে, তাঁকে জানতে ও চিনতে চাওয়া শুধু বুদ্ধির মাধ্যমে নয় আত্মিক অনুভূতির আলোয়—আমার পূর্ণযোগে এ-সবই চাই। তুমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের এ-নির্দেশ মানো যে, তোমাকেও চলতে হবেই হবে এই জ্ঞান কর্ম ভক্তির সমন্বয়-পথে—তাহলে সংসার বিমুখ পারমার্থিকতা তোমারও স্বধর্ম হ'তে পারে না...তুমি চিরদিনই গুরুবাদে বিশ্বাস ক'রে এসেছ: আমি তাই বলতে চাই—তুমি গুরুর দেশনা (guidance) মেনে এখন ভগবানের করুণায় পূর্ণ নির্ভর কোরো কৃতকৃত্য হ'তে আর বিশ্বাস রেখো আমার অটল স্নেহে..."

এই বিশ্বাস ও নির্ভর আমার মনে আরো দৃঢ়মূল হয়েছিল গুরুদেবের অতিমানস-প্রত্যয়ের মন্ত্রময়ী লিপিকায়—যার প্রেম, বীর্য ও ঐকান্তিকতার ত্রিবেণীসঙ্গমে আমি যেন স্নান ক'রে নির্মল হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল হৃদয়ের অমল আলোর স্পর্শে আমার নানা কুতর্কের অন্ধকার মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল—ধন্য আমি যে, এহেন মহামহিমার্ণব দ্রষ্টা গুরুর অপার স্নেহগঙ্গায় অবগাহন ক'রে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি তাঁর উদার আদর্শকে—যে আদর্শ পরে তিনি কবিতায়ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন সাবিত্রীতে অশ্বপতির চিত্রায়ণে (৩.২):

His single freedom could not satisfy,
Her light, her bliss he asked for earth and men
Into the darkness of the suffering world.
শুধু আপনার একেলার আত্মসুখী মুক্তি তাঁর
ছিল না ঈপ্সিত আর—চাহিতেন তিনি তারিণীর
আলোক আনন্দবর মর্ত্যের ও মর্ত্যবাসী তরে—
আর্তা ধরণীর যুগ-অন্ধকার ঘুচাতে সাধনে।

॥ একুশ ॥

কিন্তু মানুষের চেতনার রূপান্তর সম্বন্ধে গুরুদেবের অপরূপ নিশ্চয়োক্তি আমাকে অভিভূত করার ফলে অতিমানস সম্বন্ধে তাঁর নানা বাণীতে আমি সাড়া দিলেও সে-বাণী আমার বুকের তারে বেজে ওঠে নি—বলতে পারি নি মন মুখ এক ক'রে: "অতিমানসলোকেই আমি চিরাশ্রয় চাই, আমার ইষ্ট বলে বরণ করতে চাই

অতিমানস অনামীকে।" এর একটা প্রধান কারণ—আমি আশৈশব নানা বৈষ্ণব পরমভাগবতকে আমার প্রেমের প্রণামী নিবেদন করার ফলে আমার সংস্কার গ'ড়ে উঠেছিল রূপোৎসবী কৃষ্ণমুখী হ'য়ে। তাই আমি অচিন্ত্য অতিমানসলোকের মহামহীয়ান্ দেবদেবকে ডাকতে পারি নি সর্বান্তঃকরণে, গাইতে পারি নি তাঁর অবোধ্য অপার সত্তার উচ্ছ্বসিত গুণগান। কৃষ্ণের ব্যক্তিরূপের বহুরঙ্গী বৈচিত্র্যই আমার মনকে রঙিয়ে তুলেছিল। ব্যক্তিরূপ—ব্যক্তিরূপ—এই-ই তো তৃষ্ণার জল, চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস। শিব দুর্গা কালী? তাঁদের ছবিও আমার প্রাণের পটে প্রেমের রেখায় রঙে আঁকতে পেরেছিলাম ব'লেই আমি সাড়া দিতাম দেবদেবীদের ডাকে। গঙ্গার তো কথাই নেই। ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর আত্মজীবনী EXPERIENCE-এ লিখেছেন (১৪৭ পৃঃ):

"I believe that the true end of Man is self sacrificing love; that love is divine; that it is the only God that we know from experience." অর্থাৎ, যে-প্রেম শুধু সব হারাতে ভয় না পেয়ে চলে একটানা আত্মোৎসর্গের দুরভিসারে সে-প্রেম স্বরূপে দেবতা—কেবল এই দেবতাকেই আমরা জানি চিনি অপরোক্ষ অনুভবে।

গঙ্গার দৈবী সত্তা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিরই আমি প্রতিধ্বনি করতে চাই: যে, তিনি শুধু আকাশের দেবদুহিতা নন, মর্ত্যেরও মাতা, পতিতপাবনী, অমলতারিণী আনন্দসুরধুনী। তাঁকে ভালবেসে পূজা করে এসেছি অশৈশব—পুণ্যসলিলা ব'লে তাঁর আদরকে জগন্মাতার ঘুমপাড়ানি কোল ব'লে। কৈশোরে একটি গান আমাকে মুগ্ধ করত: যে, শেষের দিনে যখন অন্তর্জলী হ'ব তখন

"অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে
কেহ বা লিখিবে ভালে কৃষ্ণ নামাবলী"
(মূল গানটিতে ছিল কালীনামাবলী)

আমার একটি কামনা আমি বহুবারই ঠাকুরকে নিবেদন করেছি চোখের জলে—যার প্রাণকাড়া রূপ দিয়েছিলেন আমার পিতৃদেব, গঙ্গাপূজারী দ্বিজেন্দ্রলাল (সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে গেয়):

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি! গঙ্গে!*

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে: কৃষ্ণ তো গঙ্গার মতন প্রত্যক্ষ দেবতা নন—জগতে কোথাও তো তাঁকে দেখা যায় না—তাঁর বিগ্রহকে তো বলা চলে না মূর্ত কৃষ্ণ, যেমন গঙ্গাকে বলা চলে মূর্তিমতী নিস্তারিণী। এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বুদ্ধির কাছে মেলে না, কিন্তু যার হৃদয়ে তিনি একবারও উঁকি দিয়েছেন, যে শুনেছে তাঁর অকূল বাঁশি, সে ধ্রুবপ্রত্যয়ের আঁখরে, আনন্দের অবাধ উচ্ছ্বাসে:

ওরা হাসে···কলভাষে···ওরা জানে না, তাই হাসে···
ওরা জানে না···তাই মানে না···
আমি জানি···তাই মানি···
আমি অন্তরে তব বাঁশরি শুনেছি তাই বঁধু আমি জানি—
তুমি আজো ডাকিলেই আসো···
আজো বাঁশিস্বরে ভালোবাসো···
ডাকি আঁখিজলে যেই "কোথা তুমি?" সেই করুণায় নেমে আসো···
তুমি নয়ন মুছাতে আসো···
তুমি করো বুকে-বুকে যুগে যুগে গান বঁধু···
তাই আজো তব বরে সুখে দুখে ঝরে মধু···
দুখ-বাদলে তোমায় জানি···সুখ-কিরণে তোমায় জানি···
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি···মধু-মিলনে তোমায় জানি···
আমি জীবনে তোমায় জানি···স্বামী, মরণে তোমায় জানি।

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে কৃষ্ণের বানী পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন তাঁকে সর্বত্র—"তেন সর্বমিদং ততম্"। তাঁর বর্ণনা পড়লে মনে আসে গীতার "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"—যিনি কৃষ্ণকে সবখানেই দেখেছেন এমন মহাত্মা সুদুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এম্নি মহাত্মা পূর্ণকৃষ্ণোপলব্ধি ক'রে। তাই তিনি আমার কৃষ্ণ-সংস্কারকে শুধু যে সমর্থন করেছিলেন তাই নয় আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন যে, আমার কৃষ্ণলাভ হোক এ তিনিও চান সর্বান্তঃকরণে—শুধু তাই নয়, ১৯৩৩ সালে

---

*কয়েক বৎসর আগে হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে আমি একটি গান বেঁধেছিলাম:

এসো কাছে...আরো কাছে···
শুনি তোমার জলের মুক্তিনূপুর বাজে।
যারা বলে: তুমি শুধুই জলের ঢেউ মা,
তারা প্রাণ-অতলে তোমার কোলের ডাক শোনে নি কেউ মা

মে মাসে আমাকে লিখেছিলেন জোরালো স্বরেই: "I am prepared to take you the whole way myself." (আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত।)

কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি আরো জোর দিয়ে লিখেছিলেন একটি বিখ্যাত দীর্ঘপত্র মনীষা শ্রীসঞ্জীব রাওয়ের প্রশ্নের উত্তরে। এ-প্রশ্নটি তাঁর কাছে আমি দাখিল করেছিলাম রাওসাহেবের চিঠি পাঠিয়ে। বন্ধুবর প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণচেতনাকে সত্য ব'লে মানলেও জানতে চান—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বা গোপীদের আত্মহারা প্রেমলীলা ঐতিহাসিক সত্য, না শুধু প্রতীক মাত্র অথবা সাধু বা ভক্তের মনগড়া গল্প গাঁথা বা মূর্তি গড়ার সনাতন উচ্ছ্বাস? আমি আমার পত্রে শুধু এইটুকু জুড়ে দিয়েছিলাম যে, আমি মানি বৈষ্ণবদের বাণী যে, প্রতি হৃদয়ই এক একটি গোপী হৃদয়—যদি অবশ্য সে কৃষ্ণকে মধুর ভাবে বরণ ক'রে তাঁর পরম মিলন চায় নিত্যবৃন্দাবনে।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন রাওসাহেবের প্রতি প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিয়ে। কিন্তু সে-সব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকু ভূমিকা করতে চাই যে, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—দেবদেবীরা মানুষের কল্পিত নন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরাও আছেন ও মানুষের কাছে নিজের নিজের রূপ ধ'রে আসেন যদি মানুষ তাঁদের দর্শন চায়। আরো লিখেছিলেন যে: তিনি নিজে কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। লিখে শেষের দিকে এই মন্তব্য করেছিলেন:

The Lila of the Gopis seems to be conceived as something which is always going on in a divine Gokul and which projected itself in an earthly Brindavan and can always be realised and its meaning made actual in the soul……These questions and the speculations to which they have given rise have no indispensable connection with the spiritual life. There what matters is the contact with krishna and the growth towards the Krishna consciousness, the presence, the spiritual relation, the union in the soul and till that is reached, the aspiration, the growth in bhakti and whatever illumination one can get on the way. To one who has had these things, lived in the presence, heard the voice, known Krishna as friend or Lover, Guide, Teacher, Master or, still more, has had his whole consciousness changed by the contact, or felt the presence within him, all such questions have

only an outer and superficial interest. so also one who had had contact with the inner Brindavan and the *Lila* of the Gopis, made the surrender and undergone the spell of the joy and the beauty or even only turned to the sound of the flute, the rest hardly matters. But from another point of view, if one can accept the historical reality of the incarnation, there is this great spiritual gain that one has a *point d'appui* for a more concrete realisation in the conviction that once at least the divine has visibly touched the earth, made the complete manifestation possible, made it possible for the divine supernature to descend into this evolving but still very imperfect terrestrial nature (2.12.46)

[ভাবার্থ : মনে হয়, গোপীদের প্রেমলীলা কল্পিত হয়েছে এক নিত্য বৃন্দাবনে যার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে আমাদের প্রাকৃত গোকুলে—তাই এ-সত্যকে চিরদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এ-সব জল্পনা কল্পনার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। আসল কথা, চাইতে হবে কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে সংযোগ তথা তার ফলে মানবিক চেতনার বিকাশ, কৃষ্ণের দর্শন, তাঁর সঙ্গে আন্তর আদান-প্রদান, আত্মিক মিলন। এ-মিলন না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তরই চাইতে হবে ভক্তির ক্রমোন্মেষ—এ-উন্মেষের পথে যতটা পারা যায় আলোর পাথেয় আহরণ ক'রে। যার এই সব আত্মিক লাভ হয়েছে, যে পেয়েছে তাঁর দর্শনের উপজীব্য, শুনেছে তাঁর সম্ভাষণ, চিনেছে তাঁকে বন্ধু বল্লভ দিশারি গুরু প্রভু অন্তর্যামী ব'লে—সর্বোপরি, যার সমগ্র চেতনা তাঁর স্পর্শে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে তার কাছে আর সব তথ্যই বাহ্য। কেন না যে নিত্যবৃন্দাবনে গোপীলীলার সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে, কৃষ্ণের চরণে আত্ম-সমর্পন ক'রে পেয়েছে পরমানন্দ, দেখেছে তাঁর রূপরাগ, বা শুধু সাড়া দিয়েছে তাঁর বাঁশির ডাকে—তার আর কী প্রার্থনীয় থাকতে পারে? তবু একদিক দিয়ে বলা চলে যে, কৃষ্ণাবতারের ঐতিহাসিকতাকে যদি কেউ সত্য ব'লে মেনে নেয় তাহ'লে তার এই একটা মস্ত আত্মিক লাভ হয় যে, সে একটি প্রত্যক্ষ ভিত্তিমূলের পরে দাঁড়াতে পেরে পৌঁছায় এই গভীর নৈশ্চিত্যে যে, অন্তত একবার ভগবান প্রত্যক্ষ নরতনু ধ'রে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন নিজের পূর্ণিমাপ্রকাশকে সম্ভব ক'রে দিব্য পরা প্রকৃতিতে অবতীর্ণ করতে এই ক্রমবিকাশমান খুঁতে-ভরা বসুন্ধরায়।']

গুরুদেবের এ-পত্রটি প'ড়ে আমার মন উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল বিশেষ ক'রে তাঁর

শেষ ছত্রটির প্রসাদে। কারণ আমি বরাবরই কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার মনে করতাম ব'লে বলতাম প্রায়ই তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিভূতি স্মরণ ক'রে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন সেখানে শেষ রক্ষা হবেই হবে প্রেমের দিগ্বিজয়ে ধ্রুব নীতির প্রবর্তনে। ভবসাটি দিয়েছিলেন সঞ্জয় গীতার শেষে পুলকিত হ'য়ে—গেয়ে "হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।" আমার চিরদিনই মনে হয়েছে—কৃষ্ণের ভাগবত মহিমায় যারা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে অক্ষম তারা আজীবন একটি মহানন্দ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় দেখতে না পেয়ে যে, একবার অন্তত ভগবান প্রত্যক্ষ মানুষী তনু ধ'রে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন শুধু নিজের পূর্ণিমাপ্রকাশকে সম্ভব ক'রে দিব্য পরা প্রকৃতিকে অবতীর্ণ করতেই নয়—তাঁর অপরূপ রূপৈশ্বর্যের মাধ্যমে প্রেম জাগিয়ে আমাদের বিষণ্ণ ধরাধামে নিখুঁত আনন্দ বৈকুণ্ঠের স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটন করতে—

নেচে গেয়ে হৃদয় ছেয়ে
ফুল ফুটিয়ে কাঁটাবনে
অতুল হাসির অকূল বাঁশির
ঘরছাড়া প্রেম-উন্মাদনে।

॥ বাইশ ॥

আমি কৃষ্ণ ও গঙ্গা সম্বন্ধে লিখেছি যে, ছেলেবেলায়ই আমার মনে বিশ্বাস এসেছিল তেমনি সহজে "নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে।"* এ-উদ্ধৃতিটি পুরোপুরি সুপ্রযুক্ত হয়েছে কেবল কৃষ্ণের ক্ষেত্রে। কারণ আমার মনে নাস্তিক বুলির জটলা মেঘের মতন আস্তিক্যের আলোকে ঢেকে দিয়েছিল প্রথম দিকে (যে কথা আমার "স্মৃতিচারণ"-এ বলেছি)। সে-আঁধারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই ঊষার আলোর মতন নেমে এসেছিল কৃপারূপে যে-আলো মাঝে মাঝে সংশয়ের বাদলে ম্লান হ'লেও মরিয়া-না-মরে-রামের মতনই ফের জেগে উঠত। কিন্তু গঙ্গার ক্ষেত্রে সংশয় আসে নি কোনোদিনই। পুরাণে আছে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর জন্ম নিয়েছিলেন হিমালয়ের ঘরণী মেনকার গর্ভে যুগল কন্যারূপে—উমা ও গঙ্গা—উভয়েই

*চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।...
আয় মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে শুভ্রবাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে। (দ্বিজেন্দ্রলাল)

শিবের ঘরণী। ভেবে পার পেতাম না কৈশোরে। কিন্তু গঙ্গা শিবজায়া কি না এ-বিষয়ে ধাঁধায় পড়লেও তিনি যে দেবী এ-সম্বন্ধে মনে একবারও সংশয় আসে নি। পিতৃদেব ভক্তির গান বেঁধেছিলেন—কৃষ্ণ শিব কালী গঙ্গা শ্রীচৈতন্য ও জন্মভূমি দেবিকাকে অর্ঘ দিয়ে। তাঁর মুখে এসব দেব দেবীর গানে আনন্দে বিভোর হ'য়ে তাঁর সঙ্গে দোয়ার দিতে দিতে অজ্ঞান্তেই হ'য়ে উঠেছিলাম প্রতিমাপূজারী—যার ফলে প্রতিমা দেখলেই প্রণাম করতে আনন্দ পেতাম। কিন্তু সব প্রতিমাকেই প্রণম্য ব'লে বরণ করলেও সবচেয়ে গভীর আনন্দ পেতাম কৃষ্ণবিগ্রহকে গড় ক'রে। বলেছি, শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই ধরেছিলেন যে, কৃষ্ণসংস্কার যার মজ্জাগত তার কাছে সুপ্রামেণ্টালের অত্যধিক গুণগান করা নিষ্ফল। কিন্তু আশ্চর্য সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবশেষে আমাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি দেখেও দেখতে চাইনি ব'লে যে, সুপ্রামেণ্টাল কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী নন—পরিপূরক। একথা আমি খুশী মনেই মেনে নিয়েছিলাম সুপ্রামেণ্টাল সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপক চিঠিটি প'ড়ে। কিন্তু বিদেহ সুপ্রামেণ্টালকে আমার কৃষ্ণপূজারী মনে সশ্রদ্ধে ঠাঁই দিলেও ভালোবাসতে পারি নি যেমন পেরেছিলাম কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে। এ-প্রত্যয়টির পুনরুক্তি করছি এই জন্যে যে, পণ্ডিচেরি আশ্রমের আবহে কৃষ্ণ সুপ্রামেণ্টালের নিচে স্থান পাওয়ার জন্যে আমি মনে সত্যিই গভীর বেদনা বোধ করতাম যার ফলে থেকে থেকে রুখে উঠে বলতাম: "সুপ্রামেণ্টাল আমার মাথায় থাকুন, কেবল কৃষ্ণ যেন থাকেন আমার হৃদয়ে।" পণ্ডিচেরি আশ্রমে শুনতাম প্রায়ই যে, মানুষের চেতনার যতই বিকাশ হয় ততই সে অতীতের দিকে ফিরতে না চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগুতে চায়। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত "We do not belong to the past dawns but to the noon of the future" মন্ত্রটি আমি থিওরিতে সাদরেই বরণ ক'রে নিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতাম যে, কৃষ্ণই বার বার যেন উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাতছানি দিতেন বিগত উষার অস্তাচল থেকে চিরন্তন নবারুণের মতন। মাঝে মাঝে নিজেকে নিশানা ক'রেই চুপি চুপি হাসতাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি রসাল কথিকা স্মরণ ক'রে: এক কালীভক্ত ব্রাহ্মণকে এক পালোয়ান মোল্লা জোর ক'রে কলমা পড়িয়ে মুসলমান ক'রে বলে: "এখন থেকে বল্ আল্লা, আল্লা—কালী বললেই তোর মুণ্ডপাত করব।" বেচারী কী করে? বিমনা হ'য়ে জপ করে: "আল্লা আল্লা আল্লা…জগদম্বা…আল্লা, হো আল্লা …জগদম্বা।" মোল্লা রেগে তাকে কাটতে যেতে সে করজোড়ে বলে: "শেখজি, অপরাধ নেবেন না—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি আল্লামন্ত্র জপ করতে, কিন্তু মা জগদম্বা আমার বুক ভ'রে আছেন, তিনি থেকে থেকে আল্লাকে ঠেলে বেরিয়ে পড়ছেন।" সুপ্রামেণ্টাল আমার কাছে হ'য়ে উঠেছিল আল্লার মতন বিধর্মী এমন

ইঙ্গিত করছি না, তবে কৃষ্ণ যে ঐ ব্রাহ্মণ বেচারীর মতন আমার বুক ভ'রে ছিলেন একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু তাব'লে আমি স্বপ্রামেণ্টালের প্রতি অপ্রসন্ন একথা বললে আমার বুদ্ধিকে অযথা অপদস্থ করা হবে। সুপ্রামেণ্টাল সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উচ্ছ্বাসে থিওরিতে আমি সত্যিই সাড়া দিয়েছিলাম। তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে, তিনি নিশ্চয় অবতীর্ণ করাবেন এ-অজ্ঞাতপূর্ব নবদেবকে যাঁর আবিভাবে এ-ধূলিধামে মানুষের নবজন্ম না হোক চেতনার নববিকাশের পথ খুলে যাবে। তাছাড়া যে-নবারুণের স্বর্ণ প্রভায় মানুষ তার সুদুর্লভ ইষ্টের সঙ্গে কথালাপ করতে পারবে সে-উদয়কে কোন্ মূঢ় না বরেণ্য ব'লে মেনে বরণ করতে চাইবে? আর শুধু কথালাপই তো নয়—মানুষের রোগমুক্তি হবে, দুঃখশোকের নিরসন হবে—বারবার ওঠার পরে পডতে হবে না, আমরা অভীপ্সার পাখা মেলে উড়ে চলব মেঘলোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে তারালোকে—এমন যে জাদুকর বরদাতা তাকে না চাইবে কোন্ অর্বাচীন? কেবল মুস্কিল এই যে, আমাদের মন-তরুর নানা শাখায় নানা রঙের নানা মেজাজের পাখী নীড বাঁধে—যেকথা শুধু শ্রীঅরবিন্দ না, মহামনীষী গেটেও বলতেন উঠতে বসতে। [গেটে তাঁর ZUR MORPHOLOGY-তে লিখেছিলেন : "Every living being is not a unity but a plurality. Even when it appears as an individual, it is the reunion of being living and existing in themselves." অর্থাৎ, কোনো মানুষই একলা নয়—অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি—যদিও বাইরে থেকে দেখতে একলা মনে হয়।] ফলে কখনো এ-পাখীর গানের আস্থায়ীকে ও-পাখীর অন্তরা ঢেকে দিত —কখনো ও পাখী এ-পাখীকে থামিয়ে গান শুরু করত। আমি তাই বারবার নিজেকে ধমকিয়েও শুধু যে সুপ্রামেণ্টালের পায়ে গড করতে পারতাম না তাই নয়, তাঁর কাছে হাত জোড করতেও বাধত—মনে হ'ত আগুনের ছবিকে কেমন ক'রে আগুনের মান দিই? কৃষ্ণের সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনেছি, শ্রদ্ধেয় ভক্তদের আত্মকথায় তাঁর নূপুরধ্বনি—কিন্তু সুপ্রামেণ্টালের ছায়াপথের এক-টুকরো রশ্মিও যে আমার চলার পথে কখনো আলো ধরে নি, এমন কি চকিত আভাষও পাই নি আমার কল্পনার দূরবীনে বা বুদ্ধির অনুবীনে!

একদা এই ধরনেরই একটি মন্তব্য করেছিল আমার এক প্রিয় গুরুভাই জে এ চ্যাডউইক ওরফে আর্জব। বলেছিল: "তুমি জানো দিলীপ, শ্রীঅরবিন্দকে আমি কী গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু চমকে উঠতে হয় অতিমানস আলোর অবতরণ সম্বন্ধে তাঁর বাণী শুনে! সত্যিই কি এ-অলোক আবির্ভাব হবে আমাদের ম্লান পৃথিবীতে?" ["Sri Aurobindo takes one's breath away, Dilip, but will the supramental really take birth in this our dismal earth?"]

চ্যাডউইকের কথা বলি এবার সংক্ষেপে। তার অসামান্য বুদ্ধি প্রতিভা—সর্বোপরি, আন্তরিকতা—আমাকে শুধু যে সাধনায় উৎসাহ দিত তাই নয়, জোগাত মনের শক্তি, কবিতার প্রেরণা, স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনা। সে প্রায় দেড় বৎসর ছিল আমার পাশের ঘরে বরনীয় কমনীয় সতীর্থ হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সে (কৃষ্ণপ্রেমের মতনই) য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে আত্মিক পথের দিশা খুঁজতে। যুদ্ধে আহত হ'য়ে সে দুর্বল ও ঈষৎ পঙ্গু হ'য়ে পড়েছিল। আমাকে আরো বলেছিল যে, সে বেশিদিন বাঁচবে না, বাঁচতে চায়ও না—কিন্তু এখানে থেমে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলি—সে কী ভাবে পণ্ডিচেরিতে এসেছিল যার ফলে তার জীবনে বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছিল—সে দীক্ষা নিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের যোগে। ছবিটা আঁকবার মত।

॥ তেইশ ॥

জে এ চ্যাডউইক আমার কাছে এসেছিল লখনৌ থেকে আমার বন্ধু শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি নিয়ে। ধূর্জটি সে সময়ে ছিল লখনৌয়ের অধ্যাপক। চ্যাডউইকও তাই, কাজেই ধূর্জটির সতীর্থ। ধূর্জটি লিখেছিল তার সম্বন্ধে যে, সে ভারতবর্ষে এসেছে জিজ্ঞাসু হ'য়ে—গীতার জিজ্ঞাসু যে ভগবানকে জানে না কিন্তু জানতে চায় ভগবত্তত্ত্ব, অসামান্য বুদ্ধি···ইত্যাদি।

চ্যাডউইক আমাকে বেশি কিছু খুলে বলে নি, কেবল বলেছিল যে, সে অধ্যাত্ম সত্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হ'য়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—কিন্তু সে সত্যের কোনো দিশা পায় নি। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল—শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনে কয়েকটি বই কিনেছে কিন্তু পড়ে নি, দেশে—ইংলণ্ডে ফিরে পড়বে। আমি চ্যাডউইককে বলি শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম সম্বন্ধে অনেককেই শুধু দিশা নয় পথের পাথেয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পূর্ণযোগ সহজ নয়। চ্যাডউইক বলেছিল—সে জানে হাড়ে হাড়ে যে, কোনো বড় প্রাপ্তির পথই সহজ নয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এমন কোনো পথের নির্দেশ পায় নি যে-পথে পদযাত্রা করা তার পক্ষে সম্ভবপর। কাজেই সে একটু নিরাশ হ'য়েই স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। শুনে আমি দুঃখিত হ'য়ে বলেছিলাম যে ভারতে এসে কোনো ধর্মজিজ্ঞাসু নিরাশ হয়েছে শুনলে আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে, তবে আমি জানি সময় না হ'লে ডাক এলেও শোনা যায় না। "ডাক" বলতে কী বোঝায় জিজ্ঞাসা করাতে তাকে আমি শুধু বলেছিলাম যে, কোনো তীর্থপথে পদযাত্রা করতে যখন মন অত্যন্ত

ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তখনই বলা চলে যে, যাত্রী ডাক শুনেছে সে-অচিন পথের পথিক হবার। ব'লে তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম সে শ্রীমার কথা শুনেছে কি না। সে "না" ব'লে জানতে চাইল তাঁর কথা। উত্তরে আমি তাকে শ্রীমা সম্বন্ধে যা জানি ব'লে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে রাজী আছে কি না। সে পাল্টা প্রশ্ন করল: "কিন্তু তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন? আমি বললাম: "আমি তাঁকে ব'লে দেখতে পারি।" এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি ফলিয়েই* তাই এখানে সেসব কথার পুনরুক্তি করব না—সংক্ষেপেই বলব যা বলার আছে।

চ্যাডউইক চ'লে-গেলে শ্রীমাকে জানাতে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হ'লেন—আশ্রমের লাইব্রেরিতে। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কথালাপ বেশিক্ষণ হয় নি—বড়জোর আধঘণ্টা। কিন্তু চ্যাডউইক মুগ্ধ হ'য়ে পরে আমাকে বলল: "আমি অভিভূত হয়েছি।"

* * *

কয়েকমাস বাদে সে বিলেত থেকে আমাকে লিখল যে, সে যোগার্থী হ'য়ে আসতে চায় পণ্ডিচেরি। শ্রীমা রাজী হ'য়ে তাকে লিখতে বললেন সে আসতে পারে। আমার ফ্লাটে দুটি বড় ঘর ছিল, আমার পাশের ঘরেই সে থাকবে স্থির হ'ল।

ফলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে। সে স্বভাবে কৃষ্ণপ্রেমের মতন মিশুক ছিল না, কিন্তু যেমন নম্র তেমনি স্নেহশীল। আমাকে সে ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করেছিল যখন সে চমৎকার কবি হ'য়ে ফুটে উঠল। তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দিকে দীর্ঘ পত্রালাপ করতেন য়ুরোপীয় দর্শন নিয়ে—পরে ইংরাজী ছন্দের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে। তার কবিতা আমার বিশেষ ভালো লাগত যদিও তার সব কবিতা আমার কাছে সুবোধ্য মনে হ'ত না। তাই সে আমাকে তার নানা কবিতার মর্ম বুঝিয়ে দিত—শেষে আমাকে বলেছিল যে ইংরাজী ছন্দে আমার কৃতিত্বে সে বিশেষ খুশী হয়েছে।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগত যেসব কবিতা সে লিখেছিল শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা ও **Laelia** (লিলিয়া) নাম্নী এক ললিতার সম্বন্ধে। এসব কবিতা তার দেহান্তের পরে বিলেতে ছাপা হয়েছিল ১৯৪০ সালে। শ্রীঅরবিন্দ তার লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কবিতাগুলির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। আমিও বরাবর পড়তাম বিশেষ ক'রে তার পদলালিত্য তথা ছন্দোমাধুর্যের জন্যে। তার অন্য নানা কবিতাকেও শ্রীঅরবিন্দ **exquisite, exceedingly beautiful, very original**···ইত্যাদি বিশেষণের

---

*SRI AUROBINDO CAME TO ME প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

শিরোপা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-সব কবিতা উদ্ধৃত করা এ-তর্পণে অবান্তর হবে ব'লে শুধু তিনটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব :

RED LOTUS

(SRI AUROBINDO'S CONSCIOUSNESS)

O puissant heart amidst whose raptured shrining
A nameless love is garbed in Name's disguise !
হে মহিমময় প্রাণ—যার মহানন্দের মন্দিরে
উচ্ছলে নামের ছদ্মবেশে এক নামাতীত প্রেম !
That living Lotus petal by petal unfolding,
which through the mists of this *avidya* looms.
সে-প্রাণ-উচ্ছল পদ্ম পর পর মেলে দল যার,
অবিদ্যামেঘের মর্মে অস্ফুট রূপশ্রী তার ভায়।

TO MOTHER

Come on the wings of sleep
Grave or with a smile,
come ere the hushed tide neap
or tangling thoughts beguile.
তন্দ্রার পাখায় এসো রমা,
নিথরা বা মৃদুহাসিবরে,
যবে মৌন আনন্দলহরী
অশান্ত চিন্তারা ভ্রান্ত করে।
Out from a planet's gloom
All aspects call to thee, —
Life is our stirless tomb
Light on our darkened sea.
ধরার আঁধার দীর্ণ করি'
প্রতি ভাব ডাকে মা তোমায় :
ভূগর্ভে—নিস্পন্দ প্রাণ মৃত,
আলোক—সিন্ধুর তমসায়।

শ্রীঅরবিন্দ শতমুখে প্রশংসা করতেন চ্যাডউইকের এক স্বপ্নপ্রতিমা লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কয়েকটি অপরূপ কবিতা যাকে ইংরাজীতে বলে **dream come true**: তাই অবান্তর মনে হ'লেও এ-কবিতাগুচ্ছকে যোগের দিক থেকে ঠিক বাহ্য বলা চলে না, যেহেতু এসব প্রেমের কবিতাকে বলা চলে আত্মিক (psychic) প্রেরণায় লেখা। আমি নিচে মাত্র তার একটি কবিতার শেষ স্তবকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি: *

> Your name is fading music upon my worship's mouth ;
> It spills in languorous fragrance from lilies of the south ;
> It is the odorous night-flower wherewith your locks are
> bound,—
> Or the moon-pale soul of roses caught in a mesh of sound.

> লীয়মান মূর্ছনার মতন নামটি তোমার কাঁপে পূজার অধরে আমার ;
> দক্ষিণে যে-লিলি ফোটে তার মন্থর সুবাস ঝরে উচ্ছলসম্ভার ,
> জড়িয়ে আছে সেই রজনীগন্ধার সুগন্ধ তোমার কান্ত কুন্তলে ;
> কিম্বা গোলাপের পাণ্ডুর হিয়ার স্পন্দন, যে ধরা দেয় ঝঙ্কার [illegible]।

চ্যাডউইকের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করতাম নানা ইংরাজ কবির কাব্য ও ছন্দ নিয়ে। ছন্দে সে আনন্দনীয় হ'য়ে উঠেছিল শ্রীঅরবিন্দেরই দেশনায়—বিশেষ ক'রে ইংরাজ কোয়ান্টিটেটিভ ছন্দে। এ-ছন্দের নানা মধুর মিড (euphony) তার সূক্ষ্ম শ্রুতির কাছে ধরা দিত যার সঙ্গে তার কাব্য এত প্রাণস্পর্শী তথা সুকুমার হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কাব্যের গুণগানে এখানে সমাপ্তি টেনে ফিরে আসি স্মৃতিচারণে—কী ভাবে সে পুরোদস্তুর ইংরাজ হ'য়েও হিন্দু যোগের রসজ্ঞ হ'য়ে উঠেছিল।

তাকে তার আত্মীয় স্বজন ক্রমাগত ডাকত বিলেত থেকে। কিন্তু সে প্রায়ই বলত: "My die is cast, Dilip, I can't look back any more, for I don't find life in Europe worth while." [আমার নিয়তি ফিরে চাইতে মানা করে আমাকে—পাশ্চাত্য জীবন আমার কাছে মনে হয় না বরেণ্য]। তাকে পরম দিশা দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম বাণী—সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত তার একটি চিঠি:

---

*চ্যাডউইককে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছিলেন "আর্জব"। এই নামে তার ৩২৯টি কবিতা POEMS নামে লণ্ডনে ছাপা হয়েছিল ১৯৫০ সালে—John M. Watkins 21 Cecil Court London W. C. 2: দার্শনিক বুদ্ধিবাদী মনীষীর যোগী ও কবিরূপে নবজন্ম হয়েছিল ব'লেই তার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

'Arjava

It is especially difficult for the Christian to be of a piece, because the teachings of Christ are on quite another plane from the consciousness of the intellectual and vital man trained by the education and society of Europe—the latter, even as a minister or priest, has never been called upon to practise what he preached in entire earnest. But it is difficult for human nature anywhere to think, feel and act from one centre of true faith, belief or vision. The average Hindu considers the spiritual life the highest, reveres the *sannyasi*, is moved by the *bhakta* ; but if one of the family circle leaves the world for spiritual life, what tears, remonstrances, lamentations! It is almost worse than if he had died a natural death. It is not conscious mental insincerity—they will argue like Pundits and quote *shastra* to prove you in the wrong ; it is unconsciousness, a vital insincerity which they are not aware of and which uses the reasoning mind as an accomplice.

"That is why we insist so much on sincerity in the Yoga—and that means to have all the being consciously turned towards the one Truth—the one Divine. But that is, for human nature one of the most difficult of tasks, much more difficult than a rigid asceticism or a fervent piety. Religion itself does not give this complete harmonised sincerity—it is only the psychic being and the one-souled spiritual aspiration that can give it."

আর্জব প্রায়ই বলত গুরুদেব কী চমৎকার লেখেন—কী গভীর, ঋজু প্রাঞ্জল—কোথাও কি অস্পষ্টতার লেশও আছে? বলত: "তিনি শুধুই আলো ঝরান তাপকে পাশ কাটিয়ে—ঠিক যেমন তাঁর আশ্চর্য ঋষিনেত্র!"

কিন্তু তবু ওর মুখে প্রায়ই বিষাদের ছায়া দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিত, বলত: "বিষাদ নয় দিলীপ, তবে জগতের যে-রূপশ্রী চোখে পড়ে দিনের পর দিন—আনন্দকে ঠাঁই দিই কোন্ কল্পনার আরামবাগে বলো তো?" ব'লে

দেখিয়েছিল তুটি কবিতা (POEMS. 285-6)—শেষেরটির নাম "শ্বেত বিহঙ্গ"। মিস্টিক কবিতা—শেষের স্তবকে ছিল:

O running of Light in the silence,
O silvery morning star,
May the Dawn be the wordless answer
Of a beauty no loss can mar.

[নিথরের বুকে তুমি কে আলো উধাও!
রূপালি প্রভাতী শুকতারার ঝঙ্কার!
উষা যেন হয় তব অপরূপ শ্রীর
অনির্বচনীয় সাড়া, নাই ক্ষয় যার।)

আর্জবের POEMS-এর প্রাক্‌কথনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড় সুন্দর ভাষা দিয়েছেন তার দৃষ্টিভঙ্গির তথা প্রকাশ সুষমার। তার শেষ তুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত ক'রেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি:

"The mere literary critic will admire the delicate dream-like beauty of these poems, but, unless his insight is more than merely literary, he will go no deeper, for they deal with the mysteries of the inner life and only he who can read their symbols will be able to penetrate to their heart. For Arjava, as shown in the poem entitled *Correspondences*, Nature was a shrine in which each form seen in the flickering firelight of the senses was a shadow of realities that lay within, shining in the magical light of the secret Moon which was the Master-Light of all his seeing, the central image of so many of his poems.

In the midst of our personal sadness at his early departure let us remember that this Path is one which leads through many worlds and that, as Sri Krishna said, *nehabhikrama nashosti*, for him who treads it there can be no loss of effort."

অর্থাৎ, যাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্যের সমালোচক তাঁরা এ-স্বপ্নালু কবিতাগুচ্ছের পেলব সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারেন, কিন্তু যদি সাহিত্যের চেয়ে আরো গভীরের ডুবারি হ'তে না পারেন তাহ'লে ঐ পর্যন্তই হবে তাঁদের বোধের পরিধি—কেন না এ-কবিতাগুলির উপজীব্য—মানুষের আন্তরজীবন, তাই যাঁরা প্রতীকের তাৎপর্যের

অনুধ্যান করতে সক্ষম কেবল তাঁরাই শুনতে পাবেন এ-সব ভাবের অন্তর্গূঢ় বাণী। আর্জব প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মন্দিররূপে—যে মন্দিরে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চল আলোয় দেখা প্রতি রূপায়নকেই দেখেছিলেন তিনি এক আন্তর সত্তার প্রতিবিম্বরূপে। তাই তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন যে, প্রতি রূপই এক নিহিত চন্দ্রের প্রভায় দীপ্ত। এই অলোক চন্দ্রই ছিল তাঁর অন্তর্দর্শনের পরা প্রভা, তাঁর নানা কবিতারই কেন্দ্রীয় প্রতিভাস।

তাঁর অকালমরণের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত বিষাদকে কাটিয়ে উঠতে হ'লে আমাদের মনে রাখা চাই যে, এ-জীবন বহু জগতের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে এসেছে, মনে রাখা চাই কৃষ্ণের অভয়বাণী যে, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি—এ-পথের পথিকের কোনো প্রচেষ্টাই বিফল হ'তে পারে না। (৬ই জুলাই ১৯৩৯)

।। চব্বিশ ।।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত একটানা পণ্ডিচেরি থেকে মনে হ'ল—আত্মীয় স্বজনের ডাকে একবার কিছুদিনের জন্যে সাড়া দিলে মন্দ কি? এ-আটবৎসরে শতাধিক বাংলা গান বেঁধেছিলাম সেগুলি কেবল আশ্রমের সীমিত চক্রের মধ্যে গেয়ে মন তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাই আরো চাইলাম সাড়া দিতে বাইরের বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে। এ-সাড়া চাওয়া মানে যে প্রশংসা চাওয়া তা জানতাম, কিন্তু এ-আট-বৎসরে আমার মধ্যে অনেক মতিগতির রূপান্তর হ'লেও আমার কবি-সুরকার-সাহিত্যিক অভিমান বেশ সজাগ ছিল—আরো এই জন্যে যে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অনামী" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতা সমেত। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন লিখে যে, প্রায় প্রতি শিল্পীর মধ্যেই ঘুপটি মেরে ব'সে থাকে এক গণনেতা যে চায় যশ, মান, করতালি, মালাতিলক। যে যোগী হ'তে চায় তার এসব চাওয়া চলবে না—কেন না তাকে চাইতে হবে শুধু ভগবানের সেবক হ'তে, মানুষ বা শিল্পের বাহন হ'তে চাওয়া তার পক্ষে হবে পরধর্ম। ("Every artist—there are rare exceptions—has got something of the public man in him, in his vital physical parts, which makes him crave for the stimulus of an audience, social applause, satisfied vanity, fame etcetera. All that must go absolutely if he wants to be a yogi and his art a service not of

man or his own ego but of the Divine.")* কিন্তু আমি নিজেকে বোঝালাম যে, আমি যখন স্বধর্মে-আস্থিত যোগী (শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে উপাধি দিয়েছিলেন "born yogi"), যখন আমি কেবল ভাগবতী গীতিই গাই, কবিতা ও গল্পেও শুধু ভাগবতী কথাই বলি তখন এত ভয় করবার কী আছে—বিশেষ যখন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন আমার রক্ষাকবচ? "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার"—ভোলা মন! চল্‌ তুই কপাল ঠুকে, গান গেয়ে যা অনুক্ষণ।

মনে মনে জানতাম অবশ্য যে, যোগপন্থী হ'য়ে ফের সামাজিক মেলামেশা গান বাজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে শেষটায় হয়ত দেখব—নীলমোহানায় না পৌঁছে অজান্তে এসে পড়েছি কোনো শূন্য হাটের আঘাটায়—কে বলতে পারে? মনের জোর? হায় রে, আমি কি স্বামী বিবেকানন্দ না রামতীর্থ? তবে এক ভরসা—ভুল ভ্রান্তি অনেক করলেও ভাবের ঘরে চুরি করেছি খুব কম আর যখনি করেছি এমন মনঃকষ্ট পেয়েছি যে, সে-সাজা ভুলিনি কোনোদিনই।

এই রকম রকম রকম ক'রে শেষটা কুহুধ্বনি ক'রে উঠলাম :

> যে পেয়েছে গুরু তোমার আশিস প্রীতি,
> প্রবাসেও সে তো রবে না একেলা আর :
> যেথা যাবে পাবে তোমাকেই প্রাণে নিতি
> রেস্করায়ও শুনি' প্রেমের বাঁশি তোমার।

মনকে আশ্বাস দিলাম, "ভোলা মন, ইংরাজি বাংলায় মিলিয়ে তুই তিন চার শো কবিতা লিখেছিস—[illegible] গেয়েছিস আনন্দের রাগমালা—তবু ইতস্তত—যাবো কি যাবো না—[illegible] করলে কী গতি হবে এত সব দুশ্চিন্তা? 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' বলেন নি কি ঠাকুর গীতায়?'

বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দও আশ্বাস দিলেন : মা ভৈঃ। ফল—সোজা কলিকাতা-প্রয়াণ—পিতৃতুল্য মেজমামা মহানন্দে ট্রেণভাড়া পাঠালেন।

॥ পঁচিশ ॥

কলকাতায় এসেই প'ড়ে গেলাম গানের আবর্তে। এখানে গান, ওখানে গান, সেখানে গান, রেডিও গ্রামোফোন সভাসমিতি—ভাগ্যক্রমে সে সময়ে টেলিভিশন আসেনি এদেশে তাই রগ ঘেঁষে বেঁচে গেছি—এ-হসনীয় পুতুলনাচে নাচতে হয় নি সেজে গুজে।

* শ্রীঅরবিন্দের এ-চিঠিটি অনামী-তে প্রকাশিত হয়েছিল—প্রথম সংস্করণে।

কিন্তু সত্যিই ভালো লাগত সেই সব আসরে গান গাইতে যেখানে শ্রোতারা শুধু গান শুনতে চান না, গানের মাধ্যমে তাঁর কথা শুনতে চান যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন "গানের ওপারে।" এই সব আসরে প্রায়ই গাইতাম "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম"— আর বিপুল সাড়া পেতাম উদ্বেল হৃদয়ের, চোখের জলের, ভক্তির উচ্ছ্বাসের। তখন মনে মনে প্রণাম করতাম গুরুদেবকে—আর মন কেমন করত। তবু এমনিই মানুষের মন যে, গুরুদেব সুদূর হ'লেও নানা শ্রোতা ও শ্রোত্রীর সাড়ায় আনন্দ পেতাম বৈ কি। সাধে কি গুরুদেব সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—জনগণমনের করতালি চেও না, গেয়ে চলো, কিন্তু ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে—জনতার চিত্তরঞ্জন করতে, মঞ্চে উঠে মালা তিলকের পুরস্কার পেতে নয়। মন মাঝে মাঝে ধম্‌কাত— কারণ আমি গুরুদেবের তিরস্কার অনেক সময়েই ভুলে যেতাম, সব বুঝেও অবুঝের মতন সেই সব ছোট সুখ আত্মপ্রসাদ উচ্ছ্বাসে মনকে রাঙিয়ে তুলতাম যাদের রঙ ধোপে টেঁকে না। দেখতাম নিজের মধ্যে দুটি রূপ পাশাপাশি ঘরকন্না করছে। এ বলছে: "এ সবই মায়ার খেলা", ও বলছে: "কতকটা বটে, কিন্তু জীবন তো শুধু নির্মায়িক বিজনতার পীঠ নয়, নানা অশ্রুহাসি আলোছায়া হারজিৎ উদয়-অস্তের রঙ্গমঞ্চও বটে। আমরা চাই দুঃখকে পাশ কাটিয়ে একটানা সুখের কারবার, চাই বিরহের আঁধারকে দাবিয়ে মিলনের দেয়ালি, চাই ছায়াহীন আলো, কাঁটাহীন গোলাপ, বন্ধনহীন মুক্তি। জীবনে সবই চলচঞ্চল, তাই চাই এমন আনন্দধাম যেখানে চপলা অচলা, প্রেম নিষ্কাম, স্বপ্নও জাগরণের মরুতে ফুলবাগান বসায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে—আমি লিখতে বসেছি এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ, তাঁর কাছে কী পেয়েছি তার খবর দিতে—দুঃখসুখের দ্বৈতলীলার ব্যাখ্যা ক'রে দার্শনিক উপাধি পেতে নয়। আমি জিজ্ঞাসু তীর্থযাত্রী মাত্র, কেবল সদ্‌গুরুর কৃপায় দিশা পেয়েছি মায়াকুঞ্জবাসী সোনার হরিণের পারে এক দিশারি পরশমণির যাঁর ছোঁওয়ায় বিফলতার পতিত জমিতেও সোনা ফলে।

এ-ফল ফলল বহুভাগ্যে: দেখা পেলাম একটি কন্যাশিষ্যার—উমা বসু, ডাক নাম হাসি। তার কথা আমি ফলিয়েই লিখেছি আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাসে —যদিও দিনের পর দিন তার কাছে যা পেয়েছি তার সূচীপত্রও দিতে পারি নি। কলকাতার নানা জটলার হামলা থেকে সে-ই আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। প্রথমে তাকে গান শেখাতে যেতাম সকালে—সপ্তাহে দুবার কি তিনবার। তারপর চার পাঁচ বার—শেষে রোজ সকালে বিকালে। তার মুখে আমার নানা সুর ও গান শুনে সে যে কী আনন্দ পেতাম—সত্যিই মনে হ'ত—এ ঠাকুরের করুণা! কোনো শিষ্য বা শিষ্যার গান শুনে আমি জীবনে এত আনন্দ পাই নি। তার কিন্নরী কণ্ঠের

নানা ভাব বিভাব, দোলা মিড়—সর্বোপরি হৃদয়াবেগের স্পন্দন আমাকে সত্যি অভিভূত করত। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে বহুবৎসর অজ্ঞাতবাস করার ফলে লোকে আমাকে সুরকার শিরোপা দেয় নি। এজন্যে আমার মনে খেদ ছিল বহুদিন—যদিও এখন মুক্তি পেয়েছি সব খেদ ক্ষোভ অনুযোগ থেকে। তবু থেকে থেকে এখনো একটা কথা মনে হয়—হাসি যদি আজ থাকত তবে তার মুখে আমার গান শুনে লোকে মানতই মানত যে, দিলীপকুমার শুধু কবি ও গায়ক নন, অনন্যতন্ত্র সুরকারও বটে। দুঃখের বিষয়, যুগের সঙ্গে রুচি বদলেছে—এ-যুগের উপাস্য সিনেমার তারকা, আরাধ্য সিনেমার গান, লক্ষ্য সিনেমার যশ। তাই উমাব গানের লংপ্লেয়িং রেকর্ড আজও বেরুলো না।

কিন্তু না, এ-ও প্রত্যাশা। অতুলপ্রসাদের একটি বাউল গান আমার বড প্রিয় :

মিছে তুই ভাবিস মন!

তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।

আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রু বহে

হয়তো তাহার পাবি দেখা গানটি হ'লে সমাপন।

কবি বা সুরকার ব'লে জয়টীকা পাওয়া এই-ই তো শেষ কথা নয়, শেষ কথা হ'ল —গানের গোমুখী যিনি তাঁকে তাঁর গানের গঙ্গাধারা নিবেদন ক'রে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজায় কৃতকৃত্য হওয়া। হাসির মুখে তব চিরচরণে দাও শরণাগতি, রূপে বর্ণে ছন্দে বা শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ মিনতি বা অমর কবি নিশিকান্তের আঁধারের এই ধরণী আলোর লীলায় তুলব ভরি, * আরো বহু গান শুনতাম আর আমার কানে কেমন যেন জনতার হিল্লোল কল্লোল থেমে যেত—বাজত শুধু তার আত্মকথন : "আমি আলোছায়া আঁকা পাখী"।

গুরুদেবকে তার কথা লিখতে তিনি তাকে আশীবাদ পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তার একুশবৎসর বয়সে দেহান্ত হবার পরে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ পত্র ১৯৪২ সালে : "উমার বিকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়েছিল তার সাত্ত্বিক প্রকৃতির পূর্ণপ্রভাব। · তার প্রতিভার পূর্ণিমা প্রকাশের পথে হঠাৎ মেঘ ছেয়ে এল—এ-ট্রাজেডিকে শোকাবহ বলা যেতে পারত যদি আমাদের জীবনলীলার শেষ অঙ্ক হ'ত ইহলোকের জন্মসিদ্ধি। সে প্রস্থান করেছে আত্মিক শান্তিনিদ্রায় বিশ্রাম করতে— এ-বিশ্রামের মধ্যে দিয়েই সে গ'ডে উঠবে পরবর্তী জীবনলীলার জন্যে।'†

* উমার অকাল মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তার মুখে আমার শেখানো এই গানগুলি শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে চিঠি লেখেন—সে পত্রটি আমার "তীর্থঙ্করে" ছাপা হয়েছে॥ তীর্থঙ্কর নবসংস্করণ সম্ভবত আগামী বৎসর আত্মপ্রকাশ করবে।

† পরিশিষ্টে শ্রীঅরবিন্দের এ দীর্ঘ চিঠিটি বিন্যস্ত হ'ল।

সে ছিল সত্যিই অনন্যা—নানাদিকেই। স্নেহেও যেমন কোমল, প্রতিভায়ও তেমনি উজ্জ্বল, সরলতায়ও যেমন সুন্দর, পবিত্রতায়ও তেমনি অপরূপা। ইষ্ট ও গুরুর করুণার একটি বিশিষ্ট অবদান ব'লেই আমি তাকে বরণ করেছিলাম—যেমন পিতা করে তার আদরিণী দুলালীকে। কিন্তু তবু চিরবিচ্ছেদ আনন্দ নয়—বেদনারই প্রসূতি। কেবল সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলাম যে এ-বেদনাও আমার দুরভিসারের সহায় হয়েছিল মহাগুরুর অপার স্নেহাশিসের আলোয়।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৯২০ সালে কাশীতে প্রবাসী বাঙালীরা প্রথম সভা করেন—সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমি সে-আসরে পিতৃদেবের হাসির গান, স্বদেশী গান ও (অবাঙালী শ্রোতাদের জন্যে) মীরাভজন গেয়েছিলাম—"প্রভু মোহে চাকর রাখো জী"। এ-গানটির শৈলী আমার স্বকীয়—বহু শ্রোতাই আনন্দ পেয়েছেন, এখনো পান। ১৯২৪-এ পুনায় সেস্থন হাসপাতালেও আমি মহাত্মাজিকে এ-গানটি শোনাই যে-বিবরণ আমার তীর্থঙ্কর ও এ্যামং দি গ্রেট-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কলকাতায়ও এ-গানটি আমার অনেক বাঙালী বন্ধু ভালোবাসতেন, তাই গাইতাম মাঝে মাঝে। দানবীর শ্রীযুগলকিশোর বির্লা আমার মুখে কাশীতে এ-গানটি শুনে খুশী হয়েছিলেন। আমি কোথাও উমাকে নিয়ে এ-গানটি গেয়েছিলাম। তারপরে শ্রীযুগলকিশোর তাঁর সেক্রেটারিকে পাঠান আমার কাছে। আমি স্টোর রোডে বির্লা হৌসে যেতেই তিনি এ-গানটি শুনতে চাইলেন। গাইলাম। পরে তুলসীদাসের ভজনও গাইলাম সানন্দে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন: "যত পারো গেয়ো কেবল পার্টি নিমন্ত্রণ হররা এসব বর্জন কোরো। তোমার গানে লোকের মনে ভক্তি জাগে…"ইত্যাদি। ("If you sing of the Divine, what more splendid means can there be of spreading devotion in the hearts of others,—that too is a work of the Divine.")

শ্রীযুগলকিশোরকে একথা বললাম যখন তিনি আমার জন্যে একটা ভোজ দিতে চাইলেন। তিনি শুনে খুশীই হ'লেন মনে হ'ল। কিন্তু তারপরই বললেন তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমি আমেরিকা গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করি। আমি হেসে তাঁকে বললাম: "মাফ করবেন—আমার পিতৃদেবের একটি গান মনে করিয়ে দিলেন আপনি:

নতুন কিছু করো এ্যকটা নতুন কিছু করো।...
কিম্বা সবাই ওঠো, টাউনহলে জোটো,
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো।

শ্রীযুগলকিশোর একগাল হেসে বললেন: "কিন্তু আপনি প্রচার করবেন গান গেয়ে—আমার মনে হয় এসব গানে..." ইত্যাদি তারিফ।

আমি বললাম: "সে হয় না জী। আমি আজ গুরুদাস। তাই তিনি আদেশ না দিলে কোথাও যেতে পারি না।"

শ্রীযুগলকিশোর বললেন: "আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে জানাবেন। বলবেন তাঁকে যে, আপনাকে আমি আমেরিকায় পাঠাতে চাই—গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করতে।"

আমি বললাম: "মিথ্যে আপনাকে ভরসা দিয়ে কী হবে জী? গুরুদেব কখনোই এ-ধরণের প্রচারে মত দেবেন না। তিনি চান সব আগে আমরা ভগবানকে লাভ ক'রে তাঁর বাহন হই।"

শ্রীযুগলকিশোর বললেন: "কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ—"

আমি বললাম: "কোথায় বিবেকানন্দ আর কোথায় আমি। তাছাড়া তিনি তাঁর মহাগুরুর আদেশ পেয়েছিলেন লোক শিক্ষা দেবার। আমি সবে যোগের পথে পা দিয়েছি।"

শ্রীযুগলকিশোর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "আমি শুনেছি আপনি আজ নিঃস্ব। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি কি?"

আমি বললাম: "আমি নিঃস্ব কে বলল? আমার যা কিছু দরকার গুরুদেবের কাছে সবই পাই।"

"কিন্তু কিছু মনে করবেন না কাপড় চোপড় বা ট্রেনভাড়া বাবদ—"

"না জী। বহু ধন্যবাদ। ট্রেনভাড়া আমার বন্ধুরা দেন। কাপড় চোপড়—গুরুদেব।"

শ্রীযুগলকিশোর (একটু চুপ ক'রে থেকে): যদি আপনাদের আশ্রমের জন্যে কিছু পাঠাই?

আমি (সানন্দে): খুব ভালো কথা—নিশ্চয়ই তাঁর চরণে নিবেদন করব আপনার গুণগান ক'রে।

শ্রীযুগলকিশোর (হেসে): গুণগানের জন্যে কথা নয়। কেবল আমার দুঃখ এই যে, আপনি আমেরিকায় যেতে নারাজ। তবে আপনার কথা ঠিক। গুরুবরণ যখন করেছেন তখন তাঁর মতে না চললে চলবে কেন?

ফিরে এসে উমাকে বললাম। সে কিন্তু হায় হায় ক'রে উঠল। বলল: "আহা! তুমি আমেরিকায় গিয়ে সবাইকে গান শোনালে…" ইত্যাদি।

আমি: হাসি! আমি যেখানে গিয়েছি সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই…ইত্যাদি।

উমা: কিন্তু কেন তিনি দেখা দেন না মন্টুদা—যখন তোমাকে এত ভালবাসেন …ইত্যাদি।

আমি: তাঁকে গুরু করলে বুঝতে…ইত্যাদি।

উমা: রক্ষে কর মন্টুদা! পর্দানসীন গুরু আমার সইবে না। আমি চাই তোমার মতন গুরু—যে জ্ঞানের ধ্যানের কথা বলতেও জানে, হাসতেও জানে, ভালোবাসতেও জানে, আর ডাক দিলে সাড়া দিতেও জানে। না, তিনি আমার মাথায় থাকুন—কেবল তুমি থেকো আমার পাশে…ইত্যাদি।

কথাগুলি একটু রঙচঙ দিয়ে বললাম—তবে প্রায়ই এই ধরণের কথা হ'ত আমাদের মধ্যে—সহজ, বেপরোয়া, নির্ভাবনা ·

বলতে বলতে বিরলাজীর সেক্রেটারি এসে তিন হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। উমা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, বলল: "নাচতে জানলে নাচতাম মন্টুদা"।

* * * *

এই থেকেই সুরু হ'ল আমার জীবনের এক নতুন পদক্ষেপ। গুরুদেবকে টাকাটা পাঠাতে তিনি আশীর্বাদ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করলাম—আমার প্রাক্-যৌগিক জীবনে আমি যেমন চ্যারিটি কন্সার্ট করতাম এর ওর তার জন্যে, এখন থেকে চেষ্টা করব আশ্রমের জন্যেও গান গেয়ে কিছু টাকা তুলতে।

কিন্তু সেবার প্রাইভেট আসরে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে কিছু চাঁদা তুললেও পাবলিক আসরে গাই নি। তবে উমার দেহান্তের পরে বম্বে ও আমেদাবাদে গিয়ে গান গেয়ে প্রথম দশ হাজার টাকা নিবেদন করি গুরুচরণে কিন্তু সে পরের কথা। উমার অধ্যায়টি শেষ করি—কেন যে এমন ফুলের মতন মেয়েকে এত দুঃখ পেতে হ'ল··

এসব কথা বলেছি আমার "ভূস্বর্গ-চঞ্চল" গ্রন্থে তথা আমার "ছায়ার আলো" রমন্যাসে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যার মৃত্যুশয্যার ঘোর দুর্লগ্নে আমাকে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন তার কথা কিছু অন্তত না বললেই নয়।

* * *

১৯৩৭ সালে দুমাস থাকব ব'লে মার্চ মাসে কলকাতায় গিয়ে উমার টানে পাঁচ মাস কাটিয়ে ফিরলাম আশ্রমে ১৫ই অগস্টের দুদিন আগে। গুরুদেবকে কলকাতা থেকে

সব কথাই লিখতাম, তিনি আশীর্বাদও পাঠাতেন, তবে সংক্ষেপে। মাঝে মাঝে মনে আশঙ্কা যে আসত না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে প্রার্থনা করতাম —যখনই মনে হ'ত পরমহংসদেবের কথা: "সাধু, সাবধান!" কিন্তু তারপরেই মনে হ'ত—"পালিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাওয়া বিড়ম্বনা। অমর কবি নিশিকান্ত অকারণ লেখেন নি:

পালাবি কোনখানে তুই? বাঁধনের জাল যে পাতা!
তারে না কাটিস যদি, বৃথা তোর সাধন সাধা!

জীবনের পরীক্ষা হাজার কঠিন হ'লেও পাশ করতেই হবে—যদি পথচলায় দুচারবার হোঁচট খেতে হয় তাহ'লেও।" উমার ক্ষেত্রে আমার একটা মস্ত বাঁচোয়া ছিল এই যে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পরে আমার প্রথম মনে হ'য়েছিল—আমি তার পিতা, সে আমার মেয়ে। তাই আমাদের উভয়েরই মন নির্মল ছিল, কারণ সেও আমাকে দিত সেই ভক্তি যা কন্যা দেয় তার পিতাকে, আমিও তাকে বরণ করেছিলাম পিতৃ-স্নেহেই বলব।

কিন্তু আসক্তির তো একটিমাত্র ধারা নয়: পিতাও অত্যধিক কন্যামুখী হ'লে যে পুরোপুরি ভগবৎমুখী হ'তে পারে না এ-সনাতন সত্যটিও আমার জানতে বাকি ছিল না, তাই থেকে থেকে প্রার্থনা জানাতাম: "গুরুদেব, এমন যদি হয় তুমি আমাকে ছাড়িয়ে নিও যেমন নিয়েছ আমার অন্য স্নেহাস্পদদের কাছ থেকে।" কিন্তু প্রার্থনা করলেও আমি চাইতাম না এ-স্নেহ থেকে মুক্তি পেতে বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, হাসি সব আগে ছিল আমার শিষ্যা। কে না জানে—শিষ্যও যেমন গুরুকে চায় গুরুও তেমনি চান শিষ্যকে। আর এ-চাওয়া বড় মধুর দুদিক থেকেই, কেন না এ-সম্বন্ধের মূলে আছে একটি বিচিত্র উপলব্ধি, যার প্রথম পাদ হ'ল—নিজের সৃষ্টিকে শিষ্যের বিকাশের মধ্যে নতুন ক'রে দেখা, দ্বিতীয় পাদ—নিজেকে তার মধ্যে দেখা। এ আমার কথার কথা নয়, আমি তাকে যে-সব গান শেখাতাম তার কলকণ্ঠে সে-সব গানের প্রতি মিড় মূর্ছনা ভাব ভক্তির উচ্ছলনের আয়নায় প্রত্যক্ষ দেখতে পেতাম—আমি যেন জন্ম নিয়েছি তার মধ্যে। তাকে ভালোবেসে আমি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আত্মজা কাকে বলে। তাই আমি আরো বুঝতে পেরেছিলাম—কেন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে "a friend and a son" ব'লে সনাক্ত করেছিলেন। একথা বলার উদ্দেশ্য নয় যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিরূপের প্রতিচ্ছবি, আমি বলতে চাই শ্রীঅরবিন্দ আমার মধ্যে কিছুটা দেখতে পেয়েছিলেন—শিষ্যের আধারে আত্মসৃষ্টির প্রতিফলন।

কিন্তু এ-সুন্দর মহনীয় সত্যকে আমি জানার মতন জেনেছিলাম শুধু শ্রীঅরবিন্দকে

ভালোবেসে নয়, উমাকে (ও পরে ইন্দিরাকে) ভালোবেসেও বটে। বলতে কি, সময়ে সময়ে আমার এমনও মনে হ'ত যে সে কতকটা ভাষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের বাণীর : যে, দীক্ষাপ্রার্থী দীক্ষাদাতার সত্তার সরিক হয় নিজের গ্রহিষ্ণুতার (receptivity) অনুপাতেই। এ-পরম আনন্দময় সত্যটি আমি আরো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যখন ইন্দিরা আমার শিষ্যা হ'য়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেয়। কিন্তু তার কথা যথাস্থানে—আগে উমার সম্বন্ধে বলি যা বলতে চাই—বিশেষ ক'রে তার সঙ্গে আমার আত্মিক আদানপ্রদানের কথা। এ কথার অর্থ—তার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও ছিল—মেলামেশার হাসি খুশির দেওয়া-চাওয়ার—কিন্তু এ-সব সম্বন্ধেরই শিরোনামা ছিল—গুরুশিষ্যার সম্বন্ধ, আমি তাই তাকে টানতে চাইতাম ধর্মের দিকে, সে কিছুটা ঝুঁকেও ছিল। কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝবে?—সে ১৯৩৮ সালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে আসা সত্ত্বেও তাঁর দর্শন পেল না—হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে তাঁর উরুভঙ্গ হওয়ার দরুণ। শ্রীঅরবিন্দকে সে গুরুবরণ করতে আসে নি, এসেছিল আমার গুরুভক্তির ছোঁয়াচে তার মনেও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি জেগেছিল ব'লে।

তার পরেই ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যার ফলে তার মন বেঁকে বসল। এ-দুর্দৈবের কাহিনী আমি আমার "ভূস্বর্গচঞ্চলে" ফলিয়েই লিখেছি। তাই এখানে সংক্ষেপে বলব যদিও যা ঘটেছিল দুকথায় তার ভাষ্য করা সুকঠিন।

হ'ল কি, আমরা আসামে শ্রীহট্ট থেকে সিলচর যাচ্ছিলাম সদলবলে। সিলচরে আমার ও উমার নিমন্ত্রণ ছিল এক সঙ্গীত সভায়। আমি সভাপতি। যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করেছিলেন উমার স্নেহময় উদার পিতা ধরণীধর বসু। এক মস্ত বাস নেওয়া হ'ল—যাত্রী আমরা তেরো জন—উমা, ধরণীদা, উমার মা, মাসিমা, দুই মামা, বোন, ভাই, পাহাড়ী সান্যাল, ও তজ্জায়া মীরা, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আমার এক আত্মীয় লাটু ও আমি।

বর্ষাকাল। সারথি অপটু। মাঝপথে বাস উল্টে গিয়ে পড়ল এক জলভরা খাতে। আমরা সকলেই কম বেশি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু ধরণীদার বুকের অনেকগুলি পাঁজর ভেঙে গেল। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু।

এখানে সংক্ষেপে আমার একটি আশ্চর্য উপলব্ধির কথা বলি—যার বিবৃতি দিয়েছি আমার ভূস্বর্গ চঞ্চলে। কেবল আগে ব'লে রাখি—আমি বাস্-এ সারথির পাশে ব'সে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করছিলাম আর দেখছিলাম—সামনের স্পিডোমিটারে—বাস ছুটেছে ঘণ্টায় ৪০-৪৫ মাইল। পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন এই জপের ফলেই আমি রক্ষা পেয়েছিলাম। যাক, এবার উদ্ধৃতির পালা সুরু করি। দুর্ঘটনাটি ঘটে ৩রা জুলাই ১৯৩৯ সালে :

"বাস্ চলল হু হুশ্ শব্দে—সুর্মা নদীর পাশ দিয়ে। বর্ষাকালের উচ্ছল জলদল কলরব'।·· হঠাৎ একটা বেঁক···বাস টলল—ঐ ঐ ঐ ঐ—টাল সামলাতে না পেরে পড়ল একটা ডোবায় বাঁ কাতে। আমি ঘোর বেগে ছিটকে পড়লাম আমার বাঁ কাঁধের উপর।···বুকে চোট লাগল, রগেও এক জায়গায় খুব কেটে গেল—আঘাত সাংঘাতিক না হলেও রক্তে মুখ ভেসে গেছে···

"কিন্তু সব ভুলে গেলাম মেয়েদের কান্না শুনে। ঝটিতি উঠে পিছল কাদায় ডোবায় নামবার চেষ্টা করছি আগে ছোটদের উঠাতে—কিন্তু এত কাদা পা দাঁড়ায় না। যাহোক আমাকে ডোবায় নামতে হ'ল না—দেখতে দেখতে প্রায় দশ পনেরো জন গ্রামবাসী লাফিয়ে পড়ল জলের মধ্যে, একে একে টেনে তুলল সবাইকে।···

"সবাই মিলে ধরণীদাকে তুললাম কাছের একটা ডিস্পেন্সারিতে—পাড়াগেঁয়ে ডিস্পেন্সারি, মেটে ঘর।···

"আন্দাজ সকাল আটটার সময় মোটর-দুর্ঘটনা ঘটে—ধরণীদা মারা গেলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। দুবার বলেছিলেন 'শ্রীঅরবিন্দ'।···

"মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? সত্যেশ্বরের সৃষ্টিতে মিথ্যা কেন? আনন্দ-বিধাতার সৃষ্টিতে নিরানন্দ কেন? অব্রণ অস্নাবির অপাপবিদ্ধের সৃষ্টিতে শোক তাপ কেন? মন কি পায় কোন শেষ প্রশ্নের চরম জবাব?

"তবু একটা কথা বলব—যদিও ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন সে বিচিত্র অনুভূতি ·

"যখন আমাদের বাসটি প'ড়ে যায় তখন আমার চেতনার প্রতিটি তন্তু ছিল এক তীক্ষ্ণ সজাগ সুরে বাঁধা। স্পষ্ট মনে আছে—একটুও ভয় আসে নি, যদিও মৃত্যুকে খুবই কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। · পরিষ্কার মনে আছে—একটা অপূর্ব নির্ভরের ভাব মনে বিছিয়ে গেছে। সে-দুর্গ্রে আমার উদ্বেজিত হওয়াবই কথা—দৈহিক যন্ত্রণা আমি আদৌ সইতে পারি না, কিন্তু তবু মনের অতলে এক আশ্চর্য স্থৈর্য্য ছিল নিটোল হ'য়ে···আরো আশ্চর্য এই যে, আমার স্নায়ু একটুও চঞ্চল হয় নি। কারণ পতনের মুহূর্তে যদিও আমি বোধ করেছিলাম যে, আমি এক অলক্ষ্য মারণ শক্তির কবলে, পড়ছি পাতালে, তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করেছিলাম যে, কে যেন আমাকে ধারণ ক'রে আছে বর্মের মতই আগ্‌লে। আমার নিজের কোনো যোগ্যতায় যে এ-অঘটন ঘটে নি এ-চেতনাও আমার ছিল—অযোগ্য না হ'লে করুণার অবকাশ কোথায়? ··তাই প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু যন্ত্রণায় গভীর বেদনা পেলেও ভগবানের কাছে কোনো অনুযোগ করার কথা মনে হয় নি, শুধু এই প্রার্থনাই জেগেছিল:

> "অকূলপানে মনকে আমার দাও ফিরিয়ে, হে কাণ্ডারী!
> মেলতে শেখাও উদাস প্রাণের পালগুলি সব তোমার মুখে।

তরী আমার আজ তোমাকে বরণ ক'রে, হে দিশারি,
ছুটুক উধাও শ্রীচরণে আলোয় ছায়ায় দুঃখে সুখে।...

"তুমি যদি হাত না ধরো—একলা পথে কোথায় সাথী?
তোমার মলয় বিনা প্রেমল, বাসন্তী প্রশান্তি কোথা?
শুধু তোমার প্রসন্নতার উষায় কাটে অশ্রুরাতি,
শুধু তোমার প্রেমের প্রভায় যায় মিলিয়ে আঁধার-ব্যথা।

"আড়াল স'রে আজ গেছে, তাই উঠলে ফুটে স্মরণীয়!
করালী আজ কিরণমালী—মরণে জয়শঙ্খ বাজে।
আঘাত দিয়ে দেখালে—'কে ব্যথার মাঝে বরণীয়,
শূন্যতারো একাকারে সার্থকতা আছেই আছে'।"

কিন্তু উমাকে বলার কিছু খুঁজে পেলাম না যাতে সে শান্তি পেতে পারে। পণ্ডিচেরি ফিরে গিয়ে গুরুদেবকে সব বললাম। তিনি উমাকে আশীর্বাদ পাঠালেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ওর ভাই বাবুল মারা গেল—তার পরেই ওর প্রিয় মামা শুভ্রাংশু—চমৎকার সুদর্শন যুবক। উমা ভেঙে পড়ল। খবর পেলাম—ও শয্যাশায়ী—রোগ যক্ষ্মা।

॥ সাতাশ ॥

পণ্ডিচেরিতে ফিরে এলাম ১৯৩৯ সালে অগস্ট মাসে—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের এক সপ্তাহ আগে কিন্তু সাধনায় কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। কী করি? ভেবে চিন্তে সুরু করলাম লেখা উমাকে কেন্দ্র ক'রে রমন্যাস। নাম দিলাম "ছায়ার আলো"—প্রায় আদ্যন্ত তার জীবনী—কেবল তার অসুখ বাদ। কারণ তখনো সে অসুখে পড়ে নি। তাকে চিঠি লিখতাম নিয়মিত—সপ্তাহে তিন চারটির কম নয়। এত চিঠি আমি কাউকে লিখিনি। সে উত্তর দিত, কিন্তু কখনো বলত না তার বিষাদের কথা। কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত গানের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ শান্তি মেলে কি না। গানকে সে ভালোবেসেছিল কিন্তু গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। আমি তাকে লিখলাম—"সে হবে না, তুমি ভীষ্মদেবের কাছে গান শেখো।" ভীষ্ম-

দেবের গানে সে কিছুটা আশ্রয় পেল। শুধু তানপুরা নিয়ে সুরু করল রাগসঙ্গীত সাধনা। জ্ঞানপ্রকাশ লিখল সে চমৎকার গাইছে তানালাপ সহ। ঐ সঙ্গে আমার-শেখানো গানও সাধ্‌ত এই দুটি খুঁটি ধ'রে ফের সবে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময়ে তার ছোট ভাই বাবুল মারা গেল—তার পরই তার প্রিয় ছোট মামা শুভ্রাংশু। এই-ই হ'ল—the last straw—ও পড়লে নেতিয়ে। এমন কি, আমাকেও চিঠি লেখা ছেড়ে দিল। ওর মাসিমা লীলা—যে ছিল ওর মা-ও বটে সখীও বটে—লিখল আমাকে কলকাতায় আসতে—কারণ উমা বলছে সে বাঁচতে চায় না আর। ইংরাজীতে একে বলে death-wish—প্রায় সবাইকেই কোনো কোনো সময়ে এ-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—যখন মানুষ একান্ত নিঃসহায় হ'য়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে বলে বাইরের ভাষায়ঃ "In the midst of life we are in death" ভাগবতের ভাষায়ঃ

> "কী সুখ সংসারে ? , প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সাথে নিত্য বাস,
> কুসুমে কীট কাঁটা, ভোগে বিপর্যয়, শোকানলের ধূমে চিত্তাকাশ
> ক্ষণে ক্ষণে হয় মলিন—ইন্দ্রিয় সুখের পরে সেই অন্তহীন
> দুঃখ পরিতাপ—যাহার প্রতিকারো দুঃখ আনে বহি' রজনীদিন।"*

এ-দুর্লগ্নে কেবল ভগবানের কৃপাই সান্ত্বনা তথা আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু উমার যে-মন ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঝুঁকছিল সে-মন পর পর এই তিনটি আঘাতে বিকল হ'য়ে পড়ল। ফলে, এমন কি গানেও সে ক্ষণিক শান্তি পেলেও তার পরেই ফের বিষাদের অতলে হাঁপিয়ে উঠে বলত: "বাঁচতে চাই না আর মাসিমা!"

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উমা যখন গান গাইত তখন তার কণ্ঠে উচ্ছল হ'য়ে উঠত এমন এক মধুর ভক্তিভাব যার দোলায় অনেকের মনই অভিভূত হ'ত—চোখে জল ভ'রে আসত। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে অনেক আগেই লিখেছিলেন যে, মানুষ যতই বিকশিত হ'য়ে ওঠে ততই তার মধ্যে নানা স্ববিরোধী প্রবৃত্তি জটলা করে যার ফলে দেখা যায়—যে-মানুষ আজ উদার কাল সে হ'য়ে দাঁড়ায় কঞ্জুষ, যে মনে মনে ভয়কাতুরে সে হঠাৎ অসমসাহসিক হ'য়ে ওঠে, যে স্বভাবে বিলাসী সে থেকে থেকে ঝোঁকে রুক্ষ বৈরাগ্যের দিকে ··ইত্যাদি।

আমি নিজের মধ্যেও কি পদে পদে এ-অসঙ্গতি দেখি নি? আমার সংসারী

---

* যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসযোগ জন্ম—শোকাগ্নিনা সকল যোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখম্ (প্রহ্লাদের স্তব···ভাগবত ৭.৯.১৭)

যাঁরা ভগবৎসাধনায় সংসার ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের মন চমকে ওঠে একথায়—উপলব্ধি ক'রে যে, যে বৈরাগ্য দুঃখের ঔষধ হ'য়ে আসে সে-ঔষধও অনেকে সময়েই আরো দুঃখ আনে সব সাংসারিক আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে।

বুদ্ধিবাদী বন্ধুবৃন্দ আমাকে দেখে কি সায় দিতে পারতেন শ্রীঅরবিন্দের অদ্ভুত রায়ে যে আমি "জন্মযোগী", বা গুরুবাদীরা আমার প্রবল কর্মাসক্তি দেখে বলতে পারতেন— আমি স্বভাববৈরাগী ? আসলে আমি নিজেকে সনাক্ত করেছিলাম যুগপৎ বৈরাগী যোগী তথা কবি শিল্পী ব'লে। আমার পিতৃদেবের মধ্যেও কি দেখি নি দুটি মানুষ— একটি তার্কিক অন্যটি ভক্ত ? সমর্সেট মমের একটি প্রয়োক্তি মনে পড়ত—যে-কথা উমাকে বলেছিলাম—যে, মানুষ মাত্রেরই মধ্যে নানা অসঙ্গতি পাশাপাশি ঘরকন্না করে—কখনো একটি প্রবৃত্তি প্রকট হয়, কখনো তার উল্টো প্রবণতা। উমার মধ্যেই তাই সৌভাগ্যলগ্নেও দেখতাম দুটি মেয়ে—একটি সংসারবিমুখ, উদাসিনী, অন্যটি গীতোচ্ছলা, আনন্দময়া। আমি চেয়েছিলাম তাকে গানের রসে রসিয়ে ভগবানের দিকে টানতে, কিন্তু লীলাময়ের দুর্বোধ্য বিধানে লক্ষ্মী পূর্ণিমার উৎসবলগ্নে ছেয়ে এল শোকের অমাবস্যা : ও শয্যা নিল যক্ষ্মারোগে। লীলা লিখল ওর একটি ফুসফুস নিউমোথোরাক ক'রে নিশ্চল ক'রে দিতে হয়েছে। আমি শঙ্কিত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি অনুমতি দিলেন ওর রোগশয্যায় গিয়ে গান গল্প ক'রে ওকে মৃত্যু-কামনা থেকে ছিনিয়ে জীবননন্দিনীর রূপে ফিরিয়ে আনতে।

॥ আটাশ ॥

আমি কলকাতায় গেলাম আশা নিয়ে—কিন্তু শয্যাশায়ী উমার শীর্ণ মুখ দেখে বিষাদে মন ছেয়ে গেল। মৃত্যুর ছায়া ওকে ঘিরে ধরেছে। আমাকে দেখে ওর চোখে জল ভ'রে এল, কিন্তু তবু মুখে ফুটে উঠল ওর মধুর হাসি যার আলোয় ও সুন্দরী না হ'লেও অপরূপা হ'য়ে উঠত—সবাই বলত একথা। আমাকে বলল : "জানো মন্টুদা, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসছ, কিন্তু সত্যি যে তুমি আসবে ভাবতে পারি নি।"

"কেন বল্ তো সন্দেহময়ী ?" (ওকে মাঝে মাঝে এই নামে ডাকতাম আমি)

ও ম্লান হাসল : "তুমি সব ছেড়ে যাঁকে চেয়েছ তাঁকে যে আর চায় না এমন নাস্তিক মেয়েকে তুমি কেমন ক'রে মনে ঠাঁই দেবে ভাই ?"

"তুই কি জানিস আমরা সত্যি কী চাই না চাই ?"

এই ধরণের কথার সান্ত্বনা দিতে চাইলেই ও টুকত : "থাক থাক ভাই—'কথা কথা কথা'—তুমিই বলতে না ? আমি বলি—গান গান গান—গেয়ে চলো ভাই ?"

"গান গাইতেই তো এসেছি রে ! বল না কী গান শুনতে চাস্ ?"

"সেই গানটি মণ্টুদা—আমি গ্রামাফোনে শুনি প্রায়ই—সেই 'থেকো প্রিয় পাশে' —Abide with me-র অনুবাদ। না দুইটি গাও পর পর।"

আমি চম্‌কে উঠলাম: "তবু তুই বলবি তুই নাস্তিক? যাক্ শোন্":

থেকো প্রিয় পাশে, সাঁঝছায়া নেমে আসে,
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো প্রেমে পাশে।
যবে ছেড়ে যায় সবে নিসাথী প্রবাসে—
অনাথের নাথ থেকো হে আমার পাশে।

জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া,
ধরণীর হাসিরাশি হয় ম্লান ছায়া,
সকলি ফুরায়ে যায়, কাল সবই নাশে
হে চিরন্তন, থেকো হে আমার পাশে।

প্রতি পলে তুমি বিনা সঙ্গী কে আছে?
তুমি বিনা আর বলো যাব কার কাছে?
তুমিই আমার দিশা সহায় নিরাশে
বাদলে কিরণে থেকো হে আমার পাশে।

দিও দেখা—মুদিব নয়ন যবে শেষে,
দেখায়ো আকাশ কালো বুকে আলোরেশে,
ধরাছায়া সরে, অধরার উষা হাসে,
জীবনে মরণে থেকো হে আমার পাশে।

শুনতে শুনতে ওর চোখে জল ভ'রে এল। ওর মা, প্রভাদি ও লীলাও চোখ মুছল। আমি জোর ক'রে হেসে বললাম: "তবু তুই বলবি ভগবানের নামে সান্ত্বনা সব কথা কথা কথা?"

হাসি একটু চুপ ক'রে রইল আমার একটি হাত ওর মাথায় চেপে ধ'রে। আমার মন কোমলতায় ভ'রে গেল। আহা! এমন ফুলের মতন মেয়ের মাথায় কেন বাজ ভেঙে পড়ল? যে তার গানে হাসিতে সরল আনন্দে অপরের মনে জাগাতে পারে সুষমার সুরভি; যে ভগবান সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস না করলেও ভক্ত ও মহৎ মানুষকে দেখে এত সহজে উজিয়ে ওঠে; যার চাহনিতে মেলে এক টুকরো আকাশের নীল স্পর্শ; যার অভিনন্দনে কেউ কোনো দিন বাহুল্য দেখেনি; যার পবিত্রতার ছোঁয়াচেও মন পবিত্র হ'য়ে বলে—"আর যেখানেই ভয় থাকুক না কেন এখানে ভয়

সেই অশুচি হবার"—তাকে কেন এমন দুঃসহ দুঃখ পেতে হ'ল? ধরণীদাকে ও "বাপী" ডাকত—তিনি অনেক সময়ে ওকে ডাকতেন "পাগলী"। কী নিখুঁৎ স্নেহ পিতা-পুত্রীকে এত কাছে টেনে সখাসখীর পদবী দিয়েছিল। সেই নিটোল স্নেহময় বন্ধুকে ও হারাল—আর কী ভাবে! ওর কাছে বসলেই এই ধরণের বিষাদ আমার মনকে ছেয়ে ধরত। ও বুঝত, তাই কখনো অনুযোগ করত না, বলত না ওর দেহদুঃখের কথা। সেদিন আমার হাত খানিকক্ষণ মাথায় রেখে পরে দুহাতের মধ্যে বন্দী ক'রে শুধু বলল: "এর উত্তর কী আমি জানি না ভাই। শুধু জানি—এ গানটি বা তোমার বৃন্দাবনের লীলা গানটি শুনলে বুকের মধ্যে কী যেন হয়—আনন্দ না বেদনা বুঝতে পারি না।" ব'লে হেসে: "কিন্তু ব্যাখ্যা থাক ভাই তুমি গাও গাও—কেবল গাও। Abide with me."

আমি হেসে "আচ্ছা" ব'লে ধরলাম:

Abide with me, fast falls the eventide :
The darkness deepens, Lord, with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, Oh, abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day,
Earth's joys grow dim, its glories pass away,
Change and decay in all around I see :
O thou who changest not, abide with me,

I need thy presence every passing hour,
What but thy Grace can foil the tempter's power?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Oh, abide with me.

Be thou thyself before my closing eyes :
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee,
In life, in death, O Lord, abide with me.

ও প্রায়ই এই ধরণের গান শুনতে চাইত—আনন্দের নয়—বৈরাগ্যের গান, প্রাপ্তির নয়-অপ্রাপ্তির গান, মিলনের নয়—বিরহের গান। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন এর

নাম psychic sadness—এ-বেদনা ঢালুপথে টানে না—তোলে আকাশের পানে। তবু আলাপ-আলোচনায় ও ভগবানের কথায় কান দিত না, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শ্রীঅরবিন্দকে গভীর ভক্তি করত। কেন জিজ্ঞাসা করলে একবার বলেছিল : "কারণ তোমাকে তিনি স্নেহ করেন সত্যিই।"

"কী ক'রে জানলি ?"

"নৈলে কি আমাকে স্নেহ করতেন ? তোমাকে স্নেহ করেছেন মনেপ্রাণে তাই আমাকে নাস্তিক জেনেও তোমার মতন ভক্তকে পাঠিয়েছেন কতদূব থেকে—আশ্রম ছেড়ে সংসারে—আমাব মৃত্যুশয্যায়।"

প্রভাদি (চোখ মুছে) : বালাই! ও কথা বলে না মণি।

ও তর্ক করত না—শুধু চোখে ওব জল চিক চিক ক'রে উঠত, আমি মুছিয়ে দিতাম—শুধু একবাব নয, বারবার।

আমি ওর রোগশয্যাব পাশে থাকতাম সাবা দিন। দুমাস বাদে ওর অবস্থা একটু ভালো হ'ল। আমি অগষ্টে ফিবে এলাম। ২২এ জানুয়াবী (১৯৪২) তার পেলাম ও বিদায় নিয়েছে—ওব জন্মদিনে—যেদিন আমারও জন্মদিন। ওর বয়স তখন মাত্র ২১ বৎসব।

॥ উনত্রিশ ॥

শ্রীঅববিন্দ সাবিত্রী-তে লিখেছেন (৬. ১) :

> The great Gods use the pain of human hearts
> As a sharp axe to hew their cosmic road
> মহীয়ান্ দেববৃন্দ মানুষেব হৃদয়ব্যথার
> কুঠারে কবেন নিত্য উন্মুক্ত সৃষ্টির রাজপথ।

বেদনার অন্ধকার যখন ছেয়ে আসে তখন এ-ধরণেব দার্শনিক উক্তি মনে হয় উমার ভাষায়—"কথা কথা কথা!" কিন্তু কলাতিপাতে সব সময়ে না হোক অনেক সময়েই দেখা যায় যে একটানা অবিমিশ্র আনন্দের পথে মানুষেব গভীর বোধের বিকাশ হয় না। এ বিকাশ না হ'লে কী হয় ?—আনন্দ আর তেমন আনন্দ দেয় না, ভোগ হ'য়ে ওঠে দুর্ভোগ না হোক—নীরস, একঘেয়ে। এক দার্শনিক তাই বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা : যে মানুষের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ দুঃখ ব্যথা নয়, সব চেয়ে

দুঃসহ বিতৃষ্ণা—**boredom.** "সব পেয়েছির দেশে" মানুষ অনেক কিছুই পেতে পারে কিন্তু পায় না কোনো গভীর প্রাপ্তির বর। একথা যদি সত্য না হ'ত তাহ'লে যুগে যুগে বরেণ্য মহাজনেরা ছোট সুখ ইন্দ্রিয়ের ক্ষণতৃপ্তি ছেড়ে সাধনার তপস্যার দুর্গম পথে পা বাড়াতেন না। অবিশ্বাসী বাস্তববাদীরা হাল্কা স্বরে সব গভীর আন্তর উপলব্ধিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পারেন, কিন্তু কতদিন? যতদিন না গভীর শোক তাপের অন্ধকারে প'ড়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে, চোখের আলোও কালো হ'য়ে আসে। পক্ষান্তরে গভীর দুঃখ বেদনা শোক যে আমাদের অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত' করে এ-সত্যের অগুন্তি প্রমাণ মেলে বহু মহাজন মহাপুরুষেরই প্রাণসাধনায়—যাঁরা তাঁদের জীবনের দীপ্ত এজাহারে প্রমাণ ক'রে গেছেন যে, যে-বেদনা সচরাচর আমাদের ক্লিষ্ট মনকে নিরাশার অতলতলে প্রক্ষেপ করে সে একান্তী সাধককে দৃষ্টির শিখরে তুলে সার্থক করতেও পারে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে প্রতিপদেই এ-আনন্দময় সত্যের স্বাক্ষর মেলে। তাঁকে দুঃসহ দুঃখের কাঁটাবনের মধ্যে দিয়েই প্রতি পদে ফুলবনের পথ খুঁজে পেতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি সুন্দর উপমা দিতেই লেখেন নি—
"আমার এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।"

আমাকেও জীবনে দুঃখ পেতে হয়েছে অঢেল। তাদের ফিরিস্তি দেওয়া অবান্তর হবে, কেন না এ-স্মৃতিচারণ খতিয়ে শ্রীঅরবিন্দের তর্পণ, আমার ব্যক্তিগত সাধনার পটভূমিকায় এঁকেছি তাঁর ছবি কারণ এই পথেই তাঁর মহত্ত্বকে আমি উপলব্ধি করেছি। একথার একটি নতুন প্রমাণ—উমার মৃত্যুর পরে শ্রীঅরবিন্দ আমার আরো কাছে এগিয়ে এলেন আমাকে বেদনার অমানিশা থেকে আবার দীপ্ততর চেতনায় টেনে তুলতে তাঁর যোগশক্তিতে। উমার অকালমৃত্যুর পরে তিনি একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন (২০ ১২ ৪২): "আমি তোমাকে শুধু চিঠি লিখেই সাহায্য করি মনে কোরো না—যখনই আমি সময় পাই তোমাকে পাঠাই শক্তি ··ইত্যাদি [**I am certainly not helping you only with letters but doing it whenever I get some time for concentration and I notice that when I can do it with sufficient energy and at some length there is response** ···20.12.42.") এর নাম যদি "গুরুকৃপা" না হয় তবে গুরুকৃপা কী বস্তু?

॥ ত্রিশ ॥

শ্রীযুগলকিশোরের আমন্ত্রণের কথা বলেছি। বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দ অনুমতি দিলেন না আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্মের প্রচারে উঠে প'ড়ে লাগতে। তিনি বলতেন

প্রায়ই যে, ওরাই আসবে—যেমন মৌমাছি সেধে আসে ফুলের কোলে। আমি তর্ক তুলতে পারতাম—কলকাতায় গিয়ে গান ক'রে যদি যোগসাধনার ভরাডুবি না হয় তবে বিদেশে যাওয়ার বাধা কি? তুলি নি এ-তর্ক কারণ শ্রীঅরবিন্দকে ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাবার কোনো তাগিদই আমি পাই নি আমার মনের মধ্যে। হিন্দুধর্ম প্রচার? ও যাঁরা পারেন তাঁরা করুন—প্রত্যেকেই চলুন তাঁর আন্তর প্রেরণায়, ভাবের ঘরে চুরি না করলে সব পথই রাজপথ হ'তে পারে। কিন্তু আমার কথায় ফিরে আসি।

তিন চার বার বাইরে গিয়ে গান ক'রে আসার পরে আমার মনে হ'ল—গান ক'রে আশ্রমের জন্যে কিছু টাকা তোলা মন্দ কি? আমার তখন স্বাস্থ্য অটুট, প্রাণশক্তি অক্লান্ত—তাই মনে হ'ল দেখাই যাক না এভাবে কিছু কিঞ্চিৎ গুরুসেবা করতে পারি কি না? গানের চ্যারিটি কন্সার্ট বাংলাদেশে প্রথম আমিই সুরু করি—মানে বিশুদ্ধ গানের—অভিনয় বাদ। আমার মনে উচ্চাশা তো তখনো নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে নি, তাই বললাম গুরুদেবকে যেমনি বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে নিমন্ত্রণ এল।

প্রথম গেলাম বম্বে—১৯৪৩ সালে। কিন্তু বম্বেতে সেবার কোনো চ্যারিটি কন্সার্ট করি নি—প্রাইভেট দৈলিপী আসর ক'রে মাত্র হাজার খানেক টাকা তুলে পণ্ডিচেরি পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা আশীর্বাদ পাঠাতে আমি মহানন্দে লিখলাম: আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব আরো প্রণামী পাঠাতে—মানে বম্বেবাসীদের চাদা। কিন্তু দেখলাম যে প্রাইভেট আসর ক'রে টাকা তোলা আদৌ সহজ নয়। পরে একবার এলাহাবাদে এ-সত্যটি আরো মর্মন্তুদ ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। এক মহিলা আমাকে ভরসা দিলেন তাঁরা আমাদের আশ্রমের জন্যে বেশ মোটা টাকা তুলবেন যদি আমি তাঁদের এক আসরে গাই যেখানে বহুলোক আসবে। সময়—সকাল আটটা। ভোর ছটায় উঠে এক পেয়ালা চা খেয়েই বেরিয়ে গেলাম—কারণ আসরের শামিয়ানা বহু দূরে। গিয়ে দুঘণ্টা তারস্বরে নানা ভজন কীর্তন ক'রে গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে পেলাম সাড়ে বাষট্টি টাকা চাঁদা। বম্বেতে এত কম চাঁদা পেয়ে ক্লিষ্ট হ'তে হয় নি, তবে কোনো প্রাইভেট আসরেই দুশো তিনশোর বেশি মিলত না সচরাচর। তখন আমার ধনী বন্ধু পারেখকে লিখলাম আমেদাবাদে যিনি আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন বড় গলা ক'রেই। তিনি আমাকে ডাকলেন বটে, কিন্তু হা হতোহস্মি, সেখানেও সেই প্রাইভেট আসর। সব জড়িয়ে জুটলো মাত্র আড়াই হাজার টাকা।

কিন্তু তারপরেই ভাগ্যদেবতা হাসলেন। আমি গিয়ে উঠেছিলাম আমার ক্রোরপতি বন্ধু খ্যাতনামা আম্বালাল সারাভাইয়ের প্রাসাদে। ক্রোরপতিদের মধ্যে আমি তাঁকেই প্রথম বন্ধু ব'লে সনাক্ত করি। পরে আরো দুজন ক্রোরপতি

আমাকে মালা দেন বন্ধু ব'লে বরণ ক'রে: ইন্দিরার পিতৃদেব ক্যাপ্টেন কৃপারাম ও স্যার চুনিলাল মেতা।

আমি আম্বালালের কাছে আশ্রমের কথা কিছুই বলি নি, কেবল এখানে ওখানে গান গেয়ে প্রাণপণে টাকা তুলছি অপটু বন্ধু পারেখের নিমন্ত্রণে। কিন্তু পাঁচসাত জায়গায় তারস্বরে দুতিন ঘণ্টা গেয়েও যখন আড়াই হাজারের বেশি চাঁদা উঠল না, তখন বেশ একটু দ'মে গেলাম। কী করা যায় ভাবছি গালে হাত দিয়ে এমন সময়ে একদিন আম্বালাল হঠাৎ বললেন: "রায়! তুমি তো আমাকে কই বলো নি যে, তুমি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে টাকা তুলতে বম্বে ও আমেদাবাদে টো টো ক'রে গান গেয়ে বেড়াচ্ছ?" আমি সুবিধা পেয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারলাম: "বলি কোন্ মুখে বন্ধুবর, তোমার মুখে ঘড়ি ঘড়ি শুনে যে তুমি অজ্ঞেয়-বাদী (agnostic)?" তিনি বললেন: "কিন্তু তা ব'লে আমি শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা করি না এ তো সত্যি নয়। কাজেই আমিও তোমার সহায় হ'তে চাই।" ব'লে বললেন: "আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার আচরণে: যে, চাঁদার কথা বলো নি একবারও।" বলে বললেন: "শুনছি, তোমার বন্ধু পারেখ ভরসা দিতে যত ত্বরিৎকর্মা চাঁদা তুলতে তেমন করিৎ-কর্মা নন। প্রাইভেট আসরে যথেষ্ট টাকা তোলা যায় না। কত উঠেছে?" আমি সলজ্জে বললাম: "মাত্র আড়াই হাজার।" তিনি আর কিছু না ব'লে তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন যে তাঁর বিরাট দরবারী কক্ষেই আমার গান হবে—কিন্তু সেমি-প্রাইভেট। অর্থাৎ বাইরে এক বিনম্র বাক্স রাখা হ'ল—শিরোনামা: "স্বেচ্ছায় যে যা দিতে চায়।" টিকিট ক'রে প্রাইভেট আসরে গান করতে আমি চাই নি কারণ টিকিট করলে আরো শিষ্য শিষ্যাকে রিহার্সাল দিয়ে গ'ড়ে তুলতে হয়—বম্বে বা আমেদাবাদ তো কলকাতা নয়—শিষ্য শিষ্যা পাই কোথায়?

গুরুর কৃপায় গান সেদিন খুব জ'মে গেল প্রথম থেকেই। ফুলের মালা করতালি জয়শঙ্খ কিছুই বাদ গেল না—যা যা শ্রীঅরবিন্দ বারণ করেছিলেন তাই হ'ল একের পর এক। মন খারাপ। কিন্তু যখন শুনলাম সাড়ে ছয় হাজার টাকা উঠেছে তখন ফুল্ল মনেই বিদায় নিলাম। ফিরে এলাম বম্বে।

সেখানে এক গুজরাতী বণিক আমায় নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে। আমার গাইবার ইচ্ছা ছিল না। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—কাজ নেই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, নিষ্কৃতি দিলেন না। গানের পর আমাকে বললেন যে যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গুরু সেহেতু শ্রীঅরবিন্দের Life Divine তিনি বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর পূজামন্দিরে। গিয়ে দেখি সত্যিই অবাক্ কাণ্ড—Life

Divine আসীন তাঁর বেদীতে—চন্দন সিঁদুর মাখা—পাশে ধূপ দীপ, গ্রন্থবিগ্রহের উপর ফুলের মালা ও তুলসী মঞ্জরী! বললেন ভক্ত প্রবর: তিনি ইংরাজী জানেন না তো—তাই তাঁর এই অভিনব পদ্ধতিতে শ্রীঅরবিন্দ পূজা—তাঁর গ্রন্থের মধ্যে তাঁকে আবাহন!

॥ একত্রিশ ।

বম্বে-আমেদাবাদে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তুলবার পরে পণ্ডিচেরি থেকে বেরিয়ে প্রতি বৎসর দুতিন মাস ধরে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিতাম। যতদূর মনে পড়ে আশ্রমের জন্যে চ্যারিটি কন্সার্ট সুরু করেছিলাম প্রথম ১৯৪৪ সালে—শেষ হয় ১৯৫০ সালে। এ কয় বৎসরে হিসেব ক'রে দেখেছি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছিলাম আশ্রমের জন্যে। লজ্জানিবারণকে প্রণাম করেছিলাম যখন শেষবার ফিরে শ্রীমার চরণে তেষট্টি হাজার টাকা প্রণামী দিতে পেরেছিলাম। এ-সূত্রে বলি দুটি আসরের কথা—যে দুটি ঠিক চ্যারিটি কন্সার্ট ছিল না—কারণ মঞ্চে শোভমান হয়েছিলাম একা আমি।

কানপুরে গান গেয়ে আমি বরোদায় যাই গাইকবারের অতিথি হ'য়ে। কয়েকটি বন্ধু আমাকে পেশ করেছিলেন নানা উপাধি দিয়ে। ফলে বরোদাবাসীরা চাইল আমাকে ভাষণ দিতেও হবে। এইই আমার প্রথম সত্যিকার পাবলিক ভাষণ। কিন্তু অত্যধিক গান গেয়ে আমি সে সময়ে দারুণ ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছি—এমন কি দু-তিনবার রক্তের ছিটেও ছিল নিষ্ঠীবনে। এ-অবস্থায় গান ও ভাষণ—আর একেবারে একলা! কিন্তু ওরা বেশ মোটা দক্ষিণা দেবে শুনলাম পাঁচ-সাত হাজার টাকা। নিমন্ত্রণও নিয়েছি। নিরুপায়।—"জয় গুরু" ব'লে তো গেলাম বরোদা। কিন্তু হায় রে, এক গুজরাতী ডাক্তার বন্ধু আমার গলা পরীক্ষা ক'রে বললেন শিউরে উঠে: "দুতিন মাস মৌনী বাবা না হ'লে আপনার গলায় এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে।" আমি বললাম: "দুঃখিত. বন্ধুবর, কিন্তু আমি গুরুদেবকে কথা দিয়ে বেরিয়েছি—I won't spare myself—এখন পিছোতে পারব না।" তিনি বললেন: "আমি শ্রীঅরবিন্দকে তার করছি, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন, আপনাকে আমি লুকিয়ে রাখব যতদিন না ফাঁড়া কাটে।" আমি বললাম: "বন্ধুবর, বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আড়াই মাস ধ'রে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট ক'রেও যখন টিঁকে আছি—তখন এই শেষ দুটি মঞ্চে উঠে গাইলেও বেঁচে বর্তেই থাকব।"

"শেষ দুটি? এর পরেও—"

"হ্যাঁ, বম্বেতে সুন্দরবাই হলে আমার অন্তিম আসর। দুঃখের বিষয়, সেখানেও ভাষণ দিতে হবে গানের সঙ্গে।"

বন্ধুবর (উদ্বিগ্নকণ্ঠে): "আপনি জানেন না ক্যান্সার কী বস্তু—"

আমি (করুণ হেসে): জানি বন্ধু, আমার একটি প্রিয় বন্ধুকে আশ্রমে ক্যান্সারে ভুগতে দেখেছি—সে-যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না—তবে (তাঁকে থামিয়ে) কথা দিচ্ছি, এই দুটি আসরের শেষে বিশ্রান্ত হব—কিন্তু শেষরক্ষা না হ'লে মরণান্তিক দুঃখ পাব। (ব'লে হেসে) কবি বলেছেন: **All's well that ends well**—মহাজন বলেছেন: গুরুকৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে, আর আমি প্রবল প্রৌঢ় গুরুবাদী ক্যান্সারকে থাবা মেরে হটিয়ে দিতে পারব না? বলেন কী আপনি?

প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহ—গাইকবারের নিজের সভাগৃহ—নামটা ভুলে গেছি। রাজপুরুষরা সবাই উৎকর্ণ। আমি কাশছি ও থার্মস্ ফ্লাস্ক থেকে বারবার গরম জল চুমুক দিয়ে কাশিকে দাবিয়ে ভাষণ দিয়ে চলেছি—গুরুদেবের নানা মহত্ত্বের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রেরণার অভাব ছিল না, কেবল **spirit willing** হ'লেও **flesh weak** হওয়ার দরুণ আশঙ্কা ছিল শেষটায় গান গাইতে হয়ত পারব না। কী হবে তাহ'লে? মনে মনে প্রার্থনা সুরু ক'রে দিলাম গান গেয়ে:

> "বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে বানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে
> অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।"

কী আশ্চর্য, গাইবার সময় একবারও কাশি নি। "জয় গুরু" ব'লে ধ'রে দিলাম: "বৃন্দাবনকী মঙ্গললীলা য়াদ আরে য়াদ আরে···" গাইলাম ঝাড়া আধঘণ্টা।

অঘটন ব'লে অঘটন! গরম জলে চুমুক দিতে দিতে ভাষণ দেওয়া চলে—কিন্তু গান গাওয়া চলে না তো। তাই প্রার্থনা করেছিলাম চোখের জলে—সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম ভবানীর আশীর্বাদ, গুরুর করুণা।

অবশ্য পরে সাতদিন বিশ্রাম নিতে হ'ল। কিন্তু ক্যান্সার তো হ'লই না—মনও চলল বিশ্বাসের পাল তুলে কৃতজ্ঞতার দাঁড় বেয়ে। তবে ব্রঙ্কাইটিস সমানই রইল নিত্য সাথী হ'য়ে।

ফলে দিন পনেরো বাদে সুন্দরবাই হলে ঠিক এই অঘটনেরই পুনরাবর্তন হ'ল—ভাষণের সময় কাশির ঘনঘটা, গানের সময় আনন্দাকণ—শান্ত, নির্মল, অনাময়। সভাপতি ছিলেন কে. এম. মুন্সি। তাঁকে বন্ধু পাওয়া গেল এই সূত্রে। করুণার অভ্যাগম হয় এমনি ছন্দেই অগ্নিপরীক্ষার পরে। নৈলে কেউ কি নিজের চেষ্টায় পারে অসাধ্য সাধন করতে?

।। বত্রিশ ।।

প্রথমবার বম্বে ও আমেদাবাদের শফরের শেষে পণ্ডিচেরি ফিরে এসে আমার আত্মাভিমান বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট হ'যে উঠেছিল। কয়েকজন সাধক বললেন : "আহা, আমরাও যদি এভাবে গুরুসেবা করতে পারতাম গো।" যাঁরা আমাকে অকেজো গায়ক ব'লে কৃপার চোখে দেখতেন তাঁরাও হেসে কথা কওয়া স্থরু করলেন। সবচেয়ে মজা লাগল এক ডাক্তারের কথা শুনে। তিনি আমাকে সোজা এসে শুধালেন (**without ado**) : "শুনলাম আপনি বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে আশ্রমের জন্যে দশহাজার টাকা তুলে এনেছেন ? সত্যি ?"

"আজ্ঞে।"

"কী আশ্চর্য।"

"কেন ?"

"কারণ আমিও গিয়েছিলাম বম্বে ও আমেদাবাদ, কিন্তু কিছুই চাঁদা তুলতে পারি নি বহু চেষ্টা ক'রেও।"

মনে পড়ল এক হরিণের গল্প। সে নেকড়ে বাঘের কাছে এসে বড় চোখ আরো বড় ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল : "শুনি, তুমি বুনো মোষকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছিলে ? সত্যি ?"

নেকড়ে বাঘ : হুবহু।

হরিণ : কী আশ্চর্য !

নেকড়ে বাঘ : কেন ?

হরিণ : কারণ আমিও ঐ বুনো মোষের সঙ্গে লড়েছিলাম, কিন্তু জিততে পারি নি।

তবে সাহেবপুরাণে বলে : "**It takes all sorts to make a world.**"

* * *

যাই হোক, আমি নেকড়ে বাঘ না হ'লেও এর পর থেকে গীতিগর্জন শুরু করলাম : প্রতি বৎসর দু'তিন মাস সারা ভারত চক্র দিয়ে আমার সাঙ্গীতিক গর্জনের দৌলতে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তোলা প্রায় আমার যৌগিক পেশা হ'যে দাড়াল। ফলে আমার দুটি লাভ হ'ল : আশ্রমে যাঁরা নিরপরাধ আমাকে স্থপ্রামেণ্টাল-বিরোধী নাম দিয়ে হেনস্থা করতেন তাঁরাও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ স্থরু করলেন কী ক'রে আমি পারলাম যা আমার পারার কথা নয়—অর্থাৎ

ভজন কীর্তনের বামন আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের টাকার ফল পাড়া। এঁদের মধ্যে আবার অনেকের ধারণা ছিল—ভজন কীর্তন গানই নয়, গান তো ওস্তাদি গান। তাই পণ্ডিচেরিতে আমার ভজনের আসরে তাঁরা সচরাচর আসতেন না বা কখনো এলেও একটু পরেই প্রস্থান করতেন। কিন্তু এঁরাও অতঃপর আমার ভজন শুনতে আসতেন। দান্তে গেয়েছিলেন: **"L'amor che move il sole e l'altre stelle"**—অর্থাৎ প্রেমই সূর্য ও তারাদের ঘোরায়। এ-যুগে প্রেমের শক্তি বর্তেছে টাকায়—**it's money that makes the suns and stars go round**—কে অস্বীকার করবে? আমি কি নিজেই চাক্ষুষ করি নি এ-দুর্দান্ত সত্য সব দেশেই?—কেবল আশ্রমে এর দেখা পাব ভাবি নি। কিন্তু তা-ও পেলাম। অবশ্য অনেক শান্ত সুস্থ সাধক ছিলেন যাঁরা আমার অর্থাহরণের জন্যে আমাকে বিশেষ ক'রে তারিফ করেন নি। কিন্তু বেশ কয়েকজন আমার প্রতি সদয় হয়েছিলেন একথা তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারি।

॥ তেত্রিশ ॥

কিন্তু এর পরে যখন আবার সফরে বেরুই, তখন সময়ে সময়ে বেশ একটু বিপন্ন হ'তে হ'ত বৈ কি নানা কারণে। একটি এই যে, প্রতি বৎসরই কন্সার্ট দেওয়ার জন্যে আমাকে নানা ছাত্র ছাত্রী সংগ্রহ করতে হ'ত "রেক্রুট" করার মতন। সব সময়েই কিছু সুগায়ক সুগায়িকা পেতাম না, তবে মনে হ'ত সাহেবদের কথা: **"A good workman makes do with the tools he has"**—তাই যেমন আধার মিলত তেম্‌নি গানের ব্যবস্থা করতাম অনুযোগ না ক'রে। তানওয়ালা গান গাইতে পারে এমন বালক বালিকা বা তরুণ তরুণী সর্বত্র মিলত না, অথচ একলা গেয়ে গানের প্রোগ্রামে বৈচিত্র্যের আমদানি করা অসম্ভব ব'লে তারা যে-সব গান গাইতে পারে সেই সব গানই শেখাতাম বাধ্য হ'য়ে। আরো এক মুস্কিল হ'ত—তারা অনেকেই ভক্তির গান গাইতে তেমন আগ্রহ বোধ করত না, ভালোবাসিত সেন্টিমেণ্টাল প্রেমের গান বা স্বদেশী গান। স্বদেশী গানে তারা কিছুটা প্রাণসঞ্চার করতে পারত বটে, কিন্তু ওজঃশক্তি আনতে পারত না। কাজেই তাদের কোরাস গানে আমাকেও যোগ দিতে হ'ত যার ফলে আমাকে বেশ একটু ক্লান্ত হ'তে হ'ত—একক গানের পর কোরাসেও গাইতে হ'ত ব'লে। শেষে হঠাৎ মনে হ'ল—বৈচিত্র্য আনার জন্যে নানা যন্ত্রের একতান সঙ্গীতের প্রবর্তন করা যাক। কিন্তু তার জন্যেও যন্ত্রীদের তুতিয়ে

পাতিয়ে বাজী করিয়ে রীতিম'ত রিহার্সাল দিতে হ'ত অনেক সময়ে স্বরলিপি সাজিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, কন্সার্টলব্ধ অর্থ শ্রীঅরবিন্দের চরণে নিবেদন করা হবে শুনে সবাই না হোক পাঁচ-সাতজন যন্ত্রী মিলে যেত। দুবার কলকাতায় চমৎকার অর্কেষ্ট্রাও পেয়ে গিয়েছিলাম।

অতঃপর মনে বিদ্যুৎ-চিন্তা খেলে গেল—যাকে বলে brain wave—নৃত্যসঙ্গতের ব্যবস্থা করা যাক। কিন্তু পেশাদার নর্তকীর কাছে তো যাওয়া চলে না, আর সুভদ্রা নর্তকী যোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়। অবশেষে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালাম, যার ফল ফলল দেখতে দেখতে—মিলে গেল এক চমৎকার সুকুমারী—যে নৃত্যে অপরূপা না হ'লেও আমার কীর্তন ভজনের সঙ্গে হেলে দুলে উপভোগ্য রসসৃষ্টি করেছিল। সবচেয়ে সফল হয়েছিলাম—কলকাতার শোভন 'রকসি' প্রেক্ষাগৃহে অর্কেষ্ট্রা তথা নৃত্যসঙ্গতে বন্দেমাতরম গেয়ে—তাতে নানা নতুন পদ জুড়ে—আমার "সুরবিহার" স্বরলিপি দ্রষ্টব্য। পরে এ-গানটিতে চারটি মেয়ে নেচেছিল শিলঙে—সার্থক যন্ত্রসঙ্গত ছিল না বটে, কিন্তু চার চারটি মেয়ের পরপর আবির্ভাবে তুমুল জয়ধ্বনি করেছিলেন শ্রোতৃবৃন্দ। সভাপতি ছিলেন তৎকালীন আসাম-রাষ্ট্রপাল—শ্রীপ্রকাশ। তিনি বিশেষ মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে তাঁর রাজভবনে অতিথি হ'তে বাধ্য ক'রে সাধুবাদ দিলেন রাজপুরুষদের মাঝে এক করতালিবিধ্বনিত দীপোজ্জ্বল ভোজে। শেষ চ্যুতি—মালা-তিলক গ্রহণ—গুরুদেবের নিষেধ সত্ত্বেও।

এর পরে আমার মনে বিষম উৎসাহ এসে গেল—কন্সার্টের চরকিবাজি সুরু হ'ল যদিও নানা শহরে কন্সার্ট দেওয়া সহজ ছিল না মোটেই। তবে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণামী দেব ভাবলেই ক্লান্ত মনও চেতিয়ে উঠত—অপ্রত্যাশিত শক্তি এসে যেত।

কিন্তু এ তো হ'ল বাহ্য—যে-কোনো আসর মঞ্চস্থ করতে হ'লেই বাধা আসে নানা দিক থেকে। একদল লোক বলাবলি সুরু করলেন—যোগপন্থী হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীতের আয়োজন অনুচিত। তাদের ভ্রূকুটিকে গণ্য না করা তত কঠিন মনে হ'ত না, কিন্তু যখন দরদী ধার্মিক বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিবাদ করা সুরু করলেন এই ব'লে যে, আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি সব অনর্থের মূল অর্থকে আহরণ করতে তখন সময়ে সময়ে মন একটু ক্লিষ্ট হ'ত বৈ কি। শেষে শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি লিখলেন যে, অর্থ সংগ্রহ করা অনুচিত হ'ত যদি আমি নিজের জন্যে টাকা তুলতাম, কিন্তু যখন গুরুসেবার জন্যে অর্থোপার্জন করছি তখন প্রত্যবায় আসতেই পারে না। কেবল—লিখলেন তিনি—সামাজিক সভা সমিতি পার্টি ডিনার এসব বর্জনীয়। যতদূর মনে পড়ে—অতঃপর আমি সামাজিকতায় বেশি যোগ দিই নি। কিন্তু তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করত নাচ গান ক'রে টাকা তুলতাম ব'লে—বিশেষ নাচ। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি

বলার প্রয়োজন দেখি না। এটুকুও যে বললাম সে শুধু জানাতে যে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" (শ্রেয়ের পথে অনেক বাধা) এ-সত্যটিকে নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রে আদর্শবাদীকে কী ভাবে রিয়ালিস্ট হ'য়ে হায় হায় করতে হয়েছিল।

কিন্তু লাভও হয়েছিল যথেষ্ট: কত চমৎকার হৃদয়বান গুণী তথা মনীষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল; কতবার ভক্তির-গানে নানা ধর্মার্থীর ব্যাপক সাড়া পেয়ে সব মনস্তাপ গ'লে আনন্দের জোয়ার ব'য়েছিল আমার মনে; কত যোগপন্থী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কথা জানতে পেরে তাঁর মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন—যাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনার্থী হ'য়ে পরে এসেছিলেন পণ্ডিচেরি আশ্রমে। শুধু তাই নয়, নানা যোগবিমুখদেরও নানা ভুল ধারণার নিরসন হয়েছিল আমার সঙ্গে আলোচনায়। শ্রীঅরবিন্দকে আমি সব কথাই খুঁটিয়ে জানাতাম—সত্যিই নিজের গুণগান ক'রে "বা রে আমি" বলতে নয়—তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে। কারণ এখন তো আর উমা ছিল না (যার ভক্তিসঙ্গীতে আগে আগে মনের অবসাদ কাটত) তাই থেকে থেকে মনে হত "দূর হোক, ফিরে যাই শ্রীগুরুর শীতল চরণে।" কিন্তু কর্ম করলেই কর্মবন্ধনের ফাঁদে পড়তে হয়—নানা শহর থেকে ডাক আসত, যেতে হ'ত গান গাইতে বা কন্সার্টের ব্যবস্থা করতে—শেষে ভাষণও দিতে হয়েছিল নানা সভাসমিতিতে তথা ধর্মার্থিসংসদে। আশ্রমে ফিরে গুরুদেবকে সব কথা লিখতাম খুঁটিয়ে কোথায় কোথায় গুরুবাক্য মেনে চলেছি আর কোথায় কোথায় চ্যুতি হয়েছে যদিও (হায় রে!) সেজন্যে অনুতাপে তনু দগ্ধ হয় নি। তিনি আমার অননুতপ্ত "কনফেশন" প'ড়ে হেসেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু যেটা জানি সেটা এই যে তিনি প্রাণভরা স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন সব স্খলন ক্ষমা ক'রে:

"We have always had a full appreciation of what you have done for us and for your untiring effort and what you have achieved in collecting much-needed contributions for the Ashram funds and still more in turning the minds of people outside, previously indifferent, towards us and our work. You should throw away entirely your idea that we are so insensitive as not to have appreciated what you have done for us." (4.3.49)

(ভাবার্থ: তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ, আশ্রমের জন্যে প্রণামী তুলেছ, বাইরের অনেক জিজ্ঞাসুকে আমাদের দিকে টেনে এনেছ যারা আমাদের সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—এসবই আমাদের কাছে প্রশস্ত মনে হয়েছে। এ ধারণা তোমার মন থেকে

একেবারে মুছে ফেলো যে, আমাদের মন এমন অসাড় যে তোমার গুরুসেবার মর্মজ্ঞ হ'তে আমরা অক্ষম।)

এর পরে আর এক মুস্কিল হ'ল : যখন খেলাধূলা ড্রিল মার্চ ছোটাছুটির প্রবর্তন হয় তখন আমি কিছুতেই মনকে রাজী করাতে পারি নি "স্পোর্টস্"-এ যোগ দিতে। কিন্তু মনে আশঙ্কা হ'ত প্রায়ই যে, গুরু যখন এসব চাইছেন তখন আমার পক্ষে সাড়া না দিলে অন্যায় হবে হয়ত—কে জানে? ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে গুরুদেবকে খোলাখুলি লিখলাম আমার দুর্ভাবনার কথা : আমি খেলাধুলায় যোগ না দিলে তাঁর স্নেহ ও কৃপা থেকে বঞ্চিত হব না তো?·· ইত্যাদি। সব বলার দরকার নেই, কারণ খেলাধূলার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বহু নিবন্ধ ও চিঠিই ছাপা হয়েছে। গুরুদেবের ব্যাখ্যার চুম্বক এই যে, "শরীর মাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্" ব'লে দেহকেও তিনি পটু করতে চান নানা খেলাধূলা ছোটাছুটি সাঁতার ব্যায়াম ইত্যাদি বলসাধনায়। আমাকে তিনি এ-সম্বন্ধে কয়েকটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। শেষের চিঠিটিতে স্পোর্টস সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ভুল ধারণার নিরসন ক'রে আমাকে আবার তাঁর স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন এমন মধুর সুরে যে আমি বিষাদ কাটিয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। তিনি ২৭.৪.৪৯ তারিখের সুদীর্ঘ চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন :

I write all this in the hope of clearing away all the strange misconceptions with which the air seems to have become thick and by some of which you may have been affected. I wish to assure you that my love and affection and the Mother's love and affection are constantly with you. We have had nothing for you but love and affection and a full appreciation of all you have done for us, your work, your service, your labour to make people over there appreciate our Ashram and what it stands for and to turn men's minds favourably towards us and what we are trying to do. As for me, you should realise that the will to help you towards divine realisation is one of the things that has been constantly nearest to my heart and will be always there. (27.4.49)

(ভাবার্থ : আমাদের স্নেহ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ণ সজাগ আছি : তোমার গুরুসেবা, অনেকের

মন আমাদের দিকে ফেরাবার প্রয়াস, তাদের বুঝিয়ে বলা আমাদের সাধনার লক্ষ্য কী ইত্যাদি। আর আমার নিজের কথা এই যে, তোমার সাধনা সফল করতে আমার হৃদয় সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে জেনো।)

॥ চৌত্রিশ ॥

গুরুসেবা করে যে যেমন পারে। আমি নানাভাবেই শ্রীঅরবিন্দের মহিমার দিকে বিশেষ ক'রে আমার নানা বন্ধু বান্ধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতাম। অনেককে বহু ব্যাখ্যা ক'রেও বোঝাতে পারি নি যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে জীবনকে বাতিল করেন নি, কবিতা গান সাহিত্য এমন কি হাসিও তাঁর যোগে অস্পৃশ্য নয়। তিনি বাইরে দেখতে গুরুগম্ভীর একথা অনস্বীকার্য—তাঁর লেখায় হাসির কোনো সুদূর প্রতিধ্বনিও মেলে না—মানি। তবু বলবই বলব যে তিনি শুধু যে স্বভাবে রসিক ছিলেন তাই নয়, হাসির মোক্ষম জবাব দিতে জানতেন পাল্টা হেসে। আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME স্মৃতিচারণে আমি একটি অধ্যায়ে তাঁর নানা হাসির ফুলঝুরির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়েছি। এ-দৃষ্টান্তগুলি প'ড়ে এক ধর্মিষ্ঠা ইংরাজ মহিলা মর্মাহত হ'য়ে আমাকে লিখেছিলেনঃ "করেছ এসব কী প্রগল্‌ভতা! ছি ছি! মনে রেখো খৃষ্টদেব কখনো ভুলেও হাসেন নি।" তাকে লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল: কিন্তু কৃষ্ণ হাসতে জানতেন। তবে ভাবলাম কাজ কী? একেই তো কৃষ্ণের নিন্দায় ওরা পঞ্চমুখ—তার উপর হাসির দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠবে তাঁর উপর। তাই তার অশান্ত মনকে শান্ত করতে লিখলামঃ "আপনি না হয় শ্রীঅরবিন্দের হাসির অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বইটি নতুন ক'রে বাঁধাবেন।"

সৌভাগ্যের বিষয়, কৃষ্ণভক্তেরা কেউই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী-সংবাদ অধ্যায়টি কেটে বাদ দিতে চান নি। এ-অধ্যায়টিতে কৃষ্ণের যে রসিকতার পরিচয় পাই তা এত উপভোগ্য যে শ্রীঅরবিন্দের রসিকতার গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে অবান্তর হবে না।*

একদা শায়িত কৃষ্ণকে রুক্মিনী যখন পাখা নিয়ে হাওয়া করছেন তখন কৃষ্ণ হঠাৎ তাঁকে ব'লে বসলেন গম্ভীর মুখেইঃ

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥

* আমার "কৃষ্ণকথাকাহিনী" দ্রষ্টব্য—১৪৫-৬ পৃঃ।

অর্থাৎ (আমার ম'ত)

যাদের পথ যায় না জানা—চলে আপন খেয়ালে,
দুঃখ সয় জায়া তাদের কণ্ঠে মালা পরালে।

কেন? কারণ—

আমরা সখী চির উদাসী, নারীতে মন ভরে না

কাজে কাজেই ভেবে দেখ :

যাহার নাই ঘর—সে কী বা করিবে ল'য়ে ঘরণী?
হৃদয়ে সাম্রাজ্য যার সে কবে চায় ধরণী?
দীপশিখার ম'ত সে শুধু বিলায় জ্যোতি নিয়ত
যে লভে জ্যোতি—নয় শিখার প্রিয় বা অপ্রিয় তো।

রুক্মিনী দেবী এমন পরিহাসকে পরিপাক করতে পারলেন না :

কমলকর হ'তে ব্যজনী পড়ে খসি', তন্বী দেহলতা কাঁপিয়া উঠি'
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা হ'তে তিনি মূরছি' পড়িলেন ধূলায় লুটি'।

কৃষ্ণ অপ্রস্তুত! কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি রসিক তো, তাই

হেন প্রেমের হরি লভি' নিদর্শন নিলেন সবলারে বক্ষে তুলি'—
হাসির লঘুমেঘে অশনিটঙ্কার শুনি' যে শঙ্কায় ওঠে আকুলি',
তাহার হৃদয়ের ব্যথার ব্যথী হাসি' রাণীরে কহিলেন গাঢ় প্রণয়ে :
"জানিত কে বা হায়—প্রিয়ের পরিহাসে প্রেয়সী মূরছায় অহেতু ভয়ে?
ক্ষমো লো অপরাধ—তোমাকে ব্যথা দিতে করি নি কৌতুক প্রগল্‌ভতা,
তোমাকে অনুময়া 'রাসকা' চেয়েছিনু দেখিতে—শুনি' হেন রসাল কথা
কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের নীলাভা রাঙা হয়—তাহার পরে
রোষকটাক্ষের শায়ক ছোটে—ঝরে মোহন ঝঙ্কার স্ফুরিতাধরে,
কেমন সুন্দর ভ্রূকুটি ফোটে অভিমানিনী-মুখে—ছিল দেখিতে সাধ,
সুপ্ত রেখেছিনু যে-সাধ বহুদিন—জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ!
তোমারে করি সখী, তবুও নিবেদন—বণিতা সাথে বঁধু এ-সংসারে
যেটুকু কাল যাপে মঞ্জু পরিহাসে সে বহুবাঞ্ছিত প্রেমবিহারে।

(তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর ভ্রূকুটীতটম্ ॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি!)

কৃষ্ণকে নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা আরো কত রসাল গল্পগাছা করেছেন হাসির ভরা পালে! গীতায় অর্জুনও বলেছিলেন: "কত না তোমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করেছি প্রভু, না জেনে তুমি কে?" কৃষ্ণের উপাধি—রসরাজ রসসাগর রসিক চূড়ামণি—এমন কি তাঁকে জেরা ক'রে অপ্রস্তুত করতেও রাধিকার বাধে নি।

এ-হেন রসময়ের ভক্ত আমি কেমন ক'রে স'য়ে থাকি গুরুদেবের গুরুগম্ভীরতা? বৎসরে চারটি বার মাত্র দর্শন—মিনিট খানেকের জন্যে, তাও সয়, কিন্তু তখনো গম্ভীরানন? না এ-হ'ল দুঃসহ "শেষ খড়"—লিখলাম গুরুদেবকে, যা থাকে কপালে ব'লে। উত্তরে তিনি লিখলেন—আচ্ছা, পরের বার হাসবেন সুসহ হ'তে।

পরের বার গেলাম দর্শনে! হা হতোস্মি! সেই চিরন্তন গম্ভীর মুখ—যথাপূর্বং তথাপরম্—দেখলে মন দ'মে যায়। আমার পিছনে ছিলেন শ্রীঅনিলবরণ রায়। তিনি আমাকে বললেন: "সে কি! গুরুদেব আপনাকে দেখে তো খাসা হেসেছিলেন—আপনি বুঝতে পারেন নি।" আমি করজোড়ে বললাম: "সাধকপ্রবর! আমি সুপ্রামেণ্টাল বুঝতে না পারতে পারি, কিন্তু হাসির রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য কুলতিক হাসিও বুঝতে অক্ষম একথাও যদি মেনে নিতে হয় তাহ'লে আমার কোমল প্রাণ কি আর সইতে পারবে? অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে দরবার করতে তিনি আমাকে লিখলেন: "আমি তোমার পানে সত্যিই হাসিমুখে চেয়েছিলাম—তবে সে-হাসি কিছু গান্ধির মতন বালহাসি (childlike smile) বা রবীন্দ্রনাথের মতন দীপ্ত হাসি (radiant smile) ছিল না।" ভাবটা এই যে, he smiled as best he could. কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, লিখলাম: "আপনার পায়ে পড়ি এর পরের বার যেমন হাসি হাসতে চান হাসবেন কেবল এমন হাসি হয় যেন যাকে হাসি ব'লে সনাক্ত করতে পারি।" বলে তাঁকে একটি উদাহরণ দিলাম:

গুরুদেব,

একদা হনুমান দ্বারকায় উপস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণের রাজসভায় বলেছিলেন: কৃষ্ণ রুক্মিণী রাজা রাণী এ চলবে না, কারণ যদিও

শ্রীনাথো জানকীনাথো অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥
শ্রীনাথ জানকীনাথ যে অভেদ পরমাত্মায় জানি গো মনে,
তথাপি হনুর প্রাণাধিপ শুধু রাম সীতা, তাই চরণতলে
এ-মিনতি—আজ রাম সীতা রূপ ধরি' বোসো দোঁহে সিংহাসনে,
নহিলে এ-সভা ভেঙে চুরে ফের লঙ্কাকাণ্ড করিব পলে।

তাতে নাকি কৃষ্ণ মহিষী রুক্মিণীকে বলেছিলেন :

"কী করি হে রাণী ? পরমভক্ত হনুর মান তো রাখিতে হবে :
তাই তুমি ধরো সীতার মূরতি, আমি হই রাম সগৌরবে।"

শেষে জুড়ে দিলাম : "গুরুদেব, একথার উত্তরে আপনি অবশ্যই লিখতে পারেন—একশোবার—'কলির দিলীপ কি দ্বাপরের হনুমানের ম'ত ভক্ত যে তার মান না রাখলেই নয় ?' উত্তরে আমি শুধু বলব : 'তা বটে। কিন্তু দয়া ক'রে একটিবার ভাবুন—বীর হনুমান কী চেয়েছিলেন, আর বেচারী দিলীপ কী চাইছে। তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণ রুক্মিনীর রামসীতায় ভোলবদল আর আমি চাইছি মাত্র শ্রীমুখের এক টুকরো সুবোধ্য হাসি।"

(এ-গল্পটি পরে পুনায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে করেছিলাম—তিনি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন—"স্মৃতিচারণ ২য়ভাগ" দ্রষ্টব্য)

আমার এই মোক্ষম "প্রসভোক্তি"-র পরে যাকে বলে the ice was broken—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ও পরিহাসের আসরে নেমেছিলেন নপা ক'রে।

কিন্তু একটু ভুল বলেছি, কারণ বরফ অনেক আগেই ভেঙেছিল নানা বিশ্রম্ভালাপের প্রসাদে—কতরকম আলোচনা যোগ, কাব্য ছন্দ এ ও তা। ফলে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপের সম্বন্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল স্বচ্ছ সহজিয়া। এ আমার কল্পনা নয়। তাঁর একটি দরদী চিঠি উদ্ধৃত করি আমার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে। তিনি লিখেছিলেন :

"I was a little taken aback by the first letter, for my remarks about X had been perfectly casual and I attached little importance to them when I wrote them. I would certainly not have written them if I had thought they were of a kind to cause trouble to you. In scribbling them I had no idea of imposing my views about X on you--I had no idea of writing as a Guru to disciple or laying down the law, it was rather as a friend to a friend expressing my ideas and discussing them with a perfect ease and confidence. Both the Mother and myself nave a natural tendency to speak or write to you in that way, expressing the idea that comes without measuring of terms or any *arrie`ve-pense'e* because we feel close to your psychic being always and that is the relation we have quite naturally with you."

[ভাবার্থ : আমি অমুকের সম্বন্ধে তোমাকে লিখেছিলাম এম্‌নিই—একবারও

মনে হয় নি তার কোনো গুরুত্ব আছে। আমি কখনোই লিখতাম না আমার মন্তব্য যদি জানতাম তার ফলে তুমি কিছু মনে করবে। আমি অমুকের সম্বন্ধে আমার মত লিখেছিলাম এ ভেবে নয় যে, তোমাকে সে-মত গ্রহণ করতেই হবে। আমি তোমাকে লিখেছিলাম সেভাবেও নয় যেভাবে গুরু লেখে শিষ্যকে—লিখেছিলাম যেমন বন্ধু লেখে বন্ধুকে—তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে। শ্রীমা ও আমি এই ভাবেই তোমাকে লিখি বা তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে থাকি—যা মনে আসে তা-ই লিখে যাই একটানা, না ভেবেচিন্তে—কারণ তোমার চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বরাবর আমরা এমনি সামীপ্যই বোধ ক'রে থাকি।]

কার সম্বন্ধে তিনি কা লিখেছিলেন আমার মনে পড়ছে না। তার একটা কারণ, অনেকের সম্বন্ধেই তিনি আমাকে এইভাবে লিখতেন আমার প্রশ্নের বা মন্তব্যের উত্তরে—নিজে গুরুর বেদীতে চ'ড়ে আমাকে পদতলে বসিয়ে তার কথামৃত পান করতে হুকুম করেন নি কোনোদিনই *de haut en bas.* তার এহেন করুণাকেও আমি ভুল বুঝতাম সময়ে সময়ে—ভাবতে আজো আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে।

তবে মনে আছে, আমি তাঁর জবাবদিহি চেয়েছি তিনি এমন কথা মনে করলে আমি ভারি দুঃখ পাব, এ-অনুতাপ প্রকাশ করেছিলাম। ক্ষমার অবতার তিনি ক্ষমাও করেছিলেন যেমন বারবারই করতেন ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝে।

এবার ফিরে আসি তাঁর রসালাপের প্রসঙ্গে।

আমার স্নানাগারের উপরের কাঠে আমার মাথা ঠুকে গিয়ে—বেশ কুলের মতন ফুলে উঠেছিল কেশহীন কপাল। ঠাট্টা ক'রে তাঁকে লিখলাম বামন চন্দুলালের কীর্তি। গুরুদেব হেসে লিখলেন: "তোমার মাথা ঠুকে গেছে! আহা!··· কেবল এইটুকু বলা চলে তার ওকালতি করতে যে, সে মানবক হওয়ার দরুণ ভুলে যায় যে, আশ্রমে এমন সাধকও আছেন যাঁদের শীর্ষ উচ্চতর ও স্কন্ধ প্রশস্ততর।" ("You struck your head against the upper sill of the door our engineer Chandulal fixed in your room ?···May I suggest, however, if it is any consolation to you, that our Liliputian engineer perhaps measured things by his own head, forgetting that there were in the Ashram higher heads and broader shoulder ?")

কখনো কখনো তিনি হাসির মধ্যে দিয়ে গম্ভীরকে ফুটিয়ে তুলতেন। নীরদ একদা তাঁকে নানা ভাবে চ্যালেঞ্জ করত তার শ্লেষ উপভোগ করতে। (সেসব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।) একবার আমি তাঁকে লিখলাম যে যদিও আমি স্বভাবে বিষম রাজসিক তবু আমি সত্যিই চাই কর্মবিমুখ হ'য়ে ধ্যান ধারণা ক'রে

সরাসর সমাধিতে ডুবে বুঁদ হ'য়ে থাকতে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উদাহরণ দিলাম: তিনি বলতেন কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী তার কাজকর্ম কমিয়ে দেয় উত্তরোত্তর—যতই তার প্রসবের দিন কাছে আসে।

উত্তরে তিনি লিখলেন*: "তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের নজির দিয়ে আবাব আমাকে কাবু করতে চাইছ। কিন্তু আমি কেমন যেন ধাঁধায় প'ড়ে যাই তাঁর আর একটি উপমায় যে, শূন্য কলসী পুকুরে ডুবোলে ভক ভক করে কিন্তু পূর্ণ হওয়ামাত্রই সে নীরব হ'য়ে যায়। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যখন অক্লান্ত আলাপ করতেন তখন কি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ কলসী অর্ধপূর্ণ হ'ত, না বলবে—সে-কলসী আদৌ পূর্ণ ছিল না? কথাবার্তা কওয়াও তো কর্মের মধ্যেই পড়ে। ··

"তুমি লোকহিতসাধনা, কর্মসাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছ। এসব আদৌ আমার যোগের অঙ্গ নয়। আমি কোনোদিনই মনে করি নি যে, কংগ্রেসের নানা কর্মভঙ্গি, বা কাঙালী বিদায় বা চমৎকার কবিতা লেখার ফলে আমরা রাতারাতি বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্মনির্বাণে পৌঁছে যাব। তা যদি হ'ত তাহ'লে রমেশ দত্ত বা বদলেয়ার সিদ্ধি লাভ ক'রে আমাদের ডাক দিতেন উর্ধ্বলোক থেকে। কর্মের মাধ্যমে বা নিছক কর্মে বস্তুলাভ হয় না—কর্মের পিছনে ভাগবতী ইচ্ছার সমর্থনই কর্মযোগের প্রাণের কথা।

"পরিশেষে, কেন তুমি মনে করলে যে, আমি ধ্যান বা ভক্তির বিরোধী? আমার একটুও আপত্তি নেই যদি তুমি উভয়কেই বা দুয়ের একটিকে বরণ ক'রে ভগবৎমুখী হ'তে চাও। আমার কথা শুধু এই যে, কর্মকে বরখাস্ত করতে চাওয়া ভুল বা তাঁদের এজাহারকে বরখাস্ত করা অন্যায় যাঁরা কর্মযোগের মধ্যে দিয়েই আপ্তকাম হয়েছেন—জনকপ্রমুখ অনেকেই কর্মের মাধ্যমেই 'সংসিদ্ধি' লাভ করেছেন, গীতায় বলে নি কি?

"তাই আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি ধ'রে নিলে যে, কর্মসম্বন্ধে আলোচনায় আমি রাগ করেছি? আমি নীরদকে নিশানা ক'রে তীরন্দাজি করেছিলাম বিরক্তি থেকে নয়, শুধু একটু মজাদার কথা বলতে তথা কর্তব্যবোধে। সে-উদভ্রান্ত তার্কিক যখন তার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সূত্রের পাঠ দিতে দুঃসাহসী হ'য়ে আমার অবিনশ্বর দর্শনকে খারিজ করতে চাইল তখন আমি এক লাফে তার টুঁটি চেপে ধ'রে উপাদেয় হত্যাকাণ্ডের প্রবর্তন না ক'রে করি কী বলো?"

এইভাবে গুরুদেব তাঁর চটুল ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে দিয়েও কখনো কখনো গুরু গম্ভীর আলোচনা ক'রে আমাদের নিরস্ত করতেন আমাদের স্তরে নেমে। কিন্তু

---

* আমি তাঁর মূল চিঠির ভাবার্থ দিলাম। এ-চিঠিটি ছাপা হয়েছে আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME-র দশম অধ্যায়ে—তৃতীয় সংস্করণে। সব চিঠির আদ্যন্ত উদ্ধৃত করার স্থানাভাব।

মুস্কিল এই যে, ইংরাজী রসিকতার বাংলা তর্জমা অত্যন্ত কঠিন। তবু কিছু নমুনা দিতে চাই আগে থেকে কবুল ক'রে যে, আমার অনুবাদের অনেক খুঁৎ আছে—যাঁরা তাঁর রসিকতার পূর্ণস্বাদ পেতে চান তাঁরা যেন আমার বা নীরদের স্মৃতিচারণ পড়েন—তাঁর অবিমিশ্র রসধারা পান করতে মূল ইংরাজীতে?

এবার পালা আসুক নির্ভেজাল রসিকতার।

একদা আমি এক গদভবিলাপ কাহিনী শুনে একটি কথিকা লিখি হাল্কা ছড়ার পত্রে: শ্রীঅরবিন্দেষু

গাধা এক চলল ভেসে নিরুদ্দেশে উদ্দাম বন্যাধারায়
কেঁদে সে ডুকরে ওঠে: "ঢেউরা ছোটে এ-ধরা ডুবল যে হায়!
তটে এক জ্ঞানী বলে: "গাধা হ'লে কী যে কুযুক্তি ফাঁদে:
ডুবলে তুই এ-ধরায় কী আসে যায়? রবে সব অপ্রমাদে।"
তার্কিক গাধা ভনে: "ভাই, কেমনে একে কুযুক্তি মানি?
যদি আমিই ডুবে যাই, বাকি সবাই কেমনে টিকবে জানি?"
জ্ঞানী কয়: "আমি জানি, তাই বাখানি ভরসার তত্ত্ব তোরে।"
গাধা গায়: "এ-তত্ত্বে হায় কী আসে যায়—যদি যায় গাধাই মরে?"

গুরুদেব! ধমাকয়ো না। আর, দিও না উড়িয়ে হেসে আমার কথা।
হ'ল মন তর্ক বিলাপ শুনে খারাপ, প্রাণে জাগে গভীর ব্যথা।
জিৎল কে এখানে—বলো? মানে গর্দভের না জ্ঞানীর বিচার?
পড়েছি কী ফ্যাসাদেই—ভাবতে গেলেই আলোয় ছেয়ে আসে আঁধার।
জ্ঞানী কয়: "দূর বেল্লিক! দিই তোকে ধিক্, গাধা গাধাই, জ্ঞানীই জ্ঞানী।
গাধা নাম রটল রে যার—জ্ঞান কোথা তার? অবোধ ব'লেই তাকে মানি।"
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুদ্ধি চড়াৎ ক'রে উঠে পুছল যা—তা
বলব? (কই গোপনেই) প্রশ্নটা এই—জ্ঞানীও কী হয় তর্কে গাধা?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন এক গভীর পত্র (অনুবাদ দিই আগে):

দিলীপেষু,

তোমার ঐ জ্ঞানী গাধা (বিষম জ্ঞানী নয়, তবু) যে প্রশ্নলেঠা
তুলেছে, হায় সে-ফ্যাসাদ নয়ক বড় কেও কেটা।
শুধু তার হ'য়ে উকিল বলব: মোটেই নয় বেচারীর বুদ্ধি মোটা,
কেমনে কাজ গুছোতে হয়—জ্ঞানে সে, তবু খোঁটা

তাকে দেয় কেন মানুষ "গাধা" ব'লে ? নিজেই বোকা ব'লে বেটা,
যেহেতু মেরেও হাসিল করতে নারে চায় সে যেটা।

আসলে, দুই কারণে কিন্তু গাধার হ'ল এমন রীতি-আচার :
এক, সে সাঁচ্চা রসিক—চায় খুঁচোতে—যাতে ধাতার
দ্বিপদী জন্তুটি এই ঘোর অদ্ভুত সঙের মতন করে ব্যাভার ;
দ্বিতীয়, মানুষ তাকে করতে বলে যে-কাজ—সেটার
সে খুঁজে পায় না মাথামুণ্ড কোনো, তাই মান তার মুখ করে ভার—
ভেবে : "এ-কাজ করা কি উচিত কোনো ভদ্র গাধার ?"

অপিচ, গাধা দেখ, বাস্তবিকই ফিলসফার চরাচরে :
যখনি ডাক ছেড়ে সে চেঁচায় তার উদাত্ত স্বরে—
করে সে প্রচার শুধু গভীর কৃপা বিশ্ব ও মনুষ্য 'পরে ;
কেন না নেইক আমার তিল সংশয় এ-অন্তরে :—

যে-হাসি আমরা হাসি বলতে "গাধা" ব্যঙ্গ ডাকে,
গাধাও বলতে "মানুষ" সেই হাসি রোজ হেসে থাকে।
অথ, এই মৌলিক সুগভীর গবেষণায় দেখছ—প্রসঙ্গত—
যে, তোমার এই বিচারে গাধা-প্রেমে নেই কো তেমন ভয় অন্তত।

জানি, এ-ছড়ার অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী ব্যঙ্গের চমৎকারিত্ব ফোটে নি, ফুটতে পারে না। তবু কিছুটা আমেজ মিলবে আশা করি ব'লেই এ-পাঠ দিলাম। যাঁরা তাঁর ব্যঙ্গের পূর্ণ স্বাদ চান তাঁদের জন্যে উদ্ধৃত করছি তাঁর মূল পত্রটি :

Dilip,

Your wise but not overwise ass has put a question that cannot be answered in two lines. Let me say, however, in defence of the much-maligned ass that he is a very clever and practical animal and the malignant imputation of stupidity to him shows only human stupidity at its worst. It is because the ass does not do what man wants him to do, even under blows, that he is taxed with stupidity. But really the ass behaves like that first because he has a sense of humour and likes to provoke the two-legged beast into irrational antics, and, secondly, because

he finds that what man wants of him is quite a ridiculous and bothersome nuisance which ought not to be demanded of any self-respecting donkey. Also the ass is a philosopher. When he hee-haws, it is out of a supreme contempt for the world in general and for the human imbecile in particular. I have no doubt that in the asinine language "man" has the same significance as "ass" in ours. (These deep and original considerations are however by the way—merely meant to hint to you that your balancing between a wise man and the wise ass is not so alarming a symptom after all.)

Sri Aurobindo
(29.1.34)

* * * *

আমার এক বন্ধুর ডাক নাম বিন্দু। এখনো সে বেঁচে বর্তে আছে কলকাতায়। পণ্ডিচেরি আশ্রমে সে মাঝে মাঝে আসত ও গুরুদেবের জন্যে একটি দুটি তরকারি রাঁধত। একদিন সে আলুর ঝোল—stew—এবং পরমান্ন রেঁধে পাঠায়। পাত্রদুটি ফিরে আসে। গুরুদেব অল্পই গ্রহণ করেছিলেন। বিন্দু তাঁকে লেখে: "Nalina brought me back the dishes. I was stunned to find that you had hardly touched them. I am deeply pained, sorely disappointed, utterly dejected and cannot imagine why you are so unsympathetic to me."

(নলিনা আমাকে পাত্রগুলি ফিরিয়ে দিল। আমি মর্মাহত হয়েছি—আপনি প্রায় কিছুই খান নি। কেন আপনি এমন বেদরদী হ'লেন আমি ভেবে পাই না।)

গুরুদেব উত্তরে তাকে লিখলেন: "তোমার প্রতি আমাদের দরদ নিবিড় ও নিখুঁৎ, কিন্তু তাকে মাপা চলে না তোমার রান্নার প্রতি আমাদের দরদ দিয়ে। তোমার পরমান্ন খেয়ে মনে পড়ল প্রেমিকের সম্বোধন প্রেমিকাকে: 'মরি মরি! কী মিষ্টি—কী মিষ্টি—কী মিষ্টি!' তোমার আলুর ঝোলও অসামান্য, যদিও অন্য স্বাদের। প্রথম চামচ আমি মুখে দিলাম সোদ্বেগে, দ্বিতীয় চামচ ভয়ে ভয়ে। তার পরে এ-অজানা রাজ্যে আর বেশি এগুতে ভরসা পেলাম না।"

এ-হেন মহাপাচক বিন্দু একদিন আমাকে চ্যালেঞ্জ করল রাঁধতে। বলল: "কবিতা! ফুঃ! যদি রাঁধতে পারতে গুরুদেবের জন্যে তবে বুঝতাম।" আমি

রুখে উঠে বললাম: "আমিও পারি রাঁধতে। ফুঃ। খুব সোজা।" ও বলল: "আচ্ছা রাঁধো দেখি।" আমি বললাম: "নিশ্চয় রাঁধব।" ও বলল: "কিন্তু একলা রাঁধতে হবে—আর কাউকে যদি হাত লাগাতে দাও—"আমি বললাম: "না দেব না। একাই রাঁধব।"

কিন্তু তারপর ভয়ে সারা। হাসি মস্করায় যা খুশী বলা চলে—কিন্তু গুরুদেবকে তো আর যা তা রান্না রেঁধে পাঠানো চলে না। অথচ কথা দিয়েছি—একাই রাঁধব। কী করি! হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল: শরণ নিলাম এক রন্ধন নিপুণা সাধিকার, নাম অমিয়া। তাকে বললাম: "তুমি সামনে ব'সে আমাকে নির্দেশ দাও কী কী করতে হবে—কিসের পরে কী মশলা…ইত্যাদি।" সে হেসে রাজী হ'য়ে আমাকে বলতে থাকে আর আমিও আদিষ্টবৎ রেঁধে চলি এক স্টোভের উপর কড়া চাপিয়ে।…প্রায় আধঘণ্টা পরে টোমাটো, মটরসুঁটি, পেঁয়াজ, আলু… ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি গব্যঘৃত ঢেলে রেঁধে পাঠালাম গুরুদেবকে—চিঠিতে লিখে যে আমি একাই রেঁধেছি—কেবল অমিয়া ফিশ ফিশ ক'রে নির্দেশ দিয়েছিল (whispers)।

পরদিন গুরুদেব লিখলেন: "Your cooking is remarkable and wonderful! If you had not disclosed the secret about Amiya's 'whispers' I would have been inclined to claim it as a *yogic miracle.* Even with the 'whispers' it is an astonishing first success!

Ashcharyavat pashyati kashchit enam, as the Gita says."

(দিলীপ, তোমার রান্না আশ্চর্য, অপূব। তুমি যদি অমিয়ার ফিশফিশ-ক'রে-বলা নির্দেশের গুহ্য কথাটা উহ্য রাখতে তাহ'লে আমি একে যৌগিক অঘটন ব'লে জাহির করতাম।…গীতার কথা মনে পড়ে: কেউ কেউ একে দেখে বলে—আশ্চর্য!)

* * * *

কখনো কখনো আমি টেলিগ্রামের ছন্দে চিঠি লিখতাম মজা ক'রে। একদা লিখলাম: "গুরু, পাঠাচ্ছি আমার আকৃতি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ। দেখে দেবেন? চলবে? গড়পড়তা? বাজে? সোজা জবাব চাই, দোহাই! রাহাজার চিঠিটি ফেরৎ দিলেন না। দেবেন না? নিশ্চুপ কেন? কী হয়েছে? সেতু-বাঁধা? সুপ্রামেণ্টাল? মন উড়ুক্ষু?"

পরদিনই এল তাঁর উত্তর গানের প্রতিধ্বনির মতন: "আমি দেখব তোমার অনুবাদটি মাজাঘষা করবার যদি সময় পাই। কিন্তু তুমি ইংরাজী কবিতায় খুব উন্নতি করেছ দেখছি। এত দ্রুত প্রগতির হেতু? যৌগিক শক্তি? আন্তর অগ্নি-

প্রেরণা? অবচেতন? রাহনার চিঠির হঠাৎ পুনরভ্যুদয় হয়েছে। ভুতুড়ে লীলা? তোমার অন্যমনস্কতা? আমার?”

*　*　*　*

একদা আমি লিখলাম: “গুরু! সম্প্রতি আমি আদৌ ধ্যানে মন বসাতে পারি নি—পর্বতপ্রমাণ প্রুফের জন্যে। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, ফের ধ্যানে বসলাম ব'লে—সাবধান!”

গুরুদেবের পিঠ পিঠ জবাব: “পবত প্রমাণ প্রুফের পরে পর্বতপ্রমাণ ধ্যান—যে পর্বতের শিখরে আসীন ‘বাবা’? বহুৎ আচ্ছা। আমি হব তোমার মুখোমুখি।”

*　*　*　*

“গুরু, তিন তিনটি চমৎকার সুখবব: প্রথম, আবুল ফজল নামে এক মুসলমান সাহিত্যিক—আমাকে অভিনন্দন করেছেন। দুই, এক মহাপণ্ডিত আমার বাংলা উপন্যাস ‘দোলা’-র প্রশংসা করেছেন। তিন, এক জমিদার আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন একটি অভিনন্দন-পত্র জনৈক স্থানীয় ডাক্তারের জন্যে—যিনি রাজ সমাদৃত।”

“দিলীপ, আমার সহানুভূতি। আবুল ফজল ও মহাপণ্ডিতের জন্যে সাধু সাধু সাধু। কেবল ডাক্তার ‘রাজসমাদৃত’ হ'লেও আমি উজিয়ে উঠতে পারছি না। এ আমরা চলেছি কোথায়? (অনুরোধ: নীরদকে বোলো না একথা) তবে হয়ত এর মূলে আছে এই প্রসিদ্ধি: ‘ডাক্তারকে মান দাও যদি দীর্ঘজীবী হ'তে চাও।’ অপিচ তোমার মতন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে এজন্যে ধরা সমীচীন বৈ কি। তুমি একটি দীর্ঘ মানপত্র লিখবে নিশ্চয়ই দাওয়াইয়ের রোমান্স সম্বন্ধে, প্রথমে ধন্বন্তরীর তারপর চরক গ্যালেনের (Galen) গুণগান ক'রে, শেষে উপসংহার করবে ডাক্তার নীরদ তালুকদার তথা রামচন্দরের প্রসঙ্গ এনে। · শ্রীঅরবিন্দ”

*　*　*　*

“গুরু, আপনি সবশুদ্ধ কজনকে স্পেশাল অনুমাত দিয়েছেন প্রত্যহ আপনাকে পত্রাঘাত করতে? নীরদ গোপনে বলল: ১২১ জনকে। বিন্দু বলল: ‘না, মাত্র ৯৭ জনকে’—এখন সাধকদের সংখ্যা বুঝি ১৫০?”

“দিলীপ, খোলাখুলি যাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা সংখ্যায় দুজন—মানে, কতকটা উহ্য ভাবে গৃহীত। জরুরি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে দুজনকে। আর দুজন—স্বনির্বাচিত লেখক। ৯৭ বা ১২১ জন রোজ পত্রাঘাত করলে আমাকে গোবি মরুভূমি বা মানস সরোবরে মহাপ্রয়াণ করতে হ'ত···শ্রীঅরবিন্দ।”

*　*　*　*

"গুরু, শ্রীল সুনিশ্চিত শর্মা আজ আমার কাছে এসে সে কী বক্তৃতাই করলেন: তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য দৈবী শক্তি সক্রিয় হয়েছে যার ফলে তিনি সফল হয়েছেন গুরু চরণে আশ্চর্য আত্মসমর্পণ করতে। শুনে আমি অভিভূত। আপনি?"

"দিলীপ, তিনি যখন তাঁর মধ্যে অন্তর্গূঢ় শক্তির কথা বলতে উচ্ছ্বসিয়ে ওঠেন তখন আমার মনে হয়—আহা, যাঁরা এত আশ্চর্য তাঁরা তাঁদের আশ্চর্যতার সম্বন্ধে একটু কম বাগ্মী হ'লে মন্দ হত না। আত্মস্তুতির এহেন আতিশয্য যে মানুষকে কোন্ আঘাটায় টেনে নিয়ে যায় কেউ কি জানে?···শ্রীঅরবিন্দ।"

* * * *

আমি সাধনায় ত্বরিৎ প্রগতি লাভ করতে চেয়ে মাঝে মাঝেই ভাবতাম "কঠোর" করা দরকার—বড় বেশি আরামে আছি ব'লেই হয়ত ধ্যানধারণায় আমার মন বসছে না—কর্মের নাগপাশে বাঁধা পড়ছি। ভেবেচিন্তে স্থির করলাম কী ভাবে কঠোর করতে চাই গুরুদেবকে না জানিয়ে করতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে, কাজ নেই। যদি কঠোর করা আমার সাধনার অনুকূল হয় তবে গুরুদেব নিশ্চয়ই মত দেবেন। তাই তাঁকে লিখলাম যে, আমি স্থির করেছি (১৪.৯.৩৫.):

১) আমি চাপান করা ছেড়ে দেব। কারণ আমি চা ভালোবাসি।

২ পনীর (cheese) খাব না আর, কারণ পনীর আমার ভালো লাগে।

৩ স্বাদু ব্যঞ্জন সব বরখাস্ত করব। কারণ বিস্বাদ ব্যঞ্জন আমার সয় না।

৪) একাদশীতে উপবাস—মাথাও মুড়োবো।

৫) একটি মাত্র কম্বলে নিদ্রা—বালিশ না নিয়ে।

৬) মশারি না খাটিয়ে শয়ন। এইটেই হবে আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন, কারণ মশকগুঞ্জনকে আমি ঘুমপাড়ানি গান মনে করতে পারি নি কোনোদিনই। আর পণ্ডিচেরিতে বেজায় মশা।

আপনি ও শ্রীমা অনুমোদন করবেন কি?—যদিও ব'লে রাখি আমি এ-প্রার্থনা করেছি চোখের জলে—শান্তচিত্তে নয়।

গুরুদেব উত্তরে লিখে পাঠালেন: "তুমি যে-সব প্রস্তাব করেছ প'ড়ে আমি হতভম্ব! উপবাস? ওতে আমি নেই, যদিও আমি নিজে উপবাস করেছি, তাই জানি যে, উপবাসের পরে পারণে তুমি খাবে রাক্ষসের মতন। আর মাথা মুড়োবে? সর্বনাশ! তার ফল কী হবে ভেবে দেখেছ কি? এর পরে চব্বিশে নভেম্বরের দর্শনের দিনে আমার কোমল মন তোমার কঠোর মূর্তি দেখে যে ঘা খাবে—হয়ত আমি তার টাল সাম্‌লে উঠতে পারব না, কে জানে?—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু তোমার এই নিদারুণ মূর্তি দেখে কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত যে-তুমুল

আন্দোলন সুরু হবে—তার ফলে তুমি প্রখ্যাত হ'য়ে উঠবে আর এক ভঙ্গিতে তোমার অতীত খ্যাতিকে ছাপিয়ে—আর কোন্ সুলগ্নে ভেবে দেখ একবার: ঠিক যখন তুমি যশমানবর্গীয় সব অহন্তাকে জয় করতে উদ্যত! না না—বিপদ ব'লে বিপদ! আর মশারি না টাঙিয়ে ঘুম? তার মানে অনিদ্রা—অনশনের মতনই সাংঘাতিক বৈ কি! ফলে তোমার যুগল নয়ন শুধু যে ম্লান হ'য়ে পড়বে তাই নয়—হ'য়ে উঠবে ভীষণ—সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে তোমার কল্পিত বিভীষণতাকেও দুয়ো দিয়ে। না না না।

"খতিয়ে, কৃচ্ছ্রসাধন অসম্ভবের কাছাকাছি—কেবল কুঁড়ে ঘরে বা হিমালয়ে ছাড়া। বৈরাগ্যের ভিত্তি হচ্ছে নির্বাসনা অনাসক্তি—যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টি। বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধনার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে হ'য়ে ওঠে একটা বাঁধা নিয়ম মাত্র, যাকে মানুষ মেনে চলে শুধু নিয়মানুবর্তী হ'য়ে নিজেকে সাবাস বলতে—আত্মাদরের মুখরক্ষা করতে।...

"হয়ত এসব কথা শুনে তুমি ঠাওরাবে যে, আমি কৃচ্ছ্রসাধনদীক্ষার পথে যোগ্য গুরু নই—হয়ত অভ্রান্ত এ-সিদ্ধান্ত। কি জানো? আমি আন্তর নির্দেশ মেনে চলারই পক্ষপাতী, তাই মনে করি—তুমি তোমার চৈত্য পুরুষকে বাহাল করলে এত শত রুক্ষ রুদ্র ঝামেলার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

উত্তরে আমি তাঁকে লিখলাম এক মস্ত চিঠি। তার চুম্বক এই যে, আমার মনে হয়েছিল যে, যখন আমাকে অতিমানস-যোগ করতেই হবে তখন আমার সব মানস প্রবণতাকে কাটিয়ে না উঠলেই নয়।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

১৯৩৪ সালে গুরুদেবের জন্মোৎসবের দুচারদিন আগে আমি চ্যাড্উইককে প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম তাঁর একটি সদ্যোজাত চিঠি: "সনেট? আমার সনেট লেখার ফুর্সৎ নেই। নানা জরুরি কাজ আছে চিঠি লেখা ছাড়াও—ছন্দ নিয়ে লীলাখেলা এখন অসম্ভব।" ইত্যাদি।

ঠিক এই সময়ে শ্রীনলিনীকান্তগুপ্ত আমাকে এক তার দিয়ে গেলেন: "১৫ আগস্ট আপনার দর্শনের অনুমতি প্রার্থী। দিলীপ আমাকে জানে—অরবিন্দ।"

টেলিগ্রামের উপরে গুরুদেবের প্রশ্ন স্বহস্তে লেখা: "দিলীপ, জানাও ইনি কিনি আর এঁকে অনুমতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা।"

হঠাৎ আমার কলমের 'পরে দুষ্ট সরস্বতী ভর করলেন—আমি লিখলাম উত্তর

ইংরাজী ছড়ায়···যেটি আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME-তে ছাপা হয়েছে। তারি ভাবানুবাদ দিচ্ছি—কিছু কিছু বদলে ও সংক্ষেপে :

চাইলে গুরু, জানতে তুমি—এ কোন্ অরবিন্দ, যে চায়
আসতে তোমার জন্মদিনে। কিন্তু বলো, বলব কী হায় ?
চারটি অরবিন্দে জানি আমি। তোমার আদেশে তাই
গাথানি সংক্ষিপ্ত ছড়ায়, কারণ তোমার সময় যে নাই।

পয়লাটি এক মস্ত বাবু—প্রসাধনেই থাকেন লেগে,
সিঁথি সাবান বেশভূষা তাঁর কতরকম—জানে সে কে ?
বেকার—তবু গুমর ভারি, সব কিছুতেই দেন তিনি রায়,
বনিতাটি পতিব্রতা—ওঠেন বসেন স্বামীর কথায়।

দোসরাটি এক প্রেমের ফকির, ভালোবাসেন যাকে তিনি
সে-সুন্দরী চায় না তাঁকে মালা দিতে বিদেশিনী।
আমার গলা জড়িয়ে বন্ধু তাই কাঁদতেন ঘড়ি ঘড়ি :
"মন তার না পেলে দিলীপ, কেমন ক'রে জীবন ধরি ?"

তেসরাটি এক সবজান্তা থাকেন রোমে এক হোটেলে,
সেখানে ভোজ দিতেন সোমরসের দীপালিকা জ্বেলে।
হয়ত রেস্ত ফুরিয়ে গেছে—কেউ তাঁকে ধার দেয় না আজ আর,
তাই চান আবার কুবের হ'তে অতিমানস-ছোঁওয়ায় তোমার।

চৌঠাটি এক মহাপ্রবীর—ঘোষেন মন্দ্র অঙ্গীকারে :
"এক গুলিতেই বাঘ সিংহ সাবাড় করি বারে বারে।"
বিতৃষ্ণা তাঁর এসে গেছে হয়ত আজ এ-বীর্যলীলায়
শুনে তোমার অতিমানস-তূর্য এ-বিষণ্ণ ধরায়।
এঁদের মধ্যে তার করেছেন কে, গুরু, নেই আমার জানা,
অতিমানস-টেলিস্কোপে দেখে লিখো তাঁর ঠিকানা।

চ্যাডুইক ইংরাজী ছড়াটি প'ড়ে হেসে কুটি কুটি। কিন্তু তারপরেই বলল গম্ভীর হ'য়ে : "কিন্তু বৃথা দিলীপ ! **you won't be able to draw him out** (তিনি সাড়া দেবেন না) তিনি তো লিখেইছেন—তাঁর একটুও সময় নেই।"

আমি হেসে বললাম : "বন্ধু, আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এ-যুগেও অঘটন ঘটে।"

* * * *

পরদিন আমি শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘপত্রটি পতাকার মতন উড়িয়ে চ্যাড়ুইককে বললাম : "বলি নি ? দেখ এবার—নয়নভ'রে দেখ, বন্ধুবর !"

আমরা দুজনে মহোল্লাসে পড়লাম (অনুবাদ) :

"দিলীপ, তোমার অরবিন্দ-চতুষ্টয়-মহাকাব্যটি দীপ্যমান, তথ্যপূর্ণ, রোমহর্ষক। ইনি নিঃসন্দেহ চতুর্থ মহাজন—ভীমকর্মা বৃকোদর। কিন্তু অভব্য ঠাট্টা রেখে সভ্য সুগম্ভীরের পালাগানে নামা যাক।

"তাঁর ঠিকানা ? কেমন ক'রে জানব আমি ? আশ্চর্য ! টেলিগ্রামে আছে : 'অরবিন্দ, বম্বে'—যেমন আমার ঠিকানা : 'অরবিন্দ, পণ্ডিচেরি'। এর আগের পত্রে তিনি লিখেছিলেন—বম্বে থেকে নৃত্যভঙ্গে পণ্ডিচেরি এলেন ব'লে। নলিনী হয়ত জানবে তাঁর ঠিকানা। আমি জানি না—তিনি আশ্রমেই থাকতে চান কি না। মনে তো হয় না, কারণ তাঁর নাম অরবিন্দ হ'লেও ইনি-অরবিন্দ এই তিনি-অরবিন্দের বিন্দুবিসর্গও জানেন না তো। যাই হোক, আমি তোমাকে তাঁর রিপ্লাই-প্রি-পেড টেলিগ্রাম ফর্ম পাঠাচ্ছি আমার দায় তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে। তুমি তোমার অরবিন্দ সঙ্কুল প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা-সম্ভূত জ্ঞানালোকে বিচার ক'রে ঠিক কোরো কিং কর্তব্যম্। তুমি যা ভালো বোঝো কোরো—আমি নিষ্ক্রান্ত এখন থেকে। উপসংহারে আমার বক্তব্য শুধু দুটি কল্লোলিত আলেকসাণ্ড্রাইন শ্লোকে জ্ঞাপন করছি :

> বদান্য ভঙ্গিতে শির হেলায়ে করিও তার : "স্বাগত এখানে,
> কিম্বা যান যেথা চান—শ্রীকান্তের কিম্বা কৃতান্তের সন্নিধানে।"
> এ-অচিন অরবিন্দ তরে চাও যে-নির্দেশ দিও হে সুমতি !
> শুধু অরবিন্দনাম-বন্যায় এ-মজ্জমানে দিও অব্যাহতি।"

মূল পত্রটি থেকে কিছুটা পেশ করি :

> Tell him, by wire : 'Come on' with a benignant nod,
> Or leave him journeying to the devil or to God,
> Decide for the other Aurobindo what you please,
> This namesake-flooded Aurobindo leave at ease.

"In fact my Supermind is almost staggering helpless to make any decision under the weight of all these Aurobindos and others. I am told there will be 400 of them in families and singles apart from the 200 who are here, and so unless the divine

mercy descends with a greater force than the 'gentle dew' from Heaven, we may be still there receiving people till past three o'clock in the afternoon. So one Aurobindo more or less can make no difference to me. It is you who will rejoice or suffer —according as he falls on you like a ton of bricks or envelops you like a soothing zephyr in the spring.

"As for the explanation, your epic of the four Aurobindos has suddenly revealed to me why the name Aurobindo has spread and why its bearers are heading for Pondichery. I have it—eureka! And I am released from all kshobha at the violated uniqueness of my name. Your description shows that each Aurobindo represents a world-type and it is of the conglomeration and sublimation of great world-types that the supramental-terrestrial will be made. You may not have appreciated their greatness, but that is not their fault.

"Your 'epistolary frivolity' was all right. There is laughter in the kingdom of Heaven, though there may be no marriage there."

[ভাবার্থ: বলতে কি, আমার স্থপারমাইণ্ড আজ টলমল টলমল করছে এতগুলি অরবিন্দের ও আরো অনেকের গুরুভারে। শুনছি এখানে যে-দুশো জন সাধক আছেন তাঁরা ছাড়াও আরো ৪০০ দর্শনার্থী আসছেন সপরিবারে। তাই যদি দৈবী করুণা স্থভদ্র শিশিরের চেয়ে খরধারে না নামেন তাহ'লে হয়ত দর্শনপর্ব শেষ হ'তে বেলা তিনটে বেজে যাবে। স্থতরাং আর একটি অরবিন্দ বেশি বা কম হ'লে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না আমার। হাসতে বা কাঁদতে হবে, খতিয়ে, তোমাকেই: হাসবে—যদি তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করেন মলয়ানিলের মতন, কাঁদবে—যদি তিনি তোমার মাথায় ভেঙে পড়েন পাষাণ-প্রপাতের মতন।……

হঠাৎ তোমার অরবিন্দ-চতুষ্টয়-মহাকাব্যের ভাষ্য আমার মনে ঝিকিয়ে উঠল—সাফ হ'য়ে গেল—কেন অরবিন্দ নামে জগৎ ছেয়ে গেছে। আমি ধরেছি, ধরেছি, ধরেছি—ফলে আমার নামের অদ্বিতীয়তা ঘুচে যাবার দরুণ সব ক্ষোভ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছি। তোমার বর্ণিত প্রতি অরবিন্দই এক একটি জাগতিক টাইপ, আর অতিমানস-পার্থিব অভিব্যক্তি ও ঘনিমা গ'ড়ে উঠবে যাবতীয় জাগতিক টাইপের

যোগফলের প্রসাদে। তুমি হয়ত তাঁদের মহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পারছ না, কিন্তু সেজন্যে তাঁরা দায়ী নন।

তোমার লৈপিক প্রগল্‌ভতা অনিন্দনীয়। স্বর্গরাজ্যে বিবাহ না থাকতে পারে, কিন্তু হাসির স্থান আছে।*)

॥ ছত্রিশ ॥

শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী প্রতিভা ও লোকোত্তর মহিমার বর্ণনা অসম্ভব। আমাকে তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন: "Nobody can write about my life, because it has not been on the surface for man to see."

মানি। কিন্তু তবু বলব তাঁর সম্বন্ধে আমরা যত বেশি আলোচনা করব ততই লাভবান হব—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এ-স্বার্থসর্বস্ব যুগে যে এহেন ষোলো-আনা নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ জন্মাতে পারেন যিনি কেবল মানুষের হিতসাধনাকেই জীবনসাধনা ব'লে বরণ করতে পারেন অক্লান্ত ধ্যান সাধনায়, যিনি দিয়ে প্রতিদান চান না, ভালোবাসেন কেবল প্রেমেরই টানে, জানতে চান শুধু জ্ঞানের তৃষ্ণায়—সর্বোপরি যিনি দুঃসাধ্যকেও সুসাধ্য করতে ধনমানযশ এমন কি জীবন পর্যন্ত পণ করতে পারেন—এ-বিরল সত্যকে কালেভদ্রেও এক আধবার দেখলে দুঃখবাদের কিছুটা অন্ততঃ নিরসন হয়। অনেক বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকের মুখেই শুনি তাচ্ছিল্যভরা বাণী: "তিনি কী এমন অসাধ্যসাধন করেছেন শুনি?

অতিমানসের অবতরণ—এও কি একটা কথা হ'ল! কে নামল, কোথায় নামল, কবে নামল শুনি—যার কোনো প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়—দেখানো যায় মানুষ এ-সাধনা থেকে অমুক লাভ করেছে?···· "

এ-ধরণের ভ্রষ্ট-দৃষ্টি যুক্তির উত্তর দিতে চাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে তিনি একটি চিঠিতে কিছু আভাষ দিয়েছিলেন আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়। লিখেছিলেন (১৯৩৫), যে অধ্যাত্ম সত্যলোকের নানা ক্রিয়া বা ফলাফল আশু প্রকাশ করা ব্যঞ্জনীয় নয়, কেন না 'Even in ordinary, non-spiritual things the action of invisible or subjective forces is open to doubt and discussion in which there could be no material certitude—while the spiritual force is invisible in itself and also invisible in its

* খৃষ্টদেব বলেছিলেন যে, স্বর্গরাজ্যে বিবাহ হয় না, সবাই দেবদূত (St. Matthews 22. 30)

action. So *it is idle* to try to prove that such and such a result was the effect of a spiritual force. Each must form his own idea about that—for if it is accepted it cannot be as a result of proof or argument, but only as a result of experience, of faith or of that insight in the heart or the deeper intelligence which looks beLind appearances and sees what is behind them. The spiritual consciousness does not claim in that way, it can state the truth about itself but not fight for a personal acceptance."

[ভাবার্থ : এমন কি সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষেত্রেও অদৃশ্য বা ব্যক্তিগত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, বা বহু আলোচনা ক'রেও কোনো বাস্তব নৈশ্চিত্যে পৌঁছন যায় না। অপিচ, অধ্যাত্মশক্তি শুধু যে অদৃশ্য তাই নয়, তার ক্রিয়াপদ্ধতিও চাক্ষুষ করা অসম্ভব। কাজেই প্রমাণ করা বা চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা যে, অমুক অমুক ফল ফলেছে তমুক তমুক অধ্যাত্মশক্তির ক্রিয়ায়। সচরাচর প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধারণা মেনে চলে, চলুক না। কারণ আত্মিক শক্তিকে মানুষ সত্য ব'লে বরণ করে কোনো প্রমাণ বা যুক্তির এজাহারে নয়—করে তার উপলব্ধি, বিশ্বাস বা হার্দিক অন্তর্দৃষ্টির রায়ে, কিম্বা কোনো গভীরতর বুদ্ধির নির্দেশে যে উপরভাসা নয়, ডুবারি হ'তে শিখেছে। এককথায়, অধ্যাত্ম চেতনা বলে না কোনোদিনই—'আমাকে মানতেই হবে।' সে তার আত্মসত্য সম্বন্ধে সোচ্চার হ'তে পারে, কিন্তু বলে না হুহুঙ্কারে যে, তার সত্যঘোষণা প্রামাণিক বা অপ্রতিবাদ্য।]

এই কথাটি তিনি আরো প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বলেছিলেন ৪.২.৪৩ তারিখে—যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে অনেকক্ষণ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম নানা নেপথ্যশক্তি ও ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে। আমার AMONG THE GREAT-এ এ-কথালাপের বিবৃতি দিয়েছি। তা থেকে এখানে অল্প একটু অনুবাদ দিই গুরুদেবের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে। তিনি বলেছিলেন :

"যখন আমি কিছু বলি বা লিখি তখন আমি শুধু চাই আমার উপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করতে—বলি না আমার কথা সবাইকেই মেনে নিতে হবে। এত বৎসর ধ'রে আমার পরিচয় পাওয়ার পরেও কি তুমি মনে করতে পারো যে, আমি আমার জীবনদর্শন আর সবাইকে বরণ করতে বাধ্য করব? আমি কোনোদিনই সর্বেশ (dictator) হ'তে চাই নি, বা বলি না সকলের মতামতই আমার মতামতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই—যেমন আমি বলি না যে, সকলেই আমার অনুচর হ'য়ে আমার যোগে দীক্ষিত হোক।"

অথচ একদিকে তিনি ছিলেন যেমন নির্বিবাদী, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল অন্যদিকে ছিলেন তেমনি হিমালয়ের মতন অটল অচল, দ্রষ্টা ঋষি—একান্তী, অকুতোভয়। দেশের জন্যে প্রাণদান তাঁর কাছে কোনোদিনই কঠিন মনে হয় নি। যখন তিনি আলিপুর জেলে ছিলেন তখন অনেকেই তো ভেবেছিলেন যে তাঁর প্রাণদণ্ড হবেই হবে। কিন্তু তিনি ছিলেন বিনিঃশঙ্ক, নিত্যধ্যানমগ্ন—অনেক সময়ে এমন কি নাওয়া খাওয়াও ভুলে যেতেন তন্ময় সমাধিতে। সাধে কি কবিগুরু সে-দুর্লগ্নে তাঁকে নমস্কার করেছিলেন এই ব'লে ঃ

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর!

গুরুদেবের এক সতীর্থ শিষ্য বিপ্লবী উপেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামানে বারো বৎসর কাটিয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন ঃ "ভাই, কোনো মহৎ আদর্শের জন্যে এককথায় প্রাণকে বলিদান দেওয়া কঠিন মানি। কিন্তু সে-আদর্শের জন্যে একান্তী হ'য়ে বাঁচা ঢের বেশি কঠিন। আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনার ঝোঁকে হাজার হাজার সৈন্য বা শহীদই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সমস্ত মনের প্রাণের শক্তি সামর্থ্যকে কোনো মহৎ আরাধনার জন্যে একমুখী করতে পারেন কজন, বলবে আমাকে ?—মাত্র দুচারজন বিরল মহাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ এই থাকের ক্ষণজন্মা—তাকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা—চিনতে পারাও সম্ভব নয় চোখের ঠুলি না খসলে।"

আমি উপেন্দ্রনাথের কথাগুলি নিজের ভাষায়ই সাজিয়ে বললাম কিন্তু তাই ব'লে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিই নি যা তিনি বলতে চান নি। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য বিকাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার নিজেরও অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, তাঁর যথার্থ তর্পণ হ'তে পারে না এ বস্তুতান্ত্রিক, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক যুগে যার ভিত্তি ইন্দ্রিয়লব্ধ তথা বুদ্ধি সমর্থিত উপরভাসা প্রত্যয়ের পরিসংখ্যানী এজাহার—statistics : তার জন্যে চাই (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) আন্তর দিব্যদৃষ্টি যে বলে (দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপরূপ বাউলের ভাষায়)

এতদিন তো ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর্ দেশে
ডুব দিয়ে আজ চাই দেখা চাই—কতখানি গভীর জল।

এ-দৃষ্টি স্বভাববিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল কী ভাবে তার কিছু পরিচয় দিতে তাঁর একটি প্রখ্যাত পত্রের উদ্ধৃতি দিই। স্যার সবপল্লী রাধাকৃষ্ণন আমাকে একদা লিখেছিলেন—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জন্যে একটি প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে চান বিলেতে, তাতে শ্রীঅরবিন্দের একটি নিবন্ধ চাইই চাই।

শ্রীঅরবিন্দ এ-হেন সুগম্ভীর প্রস্তাবকে আমলই দিলেন না। লিখলেন আমাকে :

"Philosophy ! Let me tell you in confidence that I never, never, never was a philosopher—although I have written philosophy which is another story altogether. I knew precious little about philosophy before I did the Yoga and came to pondichery—I was a poet and a politician not a philosopher : How I managed to do it and why ? First, because Paul Richard proposed to me to co-operate in a philosophical review—and as my theory was that a Yogi ought to be able to turn his hand to any thing I could not very well refuse : and then he had to go to the war and left me in the lurch with sixty-four pages a month of philosophy all to write by my lonely self. Secondly, because I had only to write down in the terms of the intellect all that I had observed and come to know in practising Yoga daily and the philosophy was there, automatically. But that is not being a philosopher :

I don't know how to excuse myself to Radhakrishnan—for I can't say all that to him. Perhaps you can find a formula for me ? Perhaps : "so occupied, not a moment for any other work, can't undertake because he might not be able to carry out his promise". What do you say ?"

[ভাবার্থ : দর্শন ? তোমাকে চুপি চুপি বলছি শোনো—আমি কস্মিন্‌কালেও দার্শনিক ছিলাম না, ছিলাম না; ছিলাম না—যদিও আমি দার্শনিক তত্ত্বকথা লিখেছি। আমি পণ্ডিচেরি আসার ও যোগসাধনা সুরু করার আগে দর্শন সম্বন্ধে খুব কমই জানতাম আমি ছিলাম কবি ও রাজনৈতিক—দার্শনিক না। তবে কেমন ক'রে দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করলাম ? বলি প্রথমে হ'ল কি, পল রিশার এক দার্শনিক মাসিকী

প্রকাশ করার প্রস্তাব করল, আর যেহেতু আমি বলতাম যোগী সব কিছুই করতে পারে সেহেতু না বলতে বাধল। তারপরে সে আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে চ'লে গেল যুদ্ধে—ফলে আমাকে একাই লিখতে হ'ল প্রতি মাসে চৌষট্টি পাতা দার্শনিক তত্ত্বকথা। দ্বিতীয়তঃ, আমি শুধু বুদ্ধির পরিভাষায় লিখে চললাম যা আমি দিনের পর দিন যোগে উপলব্ধি করেছি। কাজেই সেখানে স্বতঃই হ'ল দর্শনের অভ্যুদয়। কিন্তু এ-কীর্তিকে দার্শনিক কীর্তি নাম দেওয়া যায় না।

কিন্তু এসব কথা তো রাধাকৃষ্ণনকে বলা চলে না। ভেবে বার করো উপায়। ধরো, যদি বলা যায়—আমি মহাব্যস্ত, হয়ত ভার নিয়ে কথার খেলাপ হ'য়ে যেতে পারে। কী বলো?]

উত্তরে আমি লিখেছিলাম তাঁকে ঘোর আপত্তি ক'রে যে, তিনি নিজেকে ফিলসফার উপাধি দিতে চান না এ অন্যায়। কারণ—লিখেছিলাম আমি—এ-যুগে যে তার মতন প্রতিভাধর দার্শনিক আর জন্মায় নি একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আমার এ-আপত্তির উত্তরে তিনি কিছু লিখেছিলেন কি না মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে আমি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজেকে রাজনৈতিক (politician) না ব'লে বিপ্লবী বললে আমরা সবাই সানন্দে সায় দিতে পারতাম।

তবে তিনি যে শুধু কবি নন, মহাকবি, এ-সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। পরে যখন তার "সাবিত্রী" প্রকাশিত হয় তখন এ-সম্বন্ধে আরো বহু কাব্যরসিক সায় দিয়ে তার কবিপ্রতিভার জয়ধ্বনি করেছিলেন। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ছাত্রদের এক উৎসাহী সভায় সাবিত্রী সম্বন্ধে ভাষণ দিতে আহূত হ'য়ে বলেছিলাম: "আজকের দিনে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণতঃ মহাবিপ্লবী মহাদার্শনিক ও মহাযোগী ব'লেই প্রখ্যাত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে লোকে মানবেই মানবে যে তিনি মহাকবিও বটে—যেহেতু সাবিত্রী আসলে শুধু মহাকাব্যই নয়, এপিকবর্গীয় কাব্য।"

কিন্তু সে যাক, কিছুদিন পরে স্যার রাধাকৃষ্ণন আমাকে আবার ধরলেন। তখন আমি বেশ একটু ক্ষুব্ধ হ'য়েই লিখলাম গুরুদেবকে: "গুরু! কিন্তু বেচারা আমাদের কেন বিষণ্ণ করছেন অকারণ? আমরা চাই ওদেশেও আপনার নামডাক হোক। তাই আমি বলব যে, স্যার রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলেছেন—আপনার লেখা উচিত। আমি তাকে লিখেছি একথা যে তাঁর অনুরোধ মাদৃশ বহু সুবোধের সুযুক্তিরই সমর্থন আছে।"

কিন্তু গুরুদেব হিমালয়ের মতন অটল! লিখলেন:

"Dilip,

As to Radhakrishnan, I do not care whether he is right or

wrong in his eagerness to get the contribution from me. But the first fact is that it is quite impossible for me to write philosophy to order. If something comes to me of itself, I can write, if I have time.······And the second fact is that I do not care a button about having my name in any blessed place. I was never ardent about fame even in my political days; I preferred to remain behind the curtain, push people without their knowing it and get things done. It was the confounded British Government that spoiled my game by prosecuting me and forcing me to be publicly known as a "leader". Then again I don't believe in advertisement except for books, and in propaganda except for politics and patent medicines. But for serious work it is poison. It means either a stunt or a boom, and stunts and booms exhaust the thing they carry on their crests and leave it lifeless and broken, high and dry on the shores of nowhere—or it means a movement. A movement in the case of a work like mine means the founding of a school or a sect or some other damned nonsense. It means that hundreds or thousands of useless people join in and corrupt the work or reduce it to a pompous farce from which the Truth that was coming down recedes into secrecy and silence. It is what has happened to the "religions" and is the reason of their failure. If I tolerated a little writing about myself, it is only to have a sufficient counter-weight in that amorphous chaos, the public mind, to balance the hostility that is always aroused by the presence of a new dynamic Truth in this world of ignorance. But the utility ends there and too much advertisement would defeat the object. I am perfectly "rational", I assure you, in my methods and I do not proceed merely on my personal dislike of fame. If and in so far as publicity serves the Truth, I am quite ready to tolerate it; but I do not find publicity for its own sake desirable. (2.10.34)"

[ভাবার্থ : রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধ যৌক্তিক না অযৌক্তিক এ-প্রশ্ন অবান্তর। প্রথম কথা হচ্ছে, কারুর উপরোধে তত্ত্বকথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। ...দ্বিতীয় কথা, আমার নাম কোথাও হ'ল বা না হ'ল এ নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। এমন কি বিপ্লবী যুগেও আমি কোনোদিনই যশমান চাই নি। আমি পর্দার আড়ালে থেকে একে ওকে তাকে এগিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলাম। এই অর্বাচীন বৃটিশরাজন্যেরাই আমার ফন্দি ধ'রে ফেলে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নেতা হ'তে বাধ্য করল। অপিচ, বিজ্ঞাপনের ধুমধামে আমার আস্থা নেই, না প্রপাগাণ্ডায়—কেবল রাজনীতিতে বা পেটেণ্ট দাওয়াইয়ে ছাড়া। সত্যিকারের কাজে বিজ্ঞাপন প্রপাগাণ্ডার ক্রিয়া বিষের মতন। এর পরিণাম হয় একটা প্যাঁচ বা হট্টরোল যার ফল হয় নিষ্প্রাণ ছত্রাকার—কিম্বা কোনো দল-গড়া। হাজার হাজার বাজে হুজুগেরা এসে হাজির হয়—যার ফলে আন্দোলনটা হ'য়ে দাঁড়ায় এক জাঁকালো প্রহসন। সঙ্গে সঙ্গে যে-সত্য প্রকাশ হচ্ছিল সে পিছিয়ে গিয়ে নিশ্চুপ হ'য়ে যায়। চিরকাল এইই হ'য়ে এসেছে নানা ধর্মের দাপাদাপিতে—অর্থাৎ নিষ্ফলতা। আমার সম্বন্ধে একটু আধটু প্রচার আমি স'য়ে থাকি শুধু তথাকথিত গণমনের নামে যে-অনামী গণ্ডগোল ফুলে ওঠে তার উল্টো দিকে একটু ভার চাপিয়ে গণমনের বিরোধিতা বাতিল করতে। অজ্ঞানের এ-বিশ্বমঞ্চে প্রতি জীবন্ত সত্যের অভ্যুদয়েই এই ব্যাপক অবোধ বিরোধিতা জেগে ওঠে।]

॥ সাঁইত্রিশ ॥

এই আন্তর প্রেরণা তথা অন্তর্দৃষ্টিই ছিল তাঁর মনোবলের ভিত্তি তথা তীর্থপথের দিশারি। আমাদের উপনিষদে বলেছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়েরা স্বভাবে বহির্মুখী, কিন্তু বিরল কয়েকজন মহাভাগ প্রত্যগাত্মাকে দেখতে চেয়ে আবৃত্তচক্ষু হন অমৃতের অধিকারী হ'তে। * আত্মা আমাদের কাছে সাধারণতঃ একটা কথার কথা হ'য়ে দাঁড়ায় প্রত্যক্ষবোধের এলাকায় তার দেখা মেলে না ব'লে—মিললে সে হ'ত প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আত্মা। তাই বলেছেন উপনিষদ বারবারই—আবৃত্তচক্ষু

---

* পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ ২।১।১

অর্থাৎ, বিধাতা ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখ ক'রেই সৃষ্টি করেছিলেন, তাই জীব বাইরেকেই দেখে ভিতরকে নয়। কখনো কখনো কোনো বিবেকী অমৃতত্ব চেয়ে অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন ক'রে থাকেন।

অর্থাৎ অন্তর্মুখী না হ'তে পারলে বস্তুলাভ হয় না। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বধর্মে যোগী, স্বভাবে আবৃত্তচক্ষু। এ-শ্রেণীর ঋষিকল্প মহাপুরুষকে গণমন বুঝতে পারে না ব'লেই বহির্মুখী বুদ্ধির নির্দেশে ছোটকরতে চেয়ে থাকে—শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই। এর একটা কারণ অন্তত দুর্বোধ্য নয়ঃ অহঙ্কার ঘা খেলে প্রত্যাঘাত করতে চায় মান বাঁচাতে। তাই মহামানবেরা যুগে যুগে ক্ষুদ্রমানবদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের নিশানা হ'য়ে এসেছেন—তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেছেন ক্ষুদ্রমতিরা তা করতে পারে নি ব'লে। আমি প্রায়ই শুনতাম—অনেকে আমাকে চিঠিতেও লিখতেন—যে, শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী হ'তে চেয়েও ল'ড়ে চলতে পারলেন না ব'লেই শেষে যোগের অজুহাতে রণছোড় পলাতক হ'লেন। শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রকে যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চেয়েছেন তাঁরা এ-হেন ক্ষুদ্রবুদ্ধিদের নিন্দাবাদে সায় দিতেই পারেন না। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে মহা-তেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ ব'লে ভক্তি করেন ব'লেই বিশ্বাস ক'রে এসেছেন—যে-কথা তিনি আমাকে লিখেছিলেনঃ যে, তিনি রাজনীতির রণাঙ্গন ছেড়ে এসেছিলেন এজন্যে নয় যে, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাঁর কাজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রস্থান করেছিলেন কারণ তিনি সে-সময়ে একটি স্পষ্ট আদেশ পেয়েছিলেনঃ

["I did not leave politics because I could do nothing more there. Such an idea was very far from me. I came away because I got a distinct *adesh* in the matter. …October 1932"]

আলিপুর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন—তাঁর বিখ্যাত "Uttarpara speech"-এ—যে, কারাগৃহে তিনি যোগসাধনার সময়ে ভগবানের কাছে করেছিলেন এই প্রার্থনাঃ

"Thou knowest that I do not ask for Mukti. …I ask only to be allowed to live and work for this people whom I love. …Give me Thy *Adesh*. I do not know what work to do or how to do it. Give me a message. In the communion of Yoga two messages came. The first message said, 'I have given you a work and it is to help to uplift this nation.' …The second message came and it said, 'Something has been shown to you in this year of seclusion…it is the truth of the Hindu religion. It is this religion that I am raising up before the world, it is this that I have perfected and developed through the Rishis, saints and Avatars, and now it is going to do my work among

the nations. I am raising up this notion to send forth my word. This is the *Sanatan Dharma*, this is the eternal religion which you did not know before, but which I have now revealed to you···This is the one religion that can triumph over materialism ···It is the one religion which impresses on mankind the closeness of God to us. · It is the religion which shows the world what the world is, that it is the *Lila* of Vasudeva. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that *Lila*, its subtlest laws and its noblest rules."

[ভাবার্থ : "তুমি জানো প্রভু, যে, আমি মুক্তিকামী নই। আমি শুধু চাই—আমি যেন আমার দেশবাসীদের সেবায় জীবন নিয়োগ করতে পারি। আমি জানি না আমার কী কর্তব্য ও কেমন ক'রে তা সাধন করতে হবে। আমাকে তোমার আদেশ দাও।" উত্তরে দুটি বাণী এল। প্রথমটি বলল : 'আমি তোমাকে যে-কর্মভার দিচ্ছি সে হচ্ছে—তোমার স্বজাতিকে তোলো।'···দ্বিতীয় বাণীটি বলল : 'জেলে তোমার কাছে আমি খুলে বলেছি অনেক কিছু·· বিশেষ ক'রে হিন্দুধর্মের সত্যতা—যে-শাশ্বত সত্য আমি মুনি ঋষি অবতারদের মধ্যে দিয়ে প্রকট করেছি নিখুঁৎ ক'রে—এই সনাতন ধর্ম যার মর্ম তুমি জানতে না। কেবল এই ধর্মই বস্তুতান্ত্রিকতাকে পরাস্ত করতে পারে···আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দেখিয়ে দিতে পারে—ভগবান আমাদের কত কাছে·· এ-বিশ্ব বাসুদেবের লীলা···আর কেমন ক'রে আমরা পারি এ-লীলার নিখুঁৎ বাহন হ'তে—তার সূক্ষ্মতম ও মহত্তম বিধান মেনে।']

ভারতের বর্তমান দুর্দিনে এ-ভাগবতী বাণী শুনলে আমাদের সকলেরই আশ্বস্ত হওয়া উচিত—একশোবার—শুধু এজন্যে নয় যে, এ-মহাবাণীতে ধর্মের শাশ্বত ঝঙ্কার বেজে উঠেছে যে-ঝঙ্কার হাজারো আসুরিক অভ্যুদয় নিষ্ঠুর বিদেশীদের হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও আজও লক্ষ লক্ষ আস্তিকের বুকের তারে বাজে—শুধু তীর্থে মন্দিরে দেবতায়। হিমালয়ের দৈবপ্রভায় নয়—বাজে একের পর এক মহামানব, মহাপুরুষ, মহাজন, সাধু, সন্ত, ভক্ত, পূজারী, ধর্মাগীর মৃত্যুহীন প্রাণে, নিত্যনব আনন্দ জ্যোতির উচ্ছলনে। কবি কীট্‌স বলেছেন : শ্রুত রাগমালা মধুর, কিন্তু অশ্রুত রাগমালা আরো মধুর। আমরা চর্মচক্ষে কতটুকু দেখতে পাই, মগজী বুদ্ধিতে কতটুকু বুঝতে পারি, ভাগবত সাধনায় তাঁর কৃপার কতটুকু বিদ্যুদ্দাম আহরণ করিতে পারি? এ-বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ কোটি গ্রহ তারা সূর্য চন্দ্র নীহারিকার নিরন্ত নৃত্যলীলার কতটুকু আনন্দ-স্পন্দন অন্তরে ধারণ করতে পারি? কবিগুরু গেয়েছেন :

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি

এ কি শুধু কল্পনার ক্ষণফুলে মিথ্যাসান্ত্বনার মালা গাঁথা ?

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে অলীক ক্ষণরঙ্গ আলেয়ার দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন :

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতৎ জগৎ মজ্জেৎ অনিন্দিতে ॥
ধার্মিকের ধর্ম যদি বন্ধ্যা হ'ত ভবে,
অন্ধ অমানিশায় যেত ধরণী ডুবে কবে।

শ্রীঅরবিন্দের অভয়বাণী কি শতশত দ্রষ্টা ঐতিহাসিকের মর্মবীণায় আজো ঝঙ্কৃত হয় না :

The spirit rises mightier by defeat,
Its godlike wings grow wider with each fall,
Its splendid failures sum to victory. (6/2)
প্রতি পরাজয় অন্তে অন্তরাত্মা আরো উর্ধ্বে ওঠে
হয় আরো বলীয়ান্—মহীয়ান পর্ণ তার হয়
প্রতি স্খলনের পরে আরো প্রসারিত, অভ্রভেদী,
প্রতি দীপ্ত বিফলতা রচি' নব সোপান—সাধকে
অন্তিমে উত্তীর্ণ করে বিজয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে।

শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিনই সে-জাতের স্বপ্নালু কবি ছিলেন না যাঁরা বলেন—ভগবান যখন নিয়ন্তা তখন তাঁর সৃষ্টিতে অকল্যাণ দুঃখ শোক থাকতেই পারে না—যাকে দুঃখ মনে হয় সে স্রেফ মায়া—মনঃকল্পিত ভয়ের ছায়াপাত। উত্তরপাড়া ভাষণে তিনি অকপটেই বলেছেন—যখন তিনি যোগ সাধনা সুরু করেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে কোনো জ্বলন্ত আস্তিক বিশ্বাসই ছিল না : "The agnostic was in me, the atheist was in me, the sceptic was in me···[আমার মধ্যে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়ী সবাই একসঙ্গে ঘরকন্না করত]"

এ-হেন সত্যাশ্রয়ী জিজ্ঞাসু যে শেষে ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বাহন তার শুধু একটি কারণ : তাঁর সত্যার্থী অন্তর শুধু ভগবানকে সত্য জেনেছিল ব'লে নয়, চিনেছিল বিশ্বলীলাকে তাঁর সৃষ্টিলীলা ব'লে। তিনি আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন : "তিনি ধর্মার্থী হ'য়ে যোগপন্থী হন নি—কিন্তু ভাগবতী ইচ্ছায় তাঁর চোখের ঠুলি খ'সে পড়ল—তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক

বিরাট ভাগবতী কৃতি, আশ্চর্য লীলা। এই দিব্য দর্শনের ফলেই তাঁর সমগ্র সত্তার রূপান্তর হ'ল, তিনি দেখতে পেলেন (সাবিত্রী ২/৬):

Nothing is truly vain the one has made
In our defeated hearts God's strength survives
And Victory's star still lights our desperate road.

কিছুই নিষ্ফল নয় সৃজিলেন যাহা ভগবান্,
দৈবশক্তি আমাদের পরাস্ত প্রাণেও রহে জাগি',
জয়তারা ধরে আলো আজো দুর্বিষহ মরুপথে।

যখন শ্রীঅরবিন্দ এ-বাণী শুধু বাহ্যকর্ণে শোনা নয়, অন্তঃশ্রুতিতে শুনেছিলেন কেবল তখনই তিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বাণীকে আন্তর অনুভূতির বাণীর এজাহারে নাকচ করতে চেয়েছিলেন—তার আগে নয়। এই দ্বিবিধ দৃষ্টি বা শ্রুতিভঙ্গির মধ্যে গভীর দৃষ্টির রায় বেশি প্রামাণিক হ'লেও বাহ্য দৃষ্টির রায় সম্পূর্ণ নামঞ্জুর হয় না। যাঁরা কথায় কথায় বলেন "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে"—তাঁদের এ-ছেলেমানুষি প্রবোধ বাক্যে প্রবুদ্ধ মন সান্ত্বনা পায় না। সান্ত্বনা পায় কেবল তখন—যখন ভূয়োদর্শনের ফলে মানুষ দেখতে পায় যে উপরভাসা দর্শন বা শ্রবণ আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্যের দেখা পায় না—যেমন পায় দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি। যখন এই গভীরতর বোধের লোকে সাধক ছাড়পত্র পায় তখনই কেবল সে কিছুটা আভাস পায় ভগবানের আশ্চর্য কৃতির, অঘটনী চাতুরীর। আর পায় ব'লেই সে চর্মচক্ষে-দেখা দুঃসহ দৃশ্যের মধ্যেও দেখতে পায় এক মহাশক্তিকে যে আবহমানকাল দুঃসহ দুঃখের মধ্যে দিয়েই অভিযান ক'রে চ'লে এসেছে মানুষকে নিচে থেকে উপরে টেনে, প্রতিপদের উন্মেষ থেকে পূর্ণিমা পরিণতিতে। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে তাঁর এই উপলব্ধিটিকেই আমার কাছে পেশ করেছিলেন—ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে, ১৭.১২.৩৬ তারিখে।* এ সুদীর্ঘ পত্রের সবটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই, কেবল তাঁর বাণীটি গভীর ও মূল্যবান ব'লে এখানে কিছুটা উদ্ধৃতি দিই। তিনি আমাকে লিখেছিলেন:

"Napoleon, when asked why he believed in Fate, yet was always planning and acting, answered: 'Because it is fated that I should work and plan.' In other words, his planning and acting were part of Fate, contributed to the results Fate had in view. Even if I foresee an adverse result I must work for the one that I consider should be; for it keeps alive the

* SRI AUROBINDO CENTENARY LIBRARY, VOL. 22, P. 467

force, the principle of Truth which I serve and gives it a possibility to triumph hereafter so that it becomes part of the working of the future favourable Fate, even if the Fate of the hour is adverse. Men do not abandon a cause because they have seen it fail or foresee its failure ; and they are spiritually right in their stubborn perseverance. Moreover, we do not live for outward result alone ; far more the object of life is the growth of the soul, not outward success of the hour or even of the near future. The soul can grow against or even by a material destiny that is adverse."

[ভাবার্থ : একদা একজন নেপোলয়নকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — তিনি নিয়তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নিরন্তর ছক কাটেন কেন কখন কী করতে হবে না হবে ? উত্তরে নেপোলিয়ন বলেছিলেন : "কারণ আমার ছক কাটাও নিয়তি নির্দিষ্ট" : অর্থাৎ, তাঁর অতন্দ্র কর্মসাধনা তথা ছক কাটাও ঘ'টে থাকে নিয়তির নির্দেশেই ভবিতব্যকে ফলিয়ে তুলতে। ধরো, আমি যদি দেখি—আমার কোনো সাধনা ফলপ্রসূ হবে না, তখনো আমি চেষ্টা করব যাতে আমি কৃতকৃত্য হই, কেন না কেবল এই শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কর্মশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, যে-সত্য আমার লক্ষ্য তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব—এমন কি, যে-নিয়তি আজ প্রতিকূল তাকেও অনুকূল করা যেতে পারে। সাধনা সফল হবে না জেনেও-যে মানুষ সাধনা থেকে বিরত হয় না, দুর্দম অধ্যবসায়কে বরণ ক'রে চলে—এরই তো নাম মনুষ্যত্ব। অপিচ, আমরা কর্মব্রতী হই তো কেবল বাহ্য ফলাফলের কথা ভেবে, বা কোনো ক্ষণিক সাফল্য কি নগদ বিদায়ের লোভে নয়—অন্তরাত্মার প্রগতির জন্যেই কর্মযোগ।

অন্তরাত্মার শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে বাহ্য নিয়তি প্রতিকল হ'লেও, এমন কি প্রতিকূল হওয়ার জন্যেই।]

শ্রীঅরবিন্দর তাঁর জীবন সাধনায় চিরদিনই চেয়ে এসেছেন বাহ্য ও আন্তর সত্যের সমন্বয়ের ফলে নানা দুঃখকেও রূপান্তরিত ক'রে নিত্যানন্দের সুধাস্বাদ পেতে। তাঁর "লাইফ ডিভাইন"-এর একটি পরম বাণী : "All problems in life are essentially problems of harmony." একথা তিনি বলতেন বারবারই কেন না কেবল এই পরম সমন্বয় হ'লেই দুঃখ শোকের নিহিতার্থ বা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়—শোকতাপ দুঃখশোক আধিব্যাধিকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেওয়া শুধু যে কার্যতঃ

অসম্ভব তাই নয়, থিওরিতেও মানুষের চেতনার বিবর্তনে কোনো সহায়তা করে না। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দ বলেন: যে-মহানিয়ন্তা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোক লোকে উত্তীর্ণ করতে চেয়ে মুনি ঋষি কবি মনীষী অবতারের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ঐশী বাণী প্রচার ক'রে এসেছেন তিনি চাইতেই পারেন না মায়াবাদকেই জ্ঞানের চরম সমাধান ব'লে ঘোষণা করতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা লেখায় ও পত্রেই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন—কেন মায়াবাদ যুগে যুগে বহু জিজ্ঞাসুকে টেনেছে জীবন বিমুখ বৈরাগ্যের দিকে। সে-দার্শনিক অবতারণা এ-স্মৃতিতর্পণে অবান্তর হবে ব'লে আমি এ-সূত্রে "সাবিত্রী" থেকে তাঁর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। সাবিত্রী শেষে যখন ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লেন তখন বললেন তাকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে:

> If earth can look up to the light of heaven
> And hear her answer to her lonely cry
> Not vain their meeting, not heaven's touch a snare :
> If thou and I are true, the world is true.

> ধরা যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় অধরার আলো পানে,
> নিঃসঙ্গ ক্রন্দনে তার পায় অভিনন্দন স্বর্গের,
> তাহ'লে এ-পরিচয়—স্বর্গের প্রসাদ—নয় বৃথা:
> তুমি আমি যদি সত্য হই—তবে সত্য এ-ভুবন।

ভগবান্ যে মানুষের, ধরণীর, প্রার্থনায় সাড়া দেন এ শুধু শাস্ত্রবাণী নয়—প্রত্যক্ষ সত্য, প্রতি তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই জীবনের উপজীব্য। তাই যুগে যুগে ভগবানের নানা আত্ম-প্রকাশ বা বিভূতির মধ্যে প্রেমের উজ্জ্বলনই তার কাছে সবচেয়ে বরণীয়, মহনীয়, বলে গণ্য হ'য়ে এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন—যেটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি—যে, তাঁর যোগসাধনায় তিনি প্রেমভক্তিকেই বরাবর সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছেন। তাঁর "সিন্থেসিস অফ যোগ" এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন:

Love is the crown of all being and its way of fulfilment, that by which it rises to all intensity and all fullness and the ecstasy of utter self-finding. ···Love is the power and passion of the divine self-delight and without love we may get the rapt peace of its infinity, the absorbed silence of the Ananda, but not its absolute depth of richness and fullness. Love leads us from the suffering of division into the bliss of perfect union, but without

losing that joy of the act of union which is the soul's greatest discovery and for which the life of the cosmos is in long preparation. Therefore to approach God by love is to prepare oneself for the greatest possible spiritual fulfilment.

[ভাবার্থ: প্রেম জীবনের মণিমুকুট, পরম সার্থকতা—যার মাধ্যমে মানুষ আত্মসাক্ষাৎকারের আনন্দের নাগাল পায়। প্রেম বিনা আমরা ভূমার টইটুম্বুর শান্তির বা আত্মমগ্ন নৈঃশব্দ্যের সুধাস্বাদ পেতে পারি, কিন্তু তার অতল সমৃদ্ধির পূর্ণিমাপরিচয় পাই না। প্রেম ভেদের দুঃখের এলাকা পেরিয়ে আমাদের পূর্ণ মিলনের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে—যে-আনন্দ আত্মার সর্বোত্তম আবিষ্কার—যে-আনন্দের অভিসারে প্রাণলীলা চিরপ্রবহমান। তাই প্রেমের পথে ভগবানের সঙ্গে শুভদৃষ্টিই মানুষের সর্বোত্তম আত্মিক সিদ্ধি।]

একথা যে অসত্য নয় তার একটি সুমধুর তথা প্রাণোদ্বেল পরিচয় পাই বিশেষ ক'রে সাবিত্রীর শেষ স্কন্ধের ছত্রে ছত্রে। অমরাবর্তীর আনন্দ স্বাদ পেয়েও শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন আজীবন সে-আনন্দের কিছুটা আলো অন্তত আমাদের মসীম্লান পৃথিবীতে মাটির মানুষের অন্তরে আবাহন করতে। কত ভাবেই যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ধরণীপ্রীতি, সমর্থন করেছিলেন রূপান্তরিত পৃথ্বীবাদের—পড়তে পড়তে চোখে জল আসে—হৃদয়ে শুনতে পাই তাঁর গভীর ধরাপ্রেমের স্পন্দন। কী সুন্দর তাঁর এই সরল বাণী যে, ভগবান যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তখন পৃথিবীকেও সাড়া দিতে হবে ভগবানকে তার গর্ভে জন্ম দিয়ে—লালন ক'রে—পূজা ক'রে—ভালোবেসে:

"Since God has made earth, earth must make in her God."

শুধু তাই নয়, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার অতন্দ্র সাধনায় যে, প্রেমেই তাঁর উদ্ভব বিকাশ ও পরম পরিণতি:

My love is not a hunger of the heart,
My love is not a craving of the flesh,
It came to me from God, to God returns.

আমার এ-প্রেম নয় শুধু মর্ত্য হৃদয়ের ক্ষুধা,
নয় সে তনুর তৃষ্ণা—বিভুর অলোকলোক হ'তে
করেছে সে আমাকে বরণ—ফিরে যাবে তাঁর কাছে।

॥ আটত্রিশ ॥

জীবনের চলতি ছন্দের ঢিমা তেতালা কদম দেখতে দেখতে মন অনেক সময়েই ভুলে যায় যে, পাখায় হু হু করে উড়ে যাওয়াও আমাদের অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে পড়ে—বিশেষ ক'রে উড়ো জাহাজের অবিশ্বাস্য সংখ্যাবৃদ্ধির পরে। তবু বলা চলে যে, দিনের পর দিন যখন মানুষ একঘেয়ে জীবন কাটায়—কখনো কোনো কর্মসূচী—রুটীন—গ'ড়ে, কখনো এম্‌নি ঘরোয়া আচার মেনে, যার মধ্যে না আছে নূতনত্ব না কোনো আশ্চর্য আবির্ভাব—তখন মানুষের মনে প্রায়ই প্রশ্ন আসে : ততঃ কিম্? —এর পরে কী? উত্তর দেয় জীবন—"কিছুই না—যা পাচ্ছে তাই গ্রহণ করো, যা যা বরণীয় তা বরণ করো।—চলো সুনীতি মেনে যতটা সম্ভব——তারপর শেষে এ-পার ছেড়ে যখন যেতে হবে ওপারের ডাকে তখন যতটা সম্ভব কান্নাকাটি না ক'রে প্রস্থান করো, কেন না কান্নাকাটিতে ভবিতব্যকে ঠেকানো যায় না।"

এইই হ'য়ে এসেছে শতকরা নিরানব্বই জন বস্তুতান্ত্রিক মানুষের জীবন পঞ্জী। বাকি শতকরা একজন ঝিকিয়ে ওঠে একটা নব দিগন্তের আভাস দিতে—হাজার করা একজন কোনো অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির সুখবর দিতে—লাখে একজন ভাগবত জীবনের—লাইফ ডিভাইনের—প্রতিশ্রুতি। শ্রীঅরবিন্দ এই বিরলতম মহাপুরুষদের একজন। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন চিনেছেন, ভক্তি ক'রে অন্তরে পেয়েছেন তাঁর আলো, কানে শুনেছেন তাঁর বেদবাণী, তাঁরা কতকটা পেরিয়ে গেছেন দিনানুদৈনিক একঘেয়েমির চৌহদ্দি। কিন্তু তাঁকে যাঁরা দিশারি ব'লে বরণ করেছেন তাঁরা বিশেষ ভাগ্যবান্, কেন না তাঁরা অন্তত কিছুটা দিশা পেয়েছেন—কোন্ জ্ঞানদীপ্ত "নিরস্তকুহক" সত্যকে ধ্যান করলে দুঃখনিবৃত্তি হয়—যার পাঠ দিয়েছেন ব্যাসদেব ভাগবতের প্রথম শ্লোকে : "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"—যিনি নিজের আলোয় সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে জাগতিক অন্ধকারের গণ্ডী পার হয়েছেন তাঁকেই ধ্যান করা চাই—সেই সত্যের সত্যকে।

কিন্তু এ-আভাস মেলে আরো এমন অনেক সাধক সাধিকার উপলব্ধি থেকে তাঁরা গুরু না হয়েও আমাদের নিরস্তকুহক করতে পারেন। এই শ্রেণীর দুটি আধারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমি নিরাশায় আশ্বাস ও সংশয়ের দুর্লগ্নে নবপ্রত্যয়ের পাথেয় পেয়েছিলাম—কৃষ্ণপ্রেম ও ইন্দিরা। কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলেছি একটি গোটা স্মৃতিচারণে (YOGI SRI KRISHNAPREM) আজ বলব ইন্দিরার কথা যে আমার শিষ্যা হ'য়েই এসেছিল বটে, কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই হ'য়ে উঠেছিল অলৌকিক

সাধন-সঙ্গিনী। তবে ব'লে রাখি আমি যা বলতে চাই বলব নিজের ঢঙেই। যথা সম্ভব অত্যুক্তি কাটিয়েই বলতে চেষ্টা করব, কেবল মুস্কিল এই যে, মানুষ যাকে দেখে অনেক কিছু অদেখাকে দেখতে পেয়েছে, যাকে চিনে অনেক কিছু অচিন আলোকে চিনতে শিখেছে—এককথায়, যার নিদেশে তার বিসর্জনীতেও আগমনীর সুর বেজে উঠেছে তার কথা কি অতি সাবধানে ওজন ক'রে বলা যায়? গেটের একটি উক্তিতে আমার মন পূর্ণ সাড়া দেয়:

"Aufrichtig zu sein kann ich versprechen unparteiish zu sein aber nicht." (আমি সত্যনিষ্ঠ হব এমন কথা দিতে পারি, কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন শপথ করব কেমন ক'রে?)

এ নিয়ে নানা তার্কিক বিষম তর্ক তুলেছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে—যেমন কানা ছেলেকে স্নেহবশে মা পদ্মলোচন নাম দিলে—টকতেই হয় অবশ্য, কিন্তু পক্ষান্তরে পদ্মলোচনকে যাঁরা বেশি তারিফ করতে ভয় পান পাছে ক্রিটিকেরা ভ্রুকুটি করে— তাঁদের রায়কে কী নাম দেব? শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন: "I do not belive in human judgments because I have always found them fallible—also because I have myself been so blackened by human judgments that I do not care to be guided by them with regard to others." [মানুষের রায়ে আমার আস্থা নেই, কারণ আমি দেখেছি সে আদৌ অভ্রান্ত নয়—আর এজন্যেও বটে যে, অপরের সম্বন্ধে তাদের মতামতে সায় দিতে আমার বাধে।]

তা ব'লে আমি এমন ইঙ্গিত করছি না যে, মানুষের কোনো কৃতিকেই কতকটা ঠিক চোখে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানেই কোনো সমালোচক কোনো প্রতিভাধরের সার্থক মূল্যায়ন করেছেন সেখানেই বলা—তিনি প্রেমের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন প্রতিভার কৃতিকে, যথা, যখন ওয়র্ডস্ওয়র্থ লিখেছিলেন মিলটনের উদ্দেশ্যে:

> Milton! thou shouldst be living at this hour,
> England has need of thee.

অথবা ম্যাথিউ আর্নল্ড্ লিখেছিলেন শেক্সপীয়রের তর্পণে:

Others abide our question: thou art free.

তখন এ-দুজন মনীষী এমন অবিস্মরণীয় প্রশস্তি লিখেছিলেন কৃতজ্ঞ পূজারীরই ছন্দে, নিরপেক্ষ ক্রিটিকের উচ্চারণে নয়। নিরপেক্ষ ক্রিটিকদের মূল্যায়নের কোনো দামই নেই এমন ইঙ্গিত করছি না, কিন্তু সে মূল্যায়ন প্রেমের প্রশস্তির পাশে দাঁড়াতে পারে না—স্মরণীয় হৃদয়াবেগ হ'য়ে। কারণ প্রেমই দেয় অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি—বহির্দৃষ্টি।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা ব'লে রাখি : যে, আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে যা লিখতে যাচ্ছি তার প্রেরণা আসেনি নিরপেক্ষ বুদ্ধি থেকে, এসেছে আনন্দ-উদ্বেল অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি থেকেই।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে—আমার এক বুদ্ধিবাদী বন্ধু একদা আমাকে তিরস্কার করেন এই ব'লে যে, আমার মতন প্রবুদ্ধ সুধীও যদি হৃদয়াবেগের প্রেরণায় গুরুবাদী হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে সেটা হ'য়ে দাড়ায় শোকাবহ ব্যাপার, কেন না গুরুবাদের সমর্থন যে করে সে নিরপেক্ষ বুদ্ধি নয়—সে অন্ধ বিশ্বাস। তিনি আরো নানা যুক্তি ঝাঁকিয়ে আমাকে "নিরস্তপ্রহক" করতে চেষ্টা করেন। তার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, এ-যুগ বুদ্ধির যুগ, বিজ্ঞানের টেকনলজির যুগ, এককথায়—ভবিষ্যৎমুখী সংস্কারপন্থী মনের যুগ—অতীতের পানে চেয়ে অশ্রুকণ্ঠী উচ্ছ্বাসের যুগ গত। দৃষ্টান্ত? একটিবার চোখ চেয়ে দেখই না—যারা এ-যুগের দিক্‌পাল তাঁরা বুদ্ধিকে কর্ণধার ক'রেই মহাকায় হয়েছেন, অন্ধ বিশ্বাসের অনুগামী হ'য়ে নয়। এককথায়, বুদ্ধি হ'ল খোলা হাওয়া, বিশ্বাস—অজ্ঞানভিত্তি—না জেনে মেনে নেওয়া...ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দকে এ-চিঠিটি পাঠাতে তিনি আমাকে লেখেন এক দীর্ঘ পত্র :

Dilip,

But why on earth does your despairing friend want everybody to agree with him and follow his own preferred line of conduct or belief? That is the never-realised dream of the politician, or realised only by the violent compression of the human mind and life, which is the latest feat of the man of action. The "incarnate" Gods—Gurus and spiritual men of whom he so bitterly complains—are more modest in their hopes and are satisfied with a handful or, if you like, an Ashramful of disciples, and even these they don't ask for, but they come, they come. So are they not—these denounced "incarnates"—nearer to reason and wisdom than the political leaders? —unless of course one of them makes the mistake of founding a universal religion, but that is not our case. Morever, he upbraids you for losing your reason in blind faith. But what is his own view of things except a reasoned faith? You believe according to your faith, which is quite natural, he believes according to

his opinion, which is natural also, but no better, so far as the likelihood of getting at the true truth of things is in question. His opinion is according to his reason. So are the opinions of his political opponents according to their reason, yet they affirm the very opposite idea to his. How is reasoning to show which is right? The opposite parties can argue till they are blue in the face—they won't be anywhere nearer a decision. In the end he prevails who has the greater force or whom the trend of things favours. But who can look at the world as it is and say that the trend of things is always (or ever) according to right reason —whatever this thing called right reason may be? As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions; there is only my reason your reason, X's reasons, Y's reason multiplied up to the discordant innumerable. Each reasons according to his view of things; his opinion, that is, his mental constitution and mental preference. So what is the use of running down faith which after all gives something to hold on to amidst the contradictions of an enigmatic universe? If one can get at a knowledge that knows, it is another matter; but so long as we have only an ignorance that argues,—well, there is a place still left for faith,—even faith may be a glint from the knowledge that knows, however far off, and meanwhile there is not the slightest doubt that it helps to get things done. There's a bit of reasoning for you.—just like all other reasoning too, convincing to the convinced, but not to the unconvincible, that is, to those who don't accept the ground upon which the reasoning dances. Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else.

Sri Aurobindo

গীতায় আছে অর্জুন যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে নানা জোরালো যুক্তিকে নানা

সেন্টিমেণ্টাল মশলা মিশিয়ে পেশ করতে কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন "প্রহসন্নিব"—অর্থাৎ ঈষদ্ধাস্য ক'রে। শ্রীঅরবিন্দও এ-চিঠিটি লিখেছিলেন কৃষ্ণের ঢঙে যার মূল ধমক—আমার বন্ধুকে বলা: পাগলামি ছেড়ে ওঠো—কেন না হৃদয় দৌর্বল্য আসলে পাগলামিরই সগোত্র—ভূয়োদর্শীর সাজে না। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম নিশানা হ'ল তথাকথিত বুদ্ধির গোঁয়ার্তুমি যে প্রায় অন্ধ ব'লেই চায় যে সবাই তার নির্বাচিত আচরণকে মান দেবে, তার বিশ্বাসে সায় দিয়ে। কিন্তু এ-চাওয়া কখনোই পাওয়ার দিশা পায় না—কেন না যাকে আমরা বলি কর্মবীর সে মানুষের মন ও জীবনকে জোর করে চালাতে চায় যে-পথে তারা চলতে চায় না। তারপরে আশ্রমগুরুর সহিষ্ণুতার উল্লেখ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন:

"তোমার বন্ধু তোমাকে ধমকালেন বুদ্ধি ছেড়ে অন্ধ বিশ্বাসকে বরণ করার জন্যে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি আসলে যৌক্তিক বিশ্বাস নয়? তুমি চলছ তোমার বিশ্বাসে ভর ক'রে—যেটা খুবই স্বাভাবিক—তিনি চলছেন তাঁর মতে যে-মত তাঁর বিশ্বাস-সমর্থিত—এও স্বাভাবিক—কিন্তু তার বেশী নয়—মানে বলা চলে না যে, তাঁর বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। তাঁর মত চলে তাঁর যুক্তি মেনে। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও চলেন তাঁর নিজের যুক্তি মেনে—কিন্তু তাঁর চলার পথ তোমার বন্ধুর পথের উল্টো। যুক্তি কী ক'রে বলবে এঁদের মধ্যে কে ঠিক কে বেঠিক পথের পথিক? তাঁরা যুক্তিগর্জন করতে করতে এলিয়ে পড়লেও কোনো সমাধান হবে না—কে ভ্রান্ত আর কে অভ্রান্ত। বলতে কি, অভ্রান্ত বিশ্বজনীন যুক্তি ব'লে জগতে কিছুই নেই আছে—আমার যুক্তি, তোমার যুক্তি ক খ গ ঘ···অন্তহীন যুধ্যমান প্রকার যুক্তি। প্রতি মানুষই চলে তার মনের গড়ন বা স্বভাবের পক্ষপাত তাকে যে-পথে চালায়। তাই বিশ্বাসকে অপরাধী ক'রে লাভ কী বলো—বিশেষ যখন দেখা যাচ্ছে যে, সে অন্তত একটা খুঁটি দেয় যা ধরে উঠে দাঁড়ানো যায়—এই বিশ্বের গোলকধাঁধায়। যদি কেউ জ্ঞানের আলোকলোকে পৌঁছয় তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞানই চলে অবোধ যুক্তির তীরন্দাজি ক'রে ততক্ষণ বিশ্বাসকে বরখাস্ত করা চলে না। এমন কি বিশ্বাস হ'তে পারে প্রজ্ঞার একটি অগ্র রশ্মি—সে-প্রজ্ঞা যত সুদূরই হোক না কেন। আর যতদিন সে-আলো না আসে ততদিন বিশ্বাস নিঃসন্দেহে আমাদের সিদ্ধির সহায় হ'তে পারে। এই দেখ, তোমাকে আমি যুক্তিবাদের কিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম—ঠিক আর সব যুক্তি জালের মতন, মানে যারা যুক্তিতে বিশ্বাস করে তাদের কাছে প্রামাণিক, কিন্তু যারা করেনা তাদের কাছে নামঞ্জুর। খতিয়ে, যুক্তিবাদ হ'ল মনের একটি পরিমিত নৃত্য, তার বেশী নয়।"

শ্রীঅরবিন্দের এ-পত্রটি আমার একটি গভীর সংশয়ের অন্ধকারে আলোর দিশা

দিয়েছিল—আমার চোখ খুলে দিয়ে যে, বিশ্বজনীন সর্বস্বীকৃত যুক্তি ব'লে কিছু নেই—শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন সংসারযাত্রায় যুক্তি নানাভাবেই পথের নির্দেশ দিতে পারলেও কোনো গভীর উপলব্ধি বা সত্যের ধ্রুবলোকে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে না। বহুবৎসর বাদে রাসেলের নানা লেখায় যুক্তির এই অক্ষমতার ইঙ্গিত পাই। তিনি বলছেন হাল আমলে যে তাঁর মনে এক সাংঘাতিক সংশয়কীট আস্তানা গেড়েছে যে নাছোড়বান্দা প্রশ্ন করে—এমন কিছু কি আছে এ-জগতে যার সম্বন্ধে মানুষ নিঃসংশয়তার পূর্ণিমানন্দে পৌঁছতে পারে—বা বলা চলে যুক্তির দামামা বাজিয়ে যে, অমুক নীতি বা পথ সবার পক্ষেই রাজপথ, যা ভালো তা সবার পক্ষেই ভালো? এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না, যাঁরা এ-সমস্যার অথই জলে সাঁতার কাটতে চান তাঁরা পড়তে পারেন তাঁর HUMAN SOCIETY IN ETHICS AND POLITICS. দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাসেল লিখছেন যে যেহেতু নানা দেশে নানা মুনির নানা মত সেহেতু "বলা চলে না যে অমুক কাজ ঠিক, তমুক কাজ ভুল" [In view of this diversity of moral codes, we cannot say that acts of one kind are right or acts of one kind wrong.] শ্রীঅরবিন্দ যুক্তিকে পথিকৃৎ ব'লে মনে করেন না, মনে করেন যুক্তির একটি মুখ্য প্রবণতা আমরা যা তাই তার ওকালতি করা—তাই তার রায়ে তত্ত্বাজিজ্ঞাসুরা আস্থা রাখতে না পেরে চেয়েছেন অন্তর্মুখী "আবৃত্তচক্ষু" হ'য়ে ধ্রুবসত্যের খোঁজ করতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন মৃদু হেসে (২. ৯)

An inconclusive play is Reason's toil :
Each strong idea can use her as its tool ;
Accepting every brief she pleads her case,
Open to every thought she cannot know.
The eternal Advocate, seated as judge,
Armours in logic's invulnerable mail
A thousand combatants for Truth's veiled throne
And sits on a high hors eback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win.

বিচিত্র বুদ্ধির লীলাখেলা ! তার বাঙ্ময় যুক্তির
বহু প্রয়াসেরো অন্তে পায় না সে নিশ্চিতির দিশা !
প্রতি দীপ্ত ভাবধারা করে তাকে নিত্য আজ্ঞাবাহী।

বরণ করে সে প্রতি চিন্তা, তবু লভে না তো জ্ঞান।
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব বিচারক
সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসনলুব্ধ লক্ষ যুধ্যমানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া—করিয়া আসীন
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গমপৃষ্ঠে করে উদ্দীপিত শুধু
তাদের অসাঙ্গ-কথাকথাসার মল্লযুদ্ধে—এক
মায়া-রণাঙ্গণে—যেথা পারে না কেহই হ'তে জয়ী।

কত কথাই এসে গেল—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে! তাই এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু মন্তব্য ক'রেই থামি যে, শ্রীঅরবিন্দ যুক্তির সীমা যে-ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর ভাগবতী প্রজ্ঞার আলোকপাত ক'রে সে-ভঙ্গি আমার কাছে অনবদ্য মনে হয়—যদিও আশৈশব যুক্তি বুদ্ধির এলাকায় বসবাস ক'রে আসার দরুণ বুদ্ধি যে কোনো গভীর বোধের (ওরফে বোধির) দিশা দিতে পারে না এ-সত্যকে বরণ করতে আমাকে প্রথমটায় শুধু যে বেগ পেতে হয়েছিল তাই নয়—রীতিমত ব্যথিত হ'তে হয়েছিল। কিন্তু এ-ব্যথা শুভফলপ্রসূ হয়েছিল, কেন না আমি বুদ্ধি যুক্তির উপরওয়ালা এক গভীর দৃষ্টির নাগাল পেয়েছিলাম মানস বিচারকে "নেতি" করতে শিখে—আর এই দৃষ্টির প্রসাদেই আমি ইন্দিরাকে চিনতে পেরেছিলাম উচ্চকোটির সাধিকা ব'লে। এবার ভনিতা রেখে সুরু করি পালাগান—কীভাবে তার দেখা মিলল।

*　　*　　*　　*

বলেছি, চ্যারিটি কন্সার্ট-এর পরে আমি এখানে ওখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতাম। "লিখতে লিখতেই সরে, বলতে বলতেই ঝরে।" তাই আমার ভক্তি-উদ্বুদ্ধ রসনা থেকে ঠিক সুধাধারা না ঝরলেও রকমারি ভাবধারা ঝরত—যাদের উৎস—শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানগোমুখী। ফলে হ'ল এই যে, আমি নানা শহরেই আহূত হতাম শুধু গান করতে বা চ্যারিটি কন্সার্ট দিতে নয়, ভাষণ দিতেও বটে। বলতে বলতে আত্মপ্রত্যয় এসে গেল—আমার মুখে খই ফুটতে সুরু করল। জব্বলপুরের রবার্টসন কলেজের কর্তা আমাকে সাদর নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন—জব্বলপুরের নাগরিকেরা, বিশেষ ক'রে কলেজের ছাত্রেরা আমার মুখে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু শুনতে উৎসুক। আমি গেলাম সেখানে ১৯৪৬ সালে—উৎসুকদের সাড়ায় উন্মুখ হ'য়ে। নৈলে মানাবে কেন?

বক্তৃতা দিলাম, গানও করলাম এক বিরাট হলে। কিছু চাঁদাও পেলাম আশ্রমের জন্যে—হাজার খানেক হবে। পরদিন হঠাৎ এক ভদ্রলোক—মুলুকরাজ—এসে

আমাকে এক হাজার টাকার চেক দিয়ে গেলেন, বললেন—"দাত্রী আমার স্ত্রী শ্রীলা জনককুমারী মালহোত্র। তিনি আপনার শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছেন…" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পরদিন আমার গান—কলেজ হলে। শ্রীলা ধনদাত্রী আসবেন—বলেছিলেন ভর্তা শ্রীল মুলুকরাজ মালহোত্র। কিন্তু আসতে পারেন নি—জ্বর একশো চার।

পরদিন ডাক এল জায়ার কাছ থেকে—ভর্তা স্বয়ং এলেন নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে। সলজ্জে বললেন: "আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি একরোখা দেবী—বললেন: 'হোক তাঁর কাজ, আমাব অসুখ আমি যখন পর্বতের কাছে যেতে পাচ্ছি না, তখন পর্বতেরই আসতে হবে মহম্মদের কাছে।"

বুঝলাম দম্পতী উভয়েই বসেব কারবারী। বললাম খুশী হ'য়ে: "আচ্ছা, যাব মধ্যাহ্নভোজে।"

পরিচয় হ'ল। দেখলাম মস্ত বাড়ী—প্রচুর অর্থ—একান্নবর্তী পরিবার—পাঁচটি ভাই, সবাই কৃতী, পাঁচটি বনিতা সবাই শিক্ষিতা সুকুমাবী · ইত্যাদি।

শ্রীলা দাত্রী ভার্যা একটিও কথা বললেন না—তবে ভর্তা আমার জন্যে একটি মস্ত ডিনাব দিলেন বহু অর্থব্যয় ক'বে যথাবিধি আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'বে ফেব কিছু প্রণামী। মন হৃষ্ট। কাজেই যখন তাঁরা নিমন্ত্রণ কবলেন তাদের ওখানে দুচাবদিন থাকতে তখন আমি সানন্দেই রাজী হলাম।

ইতিমধ্যে আমার নিমন্ত্রণ ছিল আমেদাবাদে তথা বরোদায়। স্থির হ'ল—উভয়ত্রই চ্যারিটি কন্সার্ট ও ভাষণ দিয়ে আশ্রমেব জন্যে বেশ কিছু প্রণামী সংগ্রহ ক'রে প্রয়াণ করব কলকাতায়—পথে জব্বলপুবে "যাত্রাভঙ্গ" ক'রে। নিমন্ত্রণ ছিল শ্রীলা দাত্রীর—যাঁর মুখে সৌকুমার্যের ছাপ দেখে বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহীও হ'য়ে উঠেছিলাম শুনে যে, তিনি আধুনিক শ্রেষ্ঠ ইংবাজ লেখকদের রচনার রসগ্রাহিনী।

অতঃপর ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সিংহল-প্রয়াণ। সেখান থেকে বাঙ্গালোবে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার সুরম্য হর্ম্যে আতিথ্যস্বীকার। সেখান থেকে সোজা আমেদাবাদ। উপলক্ষ—বন্ধুবর আম্বালাল সরাভাইয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ভারতীর বিবাহ ডেনিস নামে এক ইংরাজ যুবকের সঙ্গে। ভারতীর প্রসাদে সমর্সেট মমের নাট্যগ্রন্থাবলী প'ড়ে পুলকিত হ'য়ে আম্বালালের সঙ্গে আলোচনা করছি—দিল্লী গিয়ে গান্ধিজির কাছে কী গান গাইব এমন সময়ে এক জরুরি তার। খুলে হেসে বন্ধুকে দিলাম। তারে ছিল: "Please break journey here wife Janak Kumari." আম্বালাল একগাল হেসে বললেন: "ভারতীর বিয়ের আগেই তুমি

বিয়ে ক'রে ফেলেছ চোরা গোপ্তা?" বলা বাহুল্য wire-কে তারকর্তা নবজন্ম দিয়েছিলেন wife রূপে। যাই হোক—কলহাস্য হ'ল প্রচুর—আম্বালাল পরিবারের প্রত্যেকেই খিলখিলিয়ে সে-হাস্যকে সিমফনি ক'রে তুললেন।

অতঃপর অক্টোবরে দিল্লীতে মহাত্মাজির প্রার্থনা সভায় উপর্যুপরি তিনদিন ভজন গেয়ে প্রয়াণ জব্বলপুর। কিন্তু শ্রীমতী জনককুমারী একেবারে নিশ্চুপ। তাঁর জা-রা কলভাষিণী হ'য়ে আমাকে বললেন এক গঙ্গা কথা, কিন্তু জনককুমারী হুঁ হাঁ ছাড়া কোনো কথাই বললেন না। তবে তিনি এক হাজার টাকা প্রণামী দিলেন আমার জন্মদিনের উপহার—অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে।

কলকাতায় তার পেলাম জনককুমারীর: "আমি আঁধারে হাৎড়াচ্ছি, আপনার কাছে আলো চাই।" উত্তরে তার করলাম ফেব্রুয়ারিতে পণ্ডিচেরি আসতে। অতঃপর একদা এক শিখ বন্ধু, মুলুকরাজ বেদী, আমাকে বললেন: "জনকের কাছে চলুন সে বড় মনঃকষ্টে আছে। না, কোনো বৈষয়িক সমস্যা নয়—জানেনই তো জনকের পিতৃদেব ক্যাপ্টেন কৃপারাম ক্রোরপতি, স্বামীও প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার—অর্থ এ-পরিবারের পোষমানা পাখী। জনক চায় আপনার উপদেশ—সে স্বভাবে স্বপ্নালু—আদর্শপন্থিনী··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমার জব্বলপুরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কোনোমতেই সময় ক'রে উঠতে পারলাম না। কর্মচক্রে ঘূর্ণ্যমান হ'য়ে হাঁপিয়ে ওঠা সত্ত্বেও কর্মফলকে এড়ানো সম্ভব হ'ল না—সারা ভারতের নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্টের ব্যবস্থা—"নিশ্বাস ফেলারও ফুর্সৎ নেই"—যাকে বলে।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে আমার জন্মদিনে জনককুমারীর অভিনন্দন এল, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি: "আমি অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পথ না দেখালে ··" ইত্যাদি।

আমি উত্তরে লিখলাম স্পষ্টাক্ষরেই: "আমি নিজে জিজ্ঞাসু, তোমাকে পথ দেখাব কেমন ক'রে? তবে যদি চাও তো এসো সোজা পণ্ডিচেরি। আমার অতিথি হ'য়ে থাকবে আমি তোমাকে শ্রীঅরবিন্দের হাতে সঁপে দিতে চাই। পথ দেখাতে পারেন কেবল তিনি ··" ইত্যাদি।

এ-চিঠিগুলি সম্ভবত আমার দপ্তরে এখনো আছে, খুঁজলে মিলবে। আরো দুতিনটি পত্র চালাচালির পর জনককুমারী লিখল সে একাই আসছে উড়ে ১৯.২.৪৭ তারিখে। আমি মান্দ্রাজে গেলাম ১৮ই। ১৯এ তাকে নিয়ে উঠলাম মান্দ্রাজে যশোদানারায়ণ ঘোষ নামে এক প্রিয় গুরুভাইয়ের ওখানে। পরদিন মোটরে অভিযান—পণ্ডিচেরি। জনককুমারী আমার কাছেই রইল, বলাই বাহুল্য। অতি

অমায়িক, কিন্তু মৃদুভাষিণী—সৌজন্যে নিখুঁৎ, কিন্তু গভীর জলের মীন—ধরবে কে? আমাকে কিছুই বলল না। আমি একটু নিরাশ হলাম কিন্তু বুঝলাম যে "বরফ ভাঙার" দেরি আছে। ভাঙল দর্শনের দিন—২১এ ফেব্রুয়ারি, শ্রীমার জন্মদিনে।

২১এ দর্শনের পরে ঘটল প্রায় অঘটন: আমরা আশ্রম থেকে ফিরে ধ্যানে বসতেই জনককুমারীর নিশ্চল সমাধি!

এ কী ব্যাপার!! তিন ঘণ্টা পরে ওর বাহ্য সংজ্ঞা ফিরে এল। চোখে জল, কিন্তু মুখে কথা নেই। এ-তিনঘণ্টা ওর সমাধি দেখে অনেক সাধক সাধিকা ছুটে এসে ওকে পরিক্রমা ক'রে গেলেন—কিন্তু ওর সেই এক অবস্থা—স্থির, শান্ত, ভাবমুখী। আমিও অবাক্, আরো অনেকে বাঙ্‌মূঢ়। কিন্তু তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে নি—পরে খবর পেলাম। "এ কখনো হয়? আমাদের সমাধি হয় না, অথচ ও বাইরের সংসারী মেয়ে ওর দর্শন হ'তে না হ'তে সমাধি···!" ইত্যাদি।

কিন্তু আমার অবিশ্বাস হয় নি, কারণ আমি জানতাম ও স্বভাবে গোপনিকা—reserved—অভিনেত্রী হ'তেই পারে না। তাছাড়া ওর মুখের সে ভাবাবস্থার ফটো আছে—দেখলে কোনো দরদী দর্শকের মনেই সংশয় আসতে পারে না। অবশ্য বেদরদীর কথা আলাদা।

॥ উনচল্লিশ ॥

যথাবিধি গুরুদেবকে সব লিখে জানালাম—খুঁটিয়ে। তিনি চিঠিতে উত্তর দিলেন যে, ওর advanced consciousness এবং এ-সমাধির নাম সবিকল্প সমাধি। শ্রীমা বললেন: "দেখো, ওর সমাধির সময়ে কেউ যেন ওকে না ছোঁয় কি জাগায়। খুব সাবধান!" শ্রীমা-র ওর পরে স্নেহ বরাবরই সমান গভীর ও মধুর ছিল। ওকে ভালোবেসে তিনি কত যে কথা বলতেন! · কিন্তু সে যাক, ওর কথাই বলি।

বলেছি, "বরফ ভাঙল"। ও একটু একটু ক'রে বলা সুরু করল ওর মনের, প্রাণের, অন্তরের কথা। তার চুম্বক হ'ল এই: ওর কোনো অভাবই নেই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবী সবাই ওকে স্নেহ করে অকৃত্রিম। ও-ও সবাইকে ভালোবাসে। দাম্পত্য জীবনেও স্বামীর প্রতি ওর প্রীতি অটুট। কিন্তু সব থেকেও যেন কিছুই নেই, কিছুই ভালো লাগে না। অথচ ও গুরুবাদে বিশ্বাস করে না, তাই চায় না কারুকে গুরু করতে। কেবল একটি জিনিষ চায়—আমি ওকে পথ দেখাই, বলি ওকে কী করা উচিত—কিসে এ দুঃসহ রাত পোহাবে·· ইত্যাদি।

আমি ওকে বললাম শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করতে। ও হাঁ না কিছুই বলল না। তখন সব জানিয়ে গুরুদেবকে লিখলাম। তিনি লিখলেন: "ও যদি চায় তো আমি ওর গুরু হ'তে পারি।" কিন্তু ও বলল: "না, আমার গুরু যদি কেউ থাকে সে তুমি।"

আমি চমকে উঠলাম: "তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি সাধক, জিজ্ঞাসু মাত্র —তোমার গুরু হব কোন্ অধিকারে? তুমি মিথ্যে রোখ ক'রে হেলায় হারিও না এ-দুর্লভ সুযোগ। শ্রীঅরবিন্দ সহজে কাউকে দীক্ষা দিতে চান না। আমাকে তো ফিরিয়েই দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে—বলেছি তোমাকে। তুমি পরম ভাগ্যবতী যে, আসতে না আসতেই তিনি রাজী হয়েছেন তোমার গুরু হ'তে···" ইত্যাদি।

হায় রে, ওর সেই এক ধুয়া: "না। শ্রীঅরবিন্দকে আমি গভীর ভক্তি করি। কিন্তু আমার অন্তর যদি কাউকে গুরুবরণ করতে চায় সে তুমি, আর কেউ নয়।"

"অসম্ভব।"

"বেশ। তাহ'লে আমি ফিরে যাই—কালই।"

আমি অগত্যা ফের শ্রীঅরবিন্দকে লিখলাম—বেশ একটু বিমর্ষ হ'য়েই বলব—যে, জনককুমারী হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চাইছে—অবোধ ও অন্ধ ব'লে। আপনি ওর চোখের ঠুলি খুলে দিন—যাতে ও দেখতে পায়—ও কী পেতে পারে যদি চায়।

শ্রীঅরবিন্দ তাতে লিখলেন: "ইন্দিরাকে তুমিই আমাদের কাছে এনেছ, তুমিই তার সহায় হ'য়ে এসেছ, তাকে পথ দেখিয়েছ। আমাদেরকে সে মনে করে তোমার গুরু···তুমি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ—তার প্রয়োজনও আছে এ-সাহায্যের।··· আর তুমি শুধু তাকে নয় আরো অনেককে সাহায্য করেছ, আমাদের দিকে ফিরিয়েছ যারা নিজে থেকে আমাদের দিকে ফিরত না। তোমার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে অপরকে আকর্ষণ করার—শুধু ভগবান্ নয় প্রকৃতিও তোমাকে এ-শক্তি দিয়েছেন ভগবৎসেবার জন্যে।···তাঁর দেওয়া নানা শক্তিকে যদি তাঁর কাজে লাগাও তাতে প্রত্যবায় ঘটতে পারে না যদি তুমি সে-শক্তির সুনিয়োগ করো।" (৬.১২.৪৯)

আমাকে গুরুদেব চলাফেরার স্বাধীনতা দিতেন খুবই বেশি। শুধু তাই নয় এমন অনেকেই আশ্রমে আসার অনুমতি পেয়েছে যারা বারবারই অনুমতি চেয়ে নিরাশ হ'য়ে আমার ঘটকালিতে আসতে পেরেছিল। একবার আমার এক ব্যারিস্টার দর্শনার্থী বন্ধু নাগপুর থেকে তার নানা উপলব্ধির ফিরিস্তি দিয়ে আমাকে লেখেন শ্রীঅরবিন্দকে দেখাতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠি প'ড়ে ব'লে পাঠান—"না"। ব্যস। তার পরেই পুনশ্চঃ "তবে যদি দিলীপ অনুরোধ করে তবে তিনি আসতে পারেন।" এমন কি, কয়েকটি সমাজ বহির্ভূতাও আমার ফ্ল্যাটে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন

যাঁদের অন্য কোথাও ঠাঁই হয় নি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য অঘটন ঘটল জনককুমারীর বেলায়। আশ্রমে আর কোনো সাধকই আর কাউকে শিষ্য করার অনুমতি পায় নি। জনককুমারীই প্রথম অনুমতি পেল দিলীপকুমারের মন্ত্রশিষ্যা কন্যাশিষ্যা হ'তে। এতে অনেকেই অবাক্ হয়েছিলেন, কিন্তু গুরুদেব লিখলেন আমাকে যে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন এই জন্যে যে, জনককুমারী আমার সাধনসঙ্গিনী হ'লে আমার সাধনার প্রগতি হবে। শ্রীমাকে ও রোজ প্রণাম করতে যেত। তিনি প্রায়ই ওকে ঘরে ডেকে নিরালায় ওর নানা দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। একবার বলেছিলেন প্রকাশ্যেই: "She has a rare power of true vision." এইসব শুনেও বটে আর ওর সবল আন্তরিকতা ও গুরুভক্তির জন্যেও বটে—আমি ওকে শেষে হতাশ হ'য়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলাম। তারপরেই "পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—মীরার আগমনী। সব বলতে গেলে চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা হ'য়ে যাবে মীরার কাহিনী—তাঁর হিন্দিভজন, আত্মকথা, নানা ভাগবতী বাণী, মঞ্জু কথিকা ইত্যাদি। (কিছু কিছু লিখেছি এ-সম্পর্কে "শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি"-র ভূমিকায়, পরে—সম্প্রতি—আমাদের PILGRIMS OF THE STARS-এ) তাই এখানে শুধু দুচারটি কথার পুনরুক্তি করতে চাই—যা না বললেই নয়। তাছাড়া যখন অন্যত্র মীরার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কাহিনী সুরু করেছি তখন সারা করতে হ'লে কয়েকটি অঘটনেরও পুনরুল্লেখ করতে হবে যদিও জানি অনেক বুদ্ধিমন্ত ক্রিটিক শুধু যে বিশ্বাস করবেন না তাই নয়—সস্তা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীরন্দাজি করতেও ছাড়বেন না। প্রসঙ্গত, যৌগিক অঘটন সম্বন্ধে আমি একদা শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করেছিলাম ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে।* আমার মুখ্য জিজ্ঞাসা ছিল—তিনি কেন এ-সম্বন্ধে নীরব থাকতে চান। উত্তরে তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন তা থেকে একটু উদ্ধৃতি করি:

"If I write about these questions from the yogic point of view, even though on a logical basis, there is bound to be much that is in conflict with current opinions e.g. about miracles, the limit of judgment of sense-data etcetera. I have avoided as much as possible writing about these subjects because I would have to propound things that cannot be understood except by

* আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম যে, এটুকু আমি ঠেকে শিখেছি যে, নানা যোগবিভূতিকে অনেকে ব্যঙ্গ করেন নিজের মান বাঁচাতেই—বুঝতে পারছি না বলতে মগজী বুদ্ধির অভিমানে আঘাত লাগে ব'লে। নৈলে কি স্বামী বিবেকানন্দও প্রথম দিকে পরমহংসদেবের নানা দর্শনাদির কথা শুনে রায় দিতেন: "ও-সব কল্পনা, মনের ভুল—বাস্তব সত্য নয়?"

reference to other data than those of the physical senses or of reason founded on these alone. I might have to speak of laws and forces not recognised by reason or physical science. In my public writings and my writing to *sadhakas* I have not dealt with these because they go out of the range of ordinary knowledge and the understanding founded on it. These things are known to some, but they do not usually speak about it, while the public view of much of those that are known are either credulous or incredulous, but in both cases without experience or knowledge."

[ভাবার্থ : আমি যদি এসব প্রশ্ন নিয়ে যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখি, যুক্তিবাদের ভিতে দাঁড়িয়ে লিখলেও এমন অনেক কিছু আমাকে লিখতেই হবে যা চলতি মতো মতের সঙ্গে আদৌ মেলে না—যথা অঘটন, ইন্দ্রিয়বোধলব্ধ নানা বিচারের দৌড় কতদূর···ইত্যাদি। আমি এসব সম্বন্ধে পারৎপক্ষে বেশি লিখি নি, কারণ লিখতে হ'লে এমন অনেক ভূমিকার অবতারণা করতে হ'ত যাদের বোঝা যায় না যদি না ইন্দ্রিয়বোধলব্ধ তথ্যের বহির্ভূত তথ্যকে—বা যেসব তথ্য ইন্দ্রিয়বোধভিত্তি যুক্তির এলাকার বাইরে তাদের না পেশ করা যায়। অর্থাৎ আমাকে বলতে হ'ত এমন অনেক শক্তির বা প্রাকৃতিক বিধানের কথা যা যুক্তি বা জড়বিজ্ঞানের দরবারে নামঞ্জুর। আমার নানা লেখায় বা পত্রে আমি এসব ব্যাপার উহ্য রেখেছি কারণ চলতি জ্ঞান বা বুদ্ধি এদের নাগাল পায় না। এসব নিগূঢ় সংঘটন সম্বন্ধে কেউ কেউ ওয়াকিবহাল, কিন্তু সচরাচর তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন, আর গণমন এসব সম্বন্ধে হয় সংশয়ী, নয় কানপাতলা—অর্থাৎ উভয়ত্রই তাদের না আছে অভিজ্ঞতা না জ্ঞান।]

কিন্তু আমি আমার নানা লেখায়—প্রবন্ধে কবিতায় রমন্যাসে, স্মৃতিচারণে অঘটনের কথা লিখেছি ব'লে এখন আর পেছুনো যায় না—নাচতে নেমে ঘোমটা টানা বিড়ম্বনা। তাই অনেকে অবিশ্বাস করবেনই করবেন জেনেও লিখে যাব সরল-ভাবে লোকে বাঁকা বা অসরল হাসি হাসলেও। একদা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিলব্ধ বাণীকেও তো লোকে হিস্টিরিয়া ব'লে নাকচ করত। এখনো অনেক যুক্তিবাদী মনে করেন সমাধি দর্শনাদি সবই কল্পনার গল্পকথা। আমি নিজে যখন জানি আমি সত্য কথাই বলছি তখন পাঁচজনে তাকে মিথ্যা ব'লে দেগে দিলে আমার কী ক্ষতি হ'তে পারে—বিশেষ যখন আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে উপনিষদের কথা: "সত্যমেব জয়তে—নানৃতম্"—অন্তিমে সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার না। বলতে ভুলেছি, ওকে দীক্ষা দেওয়ার পরে ওর নাম দেওয়া হ'ল—আশ্রম নাম—ইন্দিরা।

হ'ল কি, ইন্দিরার কাছে মীরা এসে গান গাইতে স্বরু করলেন, পরে নানা আত্মকথা বলতেও তাঁর একটুও বাধল না। দিনের পর দিন চলল এই আশ্চর্য দর্শন, কথন, কীর্তন। আরো আশ্চর্য, ইন্দিরার মনে থাকত মীরার অপূর্ব ভজনাবলি—অশ্রান্ত একটানা মীরা গেয়ে যান, ইন্দিরা সমাধিতে শুনতে থাকে, পরে সমাধি থেকে ব্যুথিত হ'য়ে ভাবমুখে আবৃত্তি করে কী শুনেছে আর আমি টুকে নিই খাতায়। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে খাতার পর খাতা ভ'রে ওঠে ইন্দিরার আবৃত্ত মীরা ভজনে—একুনে আটশোর কম হবে না। স্বরু হয়েছিল গান শোনা ১৯৪৯ সালে, এবৎসর (১৯৫৪) জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিয়েছে তুটি গান।

আর শুধু গানই তো নয়—অপূর্ব ভক্তির অমৃত ধারা ব'য়ে চলেছে নির্ঝর ঝঙ্কারে! আমি এ গানগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি "তারাঞ্জলি" ও "ভাবাঞ্জলি"-তে। এরপরে "উষাঞ্জলি"-রও ৫০টি গানের অনুবাদ করেছি—অদূব ভবিষ্যতে ছাপা হবে আশা করি। এ-গানগুলি আমি যত্র তত্র গেয়ে থাকি মূল হিন্দিতে তথা বাংলা অনুবাদে। আমাব কাছে এ-গানগুলি ঠাকুরের সাক্ষাৎ বরদান। কারণ—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে—এ-গানগুলি আমার সাধনার সহায় তথা পথের পাথেয় হ'য়ে এসেছে। "শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি"-র ভূমিকায় আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভাই ডঃ ইন্দ্রসেন এ-গানগুলির সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসেই লিখেছেন অনেক কিছু। শেষে দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের তিন তিনটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি। এখানে একটি কথা বলি: ইন্দিরার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। কিন্তু ওর নানা বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে উর্দুতেই কথা বলে। লেখেও উর্দু হরফে। উর্দুতে ওর কয়েকটি গান আছে—সেগুলির প্রণেত্রী ও নিজে। কেবল মীরা ভজনগুলি ওর দিনের পর দিন শোনা গান। তাই ওর প্রথম ভজনাবলি ছাপা হয় পণ্ডিচেরি আশ্রমে: "শ্রুতাঞ্জলি"। দ্বিতীয় সংস্করণে "প্রেমাঞ্জলি"-র গানগুলিও জুড়ে দেওয়া হয়। তার পরে যথাক্রমে ছাপা হয়—সুধাঞ্জলি, দীপাঞ্জলি, ভাবাঞ্জলি ও উষাঞ্জলি। এরপরে ছাপা হবে বিভাঞ্জলি। কিন্তু তার দেরি আছে। আর একটি কথা এই সম্পর্কে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগে আগে ও মীরার মুখে যে-গানগুলি শুনতো সে-গানগুলির স্বর ওর মনে থাকত না—তাই ওর আবৃত্ত গানগুলি আমিই গাইতাম স্বর বসিয়ে। সম্প্রতি ও স্বরগুলিও অনেক সময়েই গেয়ে শোনায়—আমি তক্ষণি স্বরলিপি ক'রে নিই। এগুলি আমার "সুরাঞ্জলি" স্বরলিপি গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।* স্বর ও গানগুলির আমি প্রচার চাই, তাই পাদটীকায় ঠিকানা দিলাম—কোথায় প্রাপ্তব্য।

---

* প্রকাশক—সুরকাব্যসংসদ, ১৯ জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা ১৩। মূল্য ২০ টাকা। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স-এর এখানেও প্রাপ্তব্য: ৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭।

ইন্দিরার অভ্যুদয়ের পরে অঘটনের পর অঘটন ঘটতে লাগল শুধু আমার নয়—আরো দশ বারোজনের চোখের সামনে। সে-সব অঘটনের কথা অন্যত্র বলেছি—আমার নানা লেখায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেও এ-ও বলেছি যে, আমার কাছে সবচেয়ে বড় অঘটন ইন্দিরার এই অবিশ্রান্ত নির্ঝরধারায় গানের আনন্দ বিতরণ করা। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। বলেছি, আমি আবাল্য ভালোবেসে এসেছি কবিতা (সাহিত্য) ও গান। সারা ভারতে একদা আমি ভ্রাম্যমান হয়েছিলাম গানের খবর নিতে—শুধু ওস্তাদী গানের নয় ভজন কীর্তনেরও—বিশেষ ক'রে মীরাবাইয়ের গান। ১৯২৪ সালে সেস্থন হাসপাতালে আমি মহাত্মাজিকে মীরা ভজন শুনিয়ে ধন্য হয়েছিলাম। তারপর কত আসরে তুলসীদাস, স্থরদাস, দাদু প্রমুখ মরমিয়াদের গান গেয়ে পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছি। এ-হেন গান পাগল মানুষকে ইন্দিরা দিল অপরূপ গানের পর গান—যার পরে আর কোনো হিন্দিগানই গাইতাম না—এক তুলসীদাসের দু একটি ভজন ছাড়া। আমার সত্যিই মনে হ'ত ইন্দিরা প্রস্থত মীরাভজন গাইতে গাইতে যে, এসূত্রে আমি মীরার রূপাপরিধির মধ্যে প্রবেশ করেছি। আরো একটি কথা বলি এ-প্রসঙ্গে: চিত্তাকর্ষক।

১৩ই মে, ১৯৫০ তারিখে ইন্দিরা একটি অতি চমৎকার গান আবৃত্তি করে—যে-গানটি আমি সে সময়ে প্রায়ই গাইতাম এক নতুন ধরণের স্থর দিয়ে। কিন্তু এ-গানটি যে একটি দৈববাণী তথা মীরার ভবিষ্যদ্বাণী সে কথা উপলব্ধি করেছিলাম অনেক বৎসর পরে—যখন মীরার গানের সংখ্যা তিনশোকে ছাড়িয়ে উঠেছে। মূল গানটি অপরূপ উপমায় ভরা—অথচ প্রতি চরণে ভক্তির উছলধারা:

পূজা করনে আই পূজারিন, হরিগুণগানে আঈ হূঁ।
মন মন্দিরকে খোল দুয়ারে, পিয়া রিঝানে আঈ হূঁ।
চাঁদসে চন্দন, রৈনসে কজরা, টীকা তারোঁসে লাঈ।
কলীসে হঁসনা নদীসে চলনা, পবনসে লী শীতলতাঈ।
হরিচরণনমে মালা বাহোঁকী পহনানে আঈ হূঁ।
হৃদয়দীপমে হরিপ্রেমকী জ্যোতি জলানে আঈ হূঁ।
উনকী মেরী প্রীত পুরানী, জনম মরণকে মীত পিয়া।
প্রভু সাগর হৈঁ, তরঙ্গ হূঁ মৈ, সাজ হূঁ মৈ, সঙ্গীত পিয়া।
তনমন অর্পণ কর প্রীতমমে আজ সমানে আঈ হূঁ।
ফির মীরাকী প্রেমকহানী সুনো, সুনানে আঈ হূঁ॥

তারাগুলি-তে এর অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে :

এসেছি পূজার তরে পূজারিণী, শ্যামলের গান গাহিতে।
মনোমন্দির-দ্বার খোল্—আজ চাই তার প্রীতি সাধিতে।
চাঁদ হ'তে সোনা, কুঁড়ি হ'তে হাসি, সমীরণ হতে শীতলতা,
কাজল রজনী হ'তে, তারা হ'তে টীকা, নদী হ'তে উছলতা,
বাহুবন্ধনমালয় চরণ চাই আমি তার বাঁধিতে।
অন্তরদীপে চাই কান্তের প্রেমদীপ আজ জ্বালিতে।
জনমে মরণে বন্ধু সে, তারে ভালোবাসি আমি ব্রজবালা।
সিন্ধু সে, আমি লহরী, বীণা সে, আমি মূর্ছনা রাগমালা।
তনুমন প্রাণ সঁপি প্রিয়তমে তারেই চাই আরাধিতে।
মীরার প্রেমের কাহিনী এসেছি নবসুরে ঝঙ্কারিতে।

শেষ চরণটি যখন গাইতাম ২৪ বৎসর আগে তখন কে ভেবেছিল মীরা কেবল এ-গানটি শোনাতেই আসেন নি, ঐ সঙ্গে কথা দিয়েছিলেন এ-যুগেও আবার মীরার গান শোনাতেই তাঁর শুভাগমন! মারা কথা রেখেছেন—শুনিয়েছেন ৮০০ গান—আরো শোনাবেন—যার প্রেম অফুরান তার গান ফুরোবে কেমন করে? কিন্তু এবার ফিরে খেই ধরি—ইন্দিরার কথা বলি।

ইন্দিরা যখন আমাকে বলে আমিই তার গুরু, আর কেউ নয়, তখন আমি আনন্দিত হ'লেও উদ্বিগ্নও হয়েছিলাম বৈ কি। এ-হেন প্রবুদ্ধা শিষ্যার ভার নেওয়া তো চাট্টিখানি কথা হয়! তাছাড়া গুরু হবার কোনো সাধই আমার ছিল না। দেখি নি কি গুরু হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, শ্রীমার ক্লান্তি? এ যে পারে সে আপনি পারে—আমি পারি না, পারি না, পারি না। মহাভারতে পাই আপ্তবাক্য : লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি—অর্থাৎ travel light.

কিন্তু যে-শ্রীমন্তিনী দিনের পর দিন গান দিয়ে চলেছে—যার মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে—যার মনের বল দেখে আশ্চর্য হ'তে হয় (দু'বছরের ছেলে প্রেমলকে ছেড়ে এসেছিল সে—তার উপর আত্মীয় স্বজন স্বামী পিতামাতা সবাই তার আশ্রমবাসের বিরুদ্ধে)—যার আলাপে শ্রী, হাসিতে শ্রী, নৃত্যে শ্রী, বিনয়ে শ্রী, অথচ সেই সঙ্গে শিখবার আগ্রহ জানবার আগ্রহ সেবার আগ্রহ অন্তহীন [সে জব্বলপুরে দু-দুটি অনাথাশ্রম চালাত] যার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, চরিত্র পবিত্র, ক্রোরপতির আদরিণী কন্যা হ'য়েও যার অর্থে আসক্তির লেশও নেই—সর্বোপরি দেবকুমারী রাজবালা মীরা যার অন্তরঙ্গা (alter ego) তাকে প্রত্যাখ্যান করা কি হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলার সামিল নয়?—এইরকম আথাল পাথাল চিন্তা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করত।

॥ চল্লিশ ॥

কিন্তু ওর ছিল এক দুরারোগ্য ব্যাধি—হাঁপানি—cardiac asthma—আরো নানা ব্যাধি। সে সব থাক। ও ফিরে গেল কয়েক মাসের জন্যে জব্বলপুরে—কিন্তু পথেই রক্তবমন। সেখানে গিয়ে শয্যাশায়ী। আমাকে ওর স্বামী তার করতে আমি ভয় পেয়ে ওকে লিখলাম—যদি বাঁচতে চাও শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ ক'রে ডাকো। উত্তর এল—"আমার আর বাঁচবার সাধ নেই"। ওর স্বামী মুলুকরাজ তার করল—ও মুমূর্ষু—কেবল আমিই ওকে বাঁচাতে পারি। শ্রীঅরবিন্দ অনুমতি দিলেন তৎক্ষণাৎ। আমি সেই দিনই রওনা হলাম।

জব্বলপুরে মনে অন্ধকার ছেয়ে এল। শুধু শয্যাশায়ী নয়—মুখে মৃত্যুর ছায়া। বললাম: "না, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না—গুরু কি শিষ্যাকে ছাড়তে পারে?" তখন ওর মুখে হাসি ফুটল প্রথম। আমি মনে মনে বললাম: "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?" যা ভবিতব্য তাকে খণ্ডাবে কে? অস্থির গুরুকে হ'তে হ'ল কায়েম।

তারপর যমে মানুষে টানাটানি! দিনের পর দিন আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখি, তিনি ধ্যানে বসেন—শক্তি পাঠাতে। একটু সারে—আবার পড়ে। শেষে আমি লিখলাম: "গুরুদেব, আমি চোখের উপর ওর মৃত্যু দেখতে পারব না—আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।" গুরুদেব তার করলেন থাকতে। তার পরেই তাঁর চিঠি এল [তিনি প্রায়ই লিখতেন এসময়ে ইন্দিরার খবর খুঁটিয়ে জানতে চেয়ে]:

"I will try to the end; for my experience is that even a hopeless effort in the working of the spiritual force is often better than none and can bring in the intervention of the miracle." (10. 1. 50)

[আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব; কারণ আমার একটি অভিজ্ঞতা এই যে যেখানে কোনো আশাই নেই সেখানেও অধ্যাত্ম শক্তির প্রয়োগ করা হাল-ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে ভালো কেন না এ-প্রয়োগের ফলে অঘটনের আকস্মিক আবির্ভাবে অভীষ্ট ফল মিলতে পারে।]

উত্তরে আমি লিখলাম [আমার SRI AUROBNIDO CAME TO ME দ্রষ্টব্য]: "আমার অঘটনে বিশ্বাস নেই গুরু!...তাই মনে হয়—তোমাকে কোনো দুর্দান্ত (major) অঘটন তলব করতে হবে।"

আশ্চর্য, এই দুর্দান্ত অঘটনই ঘটল গুরুদেবের অশ্রান্ত শক্তিপ্রয়োগে। কিন্তু আমার মনে তবু একটু সংশয় ছিল—যে, দেহ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে দৈবী শক্তির কাছে প্রার্থনা করা কি উচিত? তাই লিখলাম তাঁকে খুলে হৃষ্ট হ'ওয়া সত্ত্বেও ক্লিষ্ট সুরে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঠাকুরের কাছে রোগমুক্তি চাইতে নেই। উত্তরে গুরুদেব লিখলেন এক দীর্ঘপত্র। তার মর্ম এই যে, সব যোগীই দেহকে হেনস্থা করেন না, বলেন শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—তিনি নিজে চিরদিনই এই মত পোষণ ক'রে এসেছেন। তাছাড়া, তিনি অধ্যাত্মশক্তি দিয়ে কোনো বাঞ্ছনীয় ফললাভ করতে চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখেন না—যথা রোগমুক্তির বা স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা। ব'লে লিখলেন (৭. ১২. ৪৯): "আমি দেহ মন প্রাণকে মনে করি দিব্যসত্তার অংশ কাজেই অবজ্ঞেয় হ'তে পারে না।...বস্তু (Matter) আসলে আত্মারই ছদ্মবেশী রূপ, তাই তাকে জাগিয়ে অন্তর্লীন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করানো যেতে পারে। দিব্য লীলায় সে কেন অংশীদার হ'তে পারবে না?" তাঁর *Perfection of the Body* শীর্ষক নিবন্ধে (Bulletin of Physical Education, April, 1949) তিনি চমৎকার ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুর এই দেবসত্তা সম্বন্ধে, লিখেছেন:

"Matter is the field and the creation of the Inconscient and the perfection of the operations of inconscient Matter. Their perfect adaptation of means to an aim and end, the wonders they perform and the marvels of beauty they create, testify, inspite of all the ignorant denial we can oppose, to the presence and power of consciousness of this superconscience in every part and movement of the material universe."

[ভাবার্থ: বস্তু হ'ল অসংজ্ঞার ক্ষেত্র তথা সৃষ্টি। নিঃসংজ্ঞ বস্তুর নানা ক্রিয়ার পূর্ণিমাপরিণতি, আশ্চর্য কৃতি ও অপূর্ব সৃষ্টি আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, আমরা না জেনে বস্তুকে হেনস্থা করা সত্ত্বেও এ-বস্তুবিশ্বের নানা স্থূল অংশে তথা গতিবিধিতেও এক তুরীয় চেতনা শক্তি ও সত্তা জাগ্রত।]

কিন্তু ফিরে যাই ইন্দিরার বিবর্তনের আরো কিছু খবর দিতে। মুস্কিল এই—ওর সম্বন্ধে বলবার কথা এত অপর্যাপ্ত যে, সংক্ষেপ করতে হ'লে কোনটা বাদ দেব ভেবে পাওয়া ভার। ওকে কেন্দ্র ক'রে যে-সব বিচিত্র অঘটন ঘটেছে সেসব অন্যত্র বলেছি—বিশেষ ক'রে আমার "স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে" ও "PILGRIMS OF THE STARS"-এ। সেসব বিবৃতিকে অনেকে ভুল বুঝেছেন যৌগিক শক্তির বিশেষ কিছু না-জানার দরুণ। এ-পথের পথিক যাঁরা হন তাঁদের অনেকেরই মধ্যে নানা

যোগবিভূতির অভ্যুদয় হয় যার ফলে ঘটে অঘটন। কিন্তু সব কিছুর মতন অঘটনেরও স্তর ভেদ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জগন্মাতা আসতেন—এ-অঘটন, আর তাঁর মথুরবাবুকে দেখানো যে লাল জবার গাছে সাদা জবাও জন্মায় এ-অঘটন এক স্তরের অঘটন নয়। কোনো যোগীর মধ্যে যখন দূরদর্শনের বা দূরশ্রবণের (clairvoyance বা clairaudience) উপলব্ধি হয় তখন তাঁর মধ্যে যে-দৈবশক্তি সক্রিয় হয় সে-শক্তির সঙ্গে তুলনা হয় না যখন তাঁর দিব্যনেত্রে ফুটে ওঠে মা দূর্গার রূপ বা অন্তঃশ্রুতিতে বেজে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি। যোগীর অভিসার অসৎ থেকে সৎ-এর রাজ্যে, আঁধার থেকে আলোর রাজ্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতের রাজ্যে। মধ্যপথে এই সব যোগবিভূতির লীলাখেলা—যেসব রাজ্যের শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন intermediate zones. যাঁরা বলেন এসবই অবজ্ঞেয় তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। এ-সবেরই স্থান আছে—কেবল কার কোন্ পদবী তারা বলতে পারে না যাদের যৌগিক কোনো উপলব্ধিই হয় নি। কিন্তু যে-একান্তীর লক্ষ্য ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সে মধ্যপথের নানা ক্ষণবিলাসে বাঁধা না পড়লেও মানে সকৃতজ্ঞেই যে, এসব ক্ষণানন্দের ও কিছু না কিছু সার্থকতা আছেই আছে নৈলে তাদের অভ্যুদয় হবে কেন ? যোগের মহাসাম্রাজ্যে প্রতি মণিমুক্তারই কিছু না কিছু মূল্য আছে—যদিও সবচেয়ে বড় মণি—পরশরতন—ভগবান্, যাঁকে জানলে আর জানার কিছু থাকে না, উপনিষদের ভাষায়—নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। কিন্তু "দেহের খবর নিলেই আত্মার খবর মেলে না" এ-তিরস্কার মঞ্জুর হ'লেও, "দেহ পঙ্কিল অতএব তাকে ঘৃণা ক'রে আত্মার অভিসারে চলো" এ-আদেশ শিরোধার্য করা চলে না। সেণ্ট অগস্টীনের মতন বড় সাধু ওদেশে বিরল। তিনি বলতেন প্রায়ই : "খৃষ্ট যদি অঘটন ঘটতে অক্ষম হ'তেন তবে আমি খৃষ্টান হতাম না।" (Pascal-এর Pense'es দ্রষ্টব্য)

আমি এ-প্রসঙ্গে শুধু এই শাদা কথাটি বলতে চাইছি যে জীবনে কিছুই নিরর্থক নয়, তুচ্ছতম কণাও হেয় নয়। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সাবিত্রীতে :

> His ways challange our reason and our sense,
> By blind brute movements of an ignorant force,
> By means we slight as small, obscure and base,
> A greatness founded upon little things,
> He has built a world in the unknowing void,
> His forms He has massed from infinitesimal dust,
> His marvels are built from insignificant things.

পায় না পার্থিব বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অপার্থিবের দিশা
অজ্ঞান শক্তির এই অন্ধ জৈব ক্রিয়ার—যাদের
ছায়াভ নগণ্য হেয় বলিয়া আমরা করি হেলা
সেই ধূলিকণাভিত্তি 'পরেই রচেন ভগবান্
এ-বিরাট বিশ্বলীলা-সৌধ শূন্য নিঃসম্বিৎ ব্যোমে।

এত কথা বলছি আরো এই জন্যে যে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে তুচ্ছতমও আদরণীয় ব'লেই তিনি দেহকে আত্মার মন্দির ব'লে মনে ক'রে এসেছেন—বৈরাগীদের অবজ্ঞাত ক্ষণায়ু বস্তুকণার ক্লিন্ন সমষ্টি ব'লে গণ্য করেন নি। তাই তিনি চেয়েছিলেন ইন্দিরাকে নিরাময় করতে তাঁর অঘটনী যোগশক্তির জাদুবলে।

॥ একচল্লিশ ॥

ইন্দিরাকে নিয়ে সত্যিই হয়েছিল যাকে বলে যমে-মানুষে টানাটানি: একদিকে অন্ধকারের মারণশক্তি, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের তারিণী কৃপা। ইন্দিরাকে তিনি এত স্নেহ করেছিলেন যে সে তাঁর শিষ্যা হ'তে রাজী না-হওয়া সত্ত্বেও তাকে স্বহস্তে চিঠি লিখেছিলেন উপদেশ দিয়ে—যে-ইতিহাস ইন্দিরা নিজেই লিখেছে Pilgrims of the Stars-এ।

কিন্তু শুধু এই-ই নয়. তিনি ইন্দিরার খবর নিতেন প্রত্যহ যখন আমি জব্বলপুর থেকে তাঁকে চিঠি লিখতাম। এই দুর্লগ্নে আমাদের পরম সহায় ছিল আমাদের এক গুরুভাই—যোগেন্দ্র রস্তোগি। ধনীর সন্তান কিন্তু শুধু যে ধনগর্ব ছিল না তাই নয়, স্বভাবে ছিল দানশীল। ইন্দিরার সমাধি দেখে সে ওকে মা ডাকত। পরে আমরা পণ্ডিচেরি থেকে চ'লে আসতে সে ও চ'লে এসে আমাদের নিত্যসাথী ছিল পুনায় "ডানলাভিন কটেজে"—যখন আমাদের দারুণ দুর্লগ্ন। সে যে ইন্দিরার নানা অসুখে কী রকম সেবা করত সে-কথা ব'লে বোঝাবার নয়। এমন বিশ্বস্ত অনুরাগী বন্ধু বিধাতার দান, নিজের কোনো গুণে বা কৃতিত্বে অর্জন করা যায় না। ইন্দিরার অসুখে যখন আমি জব্বলপুরে আসি, তখন তাকে আমি আমার ফ্ল্যাটে রেখে এসেছিলাম—সেখানে সে দিনের পর দিন আমার চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পেত ও সোজা শ্রীঅরবিন্দের কাছে পেশ ক'রে আমাকে তাঁর উত্তর পাঠাত। শ্রীঅরবিন্দ অনেক সময়ে মৌখিক উত্তর পাঠাতেন যোগেন্দ্রের কাছে, সে তৎক্ষণাৎ আমাকে

জানাত—দরকার হ'লে টেলিগ্রামে, নৈলে চিঠিতে। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে প্রত্যহ ধ্যানে ইন্দিরাকে তাঁর যোগশক্তি পাঠাতেন, কারণ তার ফাঁড়া কতকটা কাট্‌লেও বিপদের ঘনায়মান ছায়া তাকে ঘিরে ছিল কয়েকমাস। বলা বাহুল্য যে, তাঁর করুণাই ইন্দিরাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল।

কিন্তু এবার ফিরে যাই মীরাবাইয়ের প্রসঙ্গে—যখন ইন্দিরা সেরে উঠে ফের আশ্রমে এসে আমার কাছে ছিল, এই সময়েই মীরার আবির্ভাবের কথা গুরুদেবকে খুলে জানাই। প্রথম দিকে তিনি ঠিক করতে পারেন নি এ-আবির্ভাব দৈবী করুণার রূপায়ন কি না। কিন্তু অতঃপর আমি ও ডঃ ইন্দ্র সেন ইন্দিরার ভজনাবলির সব খবর তাঁকে পাঠাতেই তিনি নিঃসংশয় হ'য়ে পর পর তিন তিনটি চিঠি লিখেছিলেন উত্তরোত্তর তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন ক'রে। [শ্রীমাও বলেছিলেন এই সময়ে যে, ইন্দিরা এক আশ্চর্য সত্য দর্শনশক্তির অধিকারিণী—"She has a remarkable power of true vision"—"শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি"-তে ডঃ ইন্দ্র সেনের ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

তবু অনেকে ইন্দিরার মীরাদর্শন সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করাতে আমি গুরুদেবকে ফের লিখি কয়েকটি চিঠি। উত্তরে তিনি লেখেন:

(1) "There is nothing impossible in Mirabai manifesting in this way through the agency of Indira's trance, provided she (Mira) is still sufficiently in touch with this world to accompany Krishna where he manifests and in that case there would be no impossibility either in her taking the part she did in Indira's vision of her and her action. If Indira wrote in Hindi with which she was not ordinarily familiar or in which she was not used to write and it was under the influence of Mirabai, that would be a fairly strong evidence of the reality of Mirabai's presence and influence on her. (7. 5. 50)."

(2) "It is evident that Indira is receving inspiration for her Hindi songs from the Mira of her vision and that her consciousness and the consciousness of Mira are collaborating on some plane superconscient to the ordinary human mind : an occult plane ; also this influence is not an illusion but a reality, otherwise the thing could not happen as it does in actual fact.

Such things do happen on the occult plane, they are not new and unprecedented. (2. 6. 50)"

(3) "In any case the poems Mirabai has written through Indira—for that much seems to be clear—are beautiful and the whole phenomenon of Indira writing in a language she does not know well...is truly remarkable and very convincing of the genuineness of the whole thing. The Mother has sanctioned the publication of her poems in our press, so that would be all right. (11. 6. 50)"

[ভাবার্থ: ১) ইন্দিরার ধ্যানে মীরার আবির্ভাব মোটেই অসম্ভব নয়—যদি এ জগতের সঙ্গে মীরার যোগ থাকে যার ফলে সে যেখানে কৃষ্ণ যান সেখানেই প্রকট হ'তে পারে। মীরার প্রভাবে ইন্দিরা ভজনগুলি আবৃত্তি করে হিন্দি ভাষায় সে-ভাষা ভালো না জানা সত্বেও—এ একটি মস্ত প্রমাণ মীরার অভ্যুদয় ও প্রেরণার সত্যতার।

২) দেখাই তো যাচ্ছে যে, ইন্দিরা যে-মীরাকে ধ্যানে দেখে তার কাছ থেকেই প্রেরণা পাচ্ছে তার আরও হিন্দি ভজনাবলির। তাই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, সে তার ভজনগুলির প্রেরণা পাচ্ছে মীরারই কাছ থেকে। সুতরাং বলা যায় যে, সে মীরার সহযোগিতায় গানগুলি বাঁধছে এক তুরীয় নেপথ্য চেতনার স্তরে। এ-প্রেরণা জল্পনা কল্পনা নয়—এমন অঘটন ঘ'টে থাকে, আগেও ঘটেছে।

৩) সে যাই হোক, মীরাবাই ইন্দিরার মাধ্যমে যে-গানগুলি পরিবেষন করেছেন সে-গুলি যে সুন্দর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপিচ, ইন্দিরা যে-ভাষা ভালো জানে না—সেই হিন্দি ভাষায়ই গানগুলি শুনে আবৃত্তি করছে ব'লে বলা চলে অসংশয়েই যে, এ-আশ্চর্য অঘটনটি সর্বৈব সত্য। শ্রীমা আশ্রম প্রেসে এগুলি ছাপবার অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই সবই হয়েছে অনবদ্য।]

এক এক সময়ে সত্যিই অবাক লাগত ভাবতে—ইন্দিরা কেমন ক'রে বিদেহী মীরাবাইয়ের মুখে গানগুলি শোনে দিনের পর দিন? একটি অঘটন ঘটে বড় চমৎকার: ১৯৫২ সালে জানুয়ারি মাসে ইন্দিরা একটি আসন্ন বসন্ত ঋতুর গান গাইল, প্রথম চরণ—"বসন্তকী ঋতু আই সখী রী"। গানটি "শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি"-তে ছাপা হয়েছে ৯০ পৃষ্ঠায়। কিন্তু ইন্দিরা সেদিন মাত্র প্রথম দুটি স্তবক আবৃত্তি ক'রেই থেমে যায়। মীরার কাছে দরবার করতে মীরা শেষ দুটি স্তবক গেয়ে শোনান, পরে ইন্দিরা আবৃত্তি করে। আমি এখানে মূল হিন্দি গানটি না দিয়ে শুধু আমার বাংলা তর্জমাটিই পেশ করছি—একই ছন্দে মিলে অনূদিত (তারাঞ্জলি, ৬৮ পৃঃ):

বসন্ত ঋতু এলো সখী ফিরে, তরুশাখা দোলে পুলকে সমীরে,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল অধীরে গায় আনন্দে কালিন্দী তীরে :
"এসো এসো শ্যাম, এসো ঘনশ্যাম! এসো রঙ্গে ত্রিভঙ্গ সুঠাম।"

দুলায় তারকা শান্ত গগনে কোন্ শ্রীকান্ত-আঁখিরঞ্জনে!
বন্দনে তব গায় সুলগনে কদম্বতলে রাধামুরছনে :
"এসো এসো শ্যাম, এসো ঘনশ্যাম! এসো রঙ্গে ত্রিভঙ্গ সুঠাম।"

১৩ই জুলাই মীরা গাইলেন এর শেষ দুটি স্তবক :

বধূসম ঐ সন্ধ্যা রাঙিল, তারার চুমকি-নিচোলে সাজিল,
জলে হেরি চাঁদে লাজে শিহরিল, দেখি' চঞ্চল যমুনা গাহিল :
"এসো এসো শ্যাম, এসো ঘনশ্যাম! এসো রঙ্গে ত্রিভঙ্গ সুঠাম।"

কৃষ্ণ কেশব জীবন সাধন! সুন্দরতনু, মুরলীমোহন!
ভক্তাধীন হে পতিতপাবন! গায় মীরা : "নিখিলের নারায়ণ!
এসো এসো শ্যাম, এসো ঘনশ্যাম! এসো রঙ্গে ত্রিভঙ্গ সুঠাম।"

কবিরা অনেক সময়ে কোনো গান বেঁধে থেমে যান—কিছুদিন পরে সে-গানের শেষে আরও দু একটি স্তবক জুড়ে দেন। এও ঠিক তেমনি।

* * * *

একবার ইন্দিরা পুনা থেকে বম্বে যেতে সমাধিতে মোটরে শুনে আবৃত্তি করে একটি গান—যেটি সুধাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে ৩২ পৃষ্ঠায়—প্রথম চরণ : সাগরসে কহা হৈ বিন্দুনে : "মুঝমে তুঝমে কুছ ভেদ নহী" তারাঞ্জলিতে এ গানটির অনুবাদ দিয়েছি ১৮৭ পৃষ্ঠায় :

বিন্দু কহিল মহাসিন্ধুরে : "তুমি আমি নই আন।
তোমার বুকের প্রতি লহরের আমিই নিহিত প্রাণ।
তোমা বিনা আমি জলকণা—ধাই নিঠুর খেয়ালী বায় :
কখনো লুটাই ধুলায়, উধাও কখনো বা নীলিমায়।"
কঙ্কর বলে মহামহীধরে : "তুমি আমি নই আন।
গাঁথা রই যবে অঙ্গে তোমার—বিরাজি নিরভিমান।
তোমা বিনা আমি উপল—নিদয় ঢেউয়ে চলি ভেসে হায়!
কখনো গহন গিরিবাসী আমি, লুটাই কভু ধরায়।"
ভক্ত কহিল ভগবানে : "প্রভু, তুমি আমি নই আন।
ভেদসীমা যবে যায় মুছে—শোভি তোমা মাঝে মহীয়ান্।

তোমা বিনা আমি কিছু নই—খেলে নিয়তি ল'য়ে আমায় :
তোমার শরণ লভি', নাম জপি' অজেয় এ-বসুধায়।

কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, হাঁপানির টানে কথা বলতে বেগ পাচ্ছে—(দেখতেও কষ্ট!)—অথচ সে-অবস্থায়ও গান শুনেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে গেছে, আমি টুকে নিয়েছি আশ্চর্য হ'য়ে। এইভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে একবার পণ্ডিচেরিতে ৮.৫.৫২ তারিখে ও আবৃত্তি করে : "বজা ন শ্যাম বাঁসরী তু আনকে কদমতলে।" আমি এ-গানটিতে সুর দিয়ে গাইতাম মূল তথা আমার বাংলা অনুবাদ। মূল গানটি "শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি"-তে ছাপা হয়েছে ৮১ পৃষ্ঠায়, অনুবাদটি "তারাঞ্জলি"-তে ৬৩ পৃষ্ঠায় :

বাজিয়ো না আর শ্যাম, বাঁশরী সাঁঝসকালে কদমতলে।
শুনে তোমার ঘরছাড়া তান হিয়ায় আমার আগুন জ্বলে।
জানি না তো বাঁশির তোমার কেমন স্বভাব, সুরের ধারা,
সুধার সাথে কে মিশালো শিখার তাপন আপন হারা!
দেহে যখন প্রাণ থাকে না—হয় সে উধাও চরণতলে,
বাজিয়ো না আর শ্যাম, বাঁশরী সাঁঝসকালে কদমতলে।

দিও না ডাক রাসে তোমার চাঁদনি রাতে মধুবনে,
বাদ সাধে যে পথের বাধা বৈরী হয়ে হায় মিলনে!
দেহে যখন প্রাণ থাকে না—হয় সে উধাও চরণতলে,
বাজিয়ো না আর শ্যাম, বাঁশরী সাঁঝসকালে কদমতলে।

বেঁধো না গো প্রেমপাশে মীরাকে আর নিরবধি,
জাগিয়ে প্রেমের তৃষা যখন মিটাবে না, বেদরদী!
দেহে যখন প্রাণ থাকে না—হয় সে উধাও চরণতলে,
বাজিয়ো না আর শ্যাম, বাঁশরী সাঁঝসকালে কদমতলে।

হাঁপানির টানে নিশ্বাসের কষ্টের কথা অনেকেই জানে। কিন্তু ইন্দিরার আরো অনেক উপসর্গ ছিল—সে-সব থাক—শুধু বলি যারা দেখত ওর হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে অনবদ্য গান আবৃত্তি করা তারা যেন চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারত না—এ কী ব্যাপার? অন্তত আট দশবার ও এই ভাবে গান আবৃত্তি করেছে—সে সব গানের খবর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবু আর একটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এ-গানটি এসেছিল বিদেশে বিভূঁয়ে—ভজন গানের প্রতিকূল পরিবেশে—লস এঞ্জেল্‌স্‌ · হলিউডে। আমরা তখন একটি আমেরিকান দম্পতীর

অতিথি—যাদের কথা আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে"-তে লিখেছি। সেখানে একদিন রাত্রে ওর বিষম হাঁপানি সুরু হ'ল। বন্ধুবর তথা বান্ধবী বিষম ভয় পেয়ে ডাক্তারকে টেলিফোন করতে যেতে ও হাত নেড়ে তাদের নিরস্ত ক'রে আমাকে বলল: "Dada! I have heard a song." ওরা বুঝতে না পেরে আমার দিকে চাইতেই আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা ক'রে কলম নিয়ে বসলাম—৩০.৩.৫৩ তারিখে —পরে গানটির ইংরাজী অনুবাদ ক'রে ওদের বোঝাতে ওরা একেবারে থ—আরো এই জন্যে যে, মার্কিন ঐশ্বর্যের পরিবেশে এল কি না এহেন বৈরাগ্যের গান! হিন্দি গানটি ছাপা হয়েছে "সুধাঞ্জলি"-তে (৬ পৃঃ): "মন মেরা বৈরাগী রাজা, করে য়হ কিসসে প্যার?" বাংলা অনুবাদ:

মন যে আমার উদাস রাজা, সে সাধিবে প্রণয় কার?
তনু মন প্রাণ প্রাসাদে বহিতে পারে না ভূষণভার॥
চায় না সে ধনজন গৃহ-সুখ দীপ মালা যশ মান,
শান্তি শক্তি বিলাস চায় না, প্রতিভা, উজল জ্ঞান।
হরির চরণই চায় সে তৃষায় অপারে করে যে পার॥

শ্যামের লাগিয়া উদাসিনী মীরা উধাও মথুরাপানে,
কুঞ্জে কুঞ্জে গায় ভিখারিণী হরিনাম কলতানে,
হৃদয়েরে করি' প্রেমের প্রদীপ, আঁখিনীরে ফুলহার॥

বাঁধিল আমায় যুগে যুগে বঁধু লক্ষ প্রেমের পাশে,
পিতা-মাতা-সখা-সন্তান সে-ই—চিরদিন ভালোবাসে।
জনমে জনমে দাসী মীরা শুধু যাচে নন্দকুমার॥

* * * *

মীরার সঙ্গে ওর কথালাপ—দিনের পর দিন—সে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু সে সব আলাপের বিবরণ "তারাগুলি"-তে ছেপেছি—আমাদের PILGRIMS OF THE STARS-এর REALITY OF MIRA অধ্যায়েও। এ-আলাপের সম্বন্ধে ও আমাকে প্রথম চিঠি লেখে মুসুরি থেকে ১৯৫০ সালে। এ-চিঠিটুটি বড় সুন্দর মর্মস্পর্শী—তাই আমি মূল চিঠি ও আমার বাংলা অনুবাদ দুই-ই পরিবেষণ করছি:

Savoy Hotel, Mussoorie
August 8, 1950

Dada,

It is a lovely, peaceful day. Everybody has gone down to Dehradun and I am all alone. I will pray the whole day and there will be no time wasted at the meals with guests.

Last night I saw Mira once again, Dada! I was praying when, suddenly, the whole room was flooded with a blue light: Then, as I raised my head, I saw her. She spoke to me for long. I did not say anything but somehow my heart speaks to her and she knows it. How tender and intimate is her every touch and look! [You know, Dada, she has a black mole right below her thumb-joint—on the palm of her hand]. She said something very beautiful and moving.

"In the soul's journey through thousands of years", she said, "you meet someone with whom you stay for a few years and the world says you belong to one another. But then is not such a brief meeting in just one life, among thousands of lives, comparable to meeting someone in one birth for, say, a couple of hours? Such *are* the superficial meetings of this world—brief and casual—whereas true love is everlasting and unshakable and the kinship of souls that love *is* for all times. You may dye the water in different colours but it remains water all the time. In the same way, you may change your outer form in your different births but the love that sustains you stays the same and can never really dwindle, nor can there be any real separation between soul-mates since they are all jouneying together towards the same Goal Divine. On occasions, it may, indeed, so happen that one of the two is deflected from the Path—when the other's progress, too, may be temporarily retarded, thanks to the backward pull, but for those who ride the crests of the divine current there can be no

question of turning back : the farther they go the nearer comes the ocean and the stronger grows the swirl of the rivers meeting in the ocean. Now you know, Indira, why you are so dear to me. I told you that I would tell you all. By and by you will know all."

Love and pranams,

Your child,
Indira

Savoy Hotel, Mussourie.
August 19, 1950

Dada,

I am writing this in the small hours of the morning after having just woken up from my meditation which lasted about five hours.

Mira came to me again. O Dada, how dear she has grown to me and how near : How real her love—how close to my heart : And yet isn't it almost incredible ? To think that one so holy, who comes to me in my dreams and trances. should be growing as it were with my own growth :···I am told that people simply will not believe me. I smile. Does it matter to me one jot even if the whole world were to laugh at my story now that I have seen and loved her ? A mere dream ? But can a mere dream give one more lasting peace and sustenance of love than all the realities of the world put together ? O Dada, I shall always be grateful to you : for it is because of *your* blessing, *your* mediation that she came to me and loved me as she has. And how precious is her love :··· I wish you could see her : She is *lovely* and her beauty grows on one. But I cannot fathom her. I asked her the other day : "But tell me, are you really real ?" She placed her palm on my

head in token of blessing and smiled. "But what *is* real?" She asked calmly. I answered: "I mean the real *you*." She smiled again and said: "But do you know yourself, the real *you*?"··· I will tell you more about it all when you come here, to Mussourie. But one thing I may tell you now as certain: that she will never forsake me even if the whole world does.

Love and pranams,

Indira

৮. ৮. ৫০

দাদা,

আজ বড স্থন্দর দিন—বড শান্তিময়। সবাই দেরাদুন চ'লে গেছে, আমি একেবারে একা। আমি সারাদিন প্রার্থনা কবব—খাবার সময় অতিথিদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সময় নষ্ট করতে হবে না আজ।

কাল রাতে ফেব মীরার সঙ্গে দেখা হ'ল, দাদা! আমি প্রার্থনা করছিলাম, হঠাৎ ঘরে নীল আলো বিছিয়ে গেল। তারপব যেই আমি মাথা তুললাম দেখলাম—মীরা! সে অনেকক্ষণ ধ'রে আমাকে কত কী বলল। আমি কিছুই বলি নি, কিন্তু আমার হৃদয়.তার সঙ্গে কথালাপ করে—সে জানে। তার প্রতি স্পর্শ কী কোমল ও ঘনিষ্ঠ, দাদা! সে যা বলল বড স্থন্দর—প্রাণস্পর্শী:

"লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে আমাদের অন্তরাত্মা তীর্থযাত্রা কবে—কারুর সঙ্গে হয়ত তুমি কয়েক বৎসর কাটালে। সবাই বলবে—তোমরা পবস্পরের অন্তরঙ্গ। কিন্তু হাজার হাজার জীবনের মধ্যে একটি জীবনে তার সঙ্গে ক্ষণিকের দেখাকে কি তুলনা করা যায় না একটিমাত্র জীবনে কারুর সঙ্গে কয়েকঘণ্টা কাটানোর সঙ্গে? জগতের দেখা সাক্ষাৎ ঠিক এমনিই উপর ভাসা—ক্ষণিক, চকিত। কিন্তু অকৃত্রিম প্রেম অচল, অটল, আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ—যার নাম প্রেম—সে চিরন্তন। জলকে নানা রঙে রঙালেও সে জলই থাকে। তেমনি তুমি নানা জন্মে তোমার বাহ্য মূর্তিকে বদলাতে পারো, কিন্তু যে-প্রেম তোমাকে ধারণ ক'রে আছে সে যেমন তেমনিই থাকে, সে অক্ষয়—আর আত্মার আত্মীয়দের মধ্যে ব্যবধান আসতে পারে না কেন না তারা সবাই একই পরম লক্ষ্যের অভিসারী। কখনো হয়ত বা দুজনের একজন পথভ্রষ্ট হ'ল। তখন অন্যজনার প্রগতি হয়ত পিছুটানের দরুণ শ্লথ হ'তে পারে কিছু-দিনের জন্যে, কিন্তু যারা দিব্য লহরীর শীর্ষারোহী তারা ফিরে যেতে পারে না: যত তারা এগোয় তত সমুদ্র তাদের কাছে আসে, আর নদীর কল্লোল আরো ঝঙ্কৃত হ'য়ে

ওঠে সিন্ধুর সান্নিধ্যে। এখন তুমি জেনেছ ইন্দিরা, কেন তুমি আমার এত প্রিয়। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমাকে সবই খুলে বলব। ক্রমে ক্রমে তুমি সবই জানতে পারবে, বুঝতে পারবে।"

ভালোবাসা ও প্রণাম দাদা,

তোমার দুলালী ইন্দিরা।

* * *

সাভয় হোটেল, মুস্থরি
১৯ আগস্ট, ১৯৫০

দাদা,

আমি পাঁচঘণ্টা ধ্যানের পর ব্যথিত হ'য়ে তোমাকে লিখছি ভোর রাতে।

মীরা আবার এসেছিল। দাদা গো, সে যে আমার কত কাছে এসেছে—কত প্রিয় হ'য়ে উঠেছে কী বলব! তার প্রেমও কী জীবন্ত! সে যে আমার অন্তরঙ্গা হ'য়ে উঠেছে! অথচ ভেবে দেখতে গেলে কী অদ্ভুত! ভাবো, যে এমন পুণ্যশীলা—সে আসে কি না আমার স্বপ্নে ধ্যানে, আর আমার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে! কেউ কেউ বলে—পাঁচজনে আমার কথা বিশ্বাসই করবে না। শুনে আমি হাসি। যদি সমস্ত জগৎ হাসাহাসি করে আমার কাহিনী শুনে আমার কি এতটুকুও যায় আসে—যে আমি তাকে দেখেছি, ভালোবেসেছি? এ শুধু রঙিন স্বপ্ন? কিন্তু স্বপ্ন কি দিতে পারে এমন স্থায়ী শান্তি—প্রেমের পারানি—জগতের সমস্ত বাস্তবতাকে জুড়লেও যার জুড়ি মেলে না?* দাদা গো! আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব, কারণ তোমার আশীর্বাদেই আমি মীরাকে পেয়েছি—সে আমাকে এত ভালোবেসেছে তুমিই তাকে টেনে এনেছিলে ব'লে। কী অমূল্য তার প্রেম, দাদা!···আমার কী যে সাধ হয়—তুমি যদি তাকে দেখতে একবার! সে অপরূপা—আর তার রূপশ্রী যত দেখ ততই মনে হয় মধুর। কিন্তু আমি তার তল পাই না। সেদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "বলো তো, তুমি কি সত্য, বাস্তব?" সে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলল: "কিন্তু বাস্তব বলো তুমি কাকে?" আমি বললাম: "যে তুমি আসল তাকে।" সে হাসল: "তুমি কি জানো কোন্‌টা আসল তুমি?"···দাদা, আমি তোমাকে আরো বলব—সব কথা—যখন তুমি এখানে আসবে—মুস্থরিতে।

* সাবিত্রী-তে (২/৩) শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন:

Dream's truth made false earth's vain realities

স্বপ্নসত্য করে মিথ্যা এ-বিশ্বের অলীক বাস্তবে।

কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে বলতে পারি যার নড়চড় হ'তে পারে না — যে, যদি সমস্ত জগৎও আমাকে পরিত্যাগ করে তাহ'লেও মীরা আমাকে পরিত্যাগ করবে না।

ভালোবাসা। প্রণাম, দাদা!

ইন্দিরা

॥ বেয়াল্লিশ ॥

ইন্দিরা প্রথমবার পণ্ডিচেরিতে আসে ২০. ২. ৪৯ তারিখে, প্রস্থান করে ১৫ ৩. ৪৯ তারিখে। তারপর আগমনও প্রস্থান—২০. ৭. ৪৯ ও ১৬. ৮. ৪৯। তারপর ১০. ৩ ৫০ তারিখে আসে ও ১লা জুলাই, ১৯৫০এ ফিরে যায়—কিন্তু এবার পতিগৃহে নয়—ওর পিতৃগৃহে সাভয় হোটেলে। তিনি—ক্যাপ্টেন রুপারাম ওকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ব'লে আরো ভয় পেয়ে ওকে চেয়েছিলেন কিছুদিন কাছে রাখতে। কিন্তু উল্টো উৎপত্তি হ'ল: সাভয় হোটেলে ও খাওয়ার সময় ছাড়া সর্বদাই নিজের ঘরে ধ্যান বা প্রার্থনা করত—সবাই দেখে অবাক হ'ত। একদা জব্বলপুরে এক সংশয়ী পরীক্ষক ওর সমাধি অবস্থায় ওর হাতে জলন্ত চুরুটের ছ্যাঁকা দেন, কিন্তু ওর সমাধি ভাঙে নি। আমি স্বচক্ষে ওকে দেখেছি ঠায় ব'সে আটঘণ্টা সমাধিতে নিশ্চল থাকতে। কিন্তু তিন চার ঘণ্টা সমাধিতে থেকে ব্যুত্থিত হওয়ামাত্র ও গৃহকর্মে মন দিত যথাবিধি—দেখে অনেকেই অবাক্ হ'ত। ওর কথা অনেক বলেছি অন্যত্র—গত কয়টি অধ্যায়েও নিতান্ত কম বলি নি। কেবল ওর মাধ্যমে দিনের পর দিন যেসব অঘটন ঘটত তাদের কথা বলি নি পুনরুক্তি হবে ব'লেও বটে। অনেকে ভুল বোঝেন ব'লেও বটে। রাসেল কোথায় লিখেছিলেন যে আমাদের চরিত্রে এই একটি আশ্চর্য স্ববিরোধ—Contradiction—দেখা যায় যে কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলবামাত্র আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তাব নানা গুণপনার কথা বললে হয় প্রমাণ চাই, নয় উদাসীন হ'য়ে চলি নিজের পথে, যেন কিছুই শুনি নি। ইন্দিরার বেলায়ও প্রায়ই পেতাম রাসেলের উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই ওর যে ঘন ঘন সমাধি হয়, ও মীরা ওর কাছে এসে গানের পর গান শোনান, ওর মাধ্যমে নানা অঘটন ঘটে—এসব কথা শুনলে বলত, ভাগবত তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ না হ'য়েও, যে এসবের সঙ্গে ভগবানের কোনোই সম্বন্ধ নেই, থাকতে পারে না। ও আমাকে বার বারই বলত কাউকে কিছু না বলতে। কিন্তু মুখহল্‌সার স্বভাব যাবে কোথা—আমি ক্রমাগত বলতাম লিখতাম প্রমাণ করতে চাইতাম···ইত্যাদি—যার জন্যে আমাকেও কম ঘা খেতে হয় নি।

হোক, আমি অনমুতপ্ত। তাই এমন কি PILGRIMS OF THE STARS-এও ইন্দিরাকে লিখতে বাধ্য করেছি ওর নানা গভীর উপলব্ধির কথা লিখতে। কিন্তু বইটি ম্যাকমিলন কোম্পানী আমেরিকায় ছেপেছেন, ব'লে দিলীপ-ইন্দিরা-বিমুখ ভারিক্কি বিচারকেরা একটু মুস্কিলে পড়েছেন, কেন না প্যারাডক্সটা এই যে আমরা, ভারতীয়েরা স্বভাবে বিশ্বাসপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও যে-সব অঘটন হেসে উড়িয়ে দিই ওরা, সাহেবরা, স্বভাবে সংশয়ী হওয়া সত্ত্বেও শুধু যে বিশ্বাস করেন তাই নয়—সানন্দে অভিনন্দন করেন। তাই এই বইটির জর্মন অনুবাদও য়ুরোপে সমাদৃত হয়েছে—বিশেষ ক'রে জিজ্ঞাসুদের কাছে।

মরুক গে। যে যেমন বোঝে তেমনি বুঝুক, আমি ফিরে আসি শ্রীঅরবিন্দ তর্পণে—যিনি ইন্দিরার সমাধিকে বিশ্বাস করার ফলে আমি আরো প্রকাশ করতাম এসব অতিপ্রাকৃত—Supraphysical—কাহিনী।

* * * *

ইন্দিরার নিমন্ত্রণে একবার আমি সাভয় হোটেলেও পুরো একঘণ্টা ভজন করি। তার পর ইন্দিরা ওর সখীদের মহলা দিয়ে অভিনয় করে বার্ণার্ড শ-র বিখ্যাত ARMS AND THE MAN. তাতে ইন্দিরা "চকলেট সোলজার"-এর ভূমিকা অভিনয় ক'রে সবাইকে চমকে দেয়। ফলে ওর এত নামডাক হয় যে এক বিখ্যাত সিনেমার চাঁই ওকে নিমন্ত্রণ করেন সিনেমায় নামতে। বলা বাহুল্য, ও রাজী হয় নি। তবু ওর এ-কৃতিত্বের উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সেই সনাতন সান্ত্বনা যে, "স্বভাবো দুরতিক্রম:" (মহাভারত)।

* * * *

১৯৫০ সালে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের শেষ দর্শন মিলেছিল আমার ভাগ্যে। ২৪এ নভেম্বরও মিলতে পারত, কিন্তু আমি বম্বেতে কন্সার্ট দিয়ে নিমন্ত্রণ পেলাম বরোদা আমেদাবাদ লখনৌ ও কাশী থেকে। ভাবলাম—যদিও অন্যত্রও যথেষ্ট মোটা দক্ষিণা তুলেছি প্রণামী—তবু বরোদা আমেদাবাদ লখনৌ ও কাশী সেরে আরো বিশ পঁচিশ হাজার শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণামী দেব—এবার দেখা ক'রে—কারণ আমি জানতাম যে ধ'রে পড়লে তিনি খুশী হ'য়েই আমার সঙ্গে দেখা করবেন যেমন করেছিলেন ইতিপূর্বে তিন তিন বার।

কিন্তু অতি লোভে শুধু তাঁতি নষ্ট নয়—দিলীপেরও কষ্ট তথা সাজা: আমি ২৪এ নভেম্বর দর্শন পেলাম না। বরোদা আমেদাবাদ ও লখনৌয়ে আশাতীত "অনর্থ" পেয়ে [যে-অর্থের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের শেষ দর্শন পেলাম না তাকে "অনর্থ" না ব'লে

উপায় কি?] গেলাম কাশী। সেখানে যথাবিধি কন্সার্টের ব্যবস্থা ক'রছি এমন সময়ে ৫ই ডিসেম্বর রাত একটায় স্বপ্ন দেখলাম—ভূমিকম্প! শুনে এসেছি—কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। তাই ঠিক করলাম পাকস্থলীতে হঠাৎ যন্ত্রণার জন্যেই এরকম দুঃস্বপ্ন দেখেছি—কারণ আমার উদরাময় বর্গীয় ব্যাধি হয় কালে ভদ্রে। ঘুম ভাঙার পর যন্ত্রণা ক্রমশ বেড়ে উঠল, কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্র জপ করতে করতে যন্ত্রণা ক'মে গেল—ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালবেলা ইন্দিরার এক তার পেলাম বম্বে থেকে: "বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি—আশীর্বাদ পাঠাও।" আশীর্বাদ পাঠাবার পরেই রেডিওতে খবর এল—শ্রীঅরবিন্দ (৫. ১২. ৫০) রাত একটায় দেহরক্ষা করেছেন।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত। মনে পড়ল ইন্দিরার টেলিগ্রামের কথা—ও আগের দিন রাত এগারোটায় পাঠিয়েছিল বম্বে থেকে।

তৎক্ষণাৎ রওনা হ'লাম কলকাতা—সেখান থেকে উড়ে পৌঁছলাম মান্দ্রাজে ৭ই ডিসেম্বর সকালবেলা। ইন্দিরা উপস্থিত বিমান ঘাঁটিতে! গ্রামোফোন কোম্পানির মোটরে রওনা হলাম পণ্ডিচেরি।

ও ম্লানমুখে বলল: "কাল ভোর রাতে ধ্যানে দেখলাম, গুরুদেবের জ্যোতির্ময় দেহ উঠছে উপর দিকে—শয়ান অবস্থায়। বুঝলাম—মহাপ্রয়াণ। তাঁকে বললাম: 'আমি যাচ্ছি পণ্ডিচেরি—এবার বরাবরের জন্যে—কিন্তু আপনি ছেড়ে যাচ্ছেন আমাদের—এ কেমন কথা?' তিনি হেসে বললেন: 'তোমাকে দিলীপের আশ্রয়ে রেখে গেলাম, কোনো ভয় নেই।"

ইন্দিরা আরো বলল, চোখের জলে: "দেখলাম তাঁর হাতে একটি কালো দাগ—কিসের বুঝতে পারলাম না।"

বললাম: "ভুল দেখেছ, কারণ গুরুদেবের হাতে কেউ কস্মিন্‌কালেও কোনো দাগ দেখে নি।"

* * * *

আশ্রমে পৌঁছাবামাত্র সোজা গেলাম শ্রীঅরবিন্দের ঘরে—একের পর এক দর্শনার্থী চলেছে সাশ্রুনেত্রে ম্লানমুখে—শেষ দর্শন করতে।

কী সুন্দর জ্যোতির্ময় দেহ, উন্নত ললাট, শান্ত মুখ! ইন্দিরা দেখল—এক স্বর্ণাভা তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝলমল করছে!

হঠাৎ চোখে পড়ল—তাঁর একটি হাতে কালো দাগ। শুনলাম অন্তিম কালে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল তার চিহ্ন।

শ্রীমাকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন: "শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সঙ্গেই আছেন আশ্রমকে ঘিরে আগের ম'তই। তাই আমি চাই না কেউ কান্নাকাটি করে।

আমি শ্রীঅরবিন্দের চিরনিদ্রাস্থির দেহ দেখে চোখের জল ফেলতে তাই নীরদ আমাকে বারণ করেছিল: "মার নিষেধ—কেউ যেন না কাঁদে।" শ্রীমা আরো বললেন: "শ্রীঅরবিন্দ আরো বেশি ক'রে আছেন এই কথাই বলতে হবে উঠতে বসতে।"

তারপর শ্রীমা বললেন: "শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ব'লে গেছেন: 'আমি দিলীপকে যেমন স্নেহে লালন করেছি, তুমিও ওকে তেমনি ক'রে দেখো।"

কী বলব? চোখের জল সামলে ঘরে গিয়ে একলা ভেঙে পড়লাম।···মনে কেবল তাঁর একটি চিঠির অঙ্গীকার বেজে উঠতে থাকে: "I have cherished you as a friend and a son."

রাত্রে ঘুম এল না। কিন্তু আশ্চর্য, বেদনাকে ছাপিয়ে দেহে মনে ছেয়ে গেল এক অপরূপ স্থৈর্য, শান্তি। মনে হ'ল যখন বাইশ বৎসর ধ'রে এমন ধ্রুবদিশারির অঝোর প্রেম পেয়ে এসেছি প্রতিপদে—তাঁকে কেন্দ্র করে এত কবিতা লিখেছি, গান বেঁধেছি কীর্তন গেয়েছি গল্পমালা গেঁথেছি, গাঢ় অন্ধকারেও পেয়েছি আলোর ভরসা, অস্তাচলেও নবারুণের অঙ্গীকার, বিষাদেও নিত্যানন্দের আশ্বাস—তখন ভয় কি?

না ভয় নেই আর - সত্যিই নেই, যদিও জানি দুঃখ আরো অনেক পেতে হবে: "জানি তুমি দুঃখ দেবে—দিয়ে আপন করে নেবে।" জানি—অন্ধকার থেকে থেকে ছেয়ে আসবে পথের নানা বাঁকে। কিন্তু যখন পেয়েছি এমন মহাগুরুর মন্ত্র, মহাকবির প্রেরণা, মহাঋষির শান্তি—তখন অন্তিমে বৃন্দাবনের আনন্দদুলালের চরণও পাবই পাব। গুরুদেবের অভয়বাণী মনে গাঁথা আছে: "তোমাকে তিনি সংসারের ভ্রান্তি-বিলাস থেকে ছিনিয়ে আনেন নি নিরাশার অতলে হাহাকার করতে—তুমি তাঁকে পাবেই পাবে—মনে রেখো তিনি তোমাকে চান ব'লেই তুমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে না চেয়ে থাকতে পারো না।"

তাঁর চরণমূলে প্রণাম ক'রে গাইলাম:

মাটির ধরায় নাথ, অমরার প্রেম বিলাতে তুমি
এসেছিলে স্বর্গের নন্দন!
নিশার বুকে মূর্ত ওগো উষার জন্মভূমি,
গেয়েছিলে সাবিত্রীকীর্তন;
করলে ঘোষণ: "বিশ্বরাজে নাস্তি বলে যারা
হবেই তাদের দিতে বিসর্জন,

দীপ্ত প্রতিজ্ঞার শরণানন্দে আপনহারা,
বরণ ক'রে প্রাণের ধ্যানের ধন।*
"উল্লাসে গাও: 'আমরা সবার আগে তাঁকে চাই
যাঁর আনন্দে বরি এ-জীবন,
চান আমাদের তিনি—তাঁকে আমরাও চাই তাই
তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ।"‡

* All that denies must be torn out and slain
And crushed the many longings for whose sake
We lose the One for whom our lives were made. (SAVITR1, 3/2)

‡ Dilip,

If Heaven did not want man—man would not want Heaven. It is from Heaven that the longing and aspiration for Immortality have come, and it is the Godhead within him that carries it as a seed. (April, 1936)

উপসংহার

শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে প্রায় পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। এ-কয়বৎসরে আমাকে অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়েছে। সকলেই চলেছে একই লক্ষ্যের মোহানায়—যদিও নানা পথে, নানা ধারায়, নানা ছন্দে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গান আমার বড় প্রিয়ঃ

একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্নপথে যদি···
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

যত এই অন্তর্জলীর দিন এগিয়ে আসছে—সর্বতাপহারিণী ভবতারিণী মা গঙ্গার ডাক উঠছে আমার কানে শনৈঃ শনৈঃ আরো উচ্ছল, আরো মধুর, আরো আশাপূর্ণা হ'য়ে। প্রতিবার যখনই কান পেতে শুনি সে-গভীরায়মান "আয় আয়" ডাক, মন ভ'রে ওঠে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন জাগে আমার অন্তরে রাগিণীর বাদী সুরের মতঃ "কী পেলে তুমি এতদিন মহাগুরুর জ্যোতির্মন্ত্র জপ ক'রে?" উত্তরে আমি বলিঃ "পেয়েছি সব ক্ষোভ থেকে, সব ভয় থেকে, সব অশান্তির ঘূর্ণী থেকে মুক্তি।" এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলা সহজ নয়, তবু আমার মনে হয় অভয় হ'তে পারা একটি মস্ত লাভ। ভাগবতে একটি চমৎকার বাণী আছে—ভয়ার্ত মানুষ বলছে কৃষ্ণকেঃ

"নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্"

অর্থাৎ, যে-সংসারে আমরা পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুর কারণ সেখানে আপনি ছাড়া আর কে আছে অভয়দাতা?

কী ভরসার কথা, অথচ কী করুণ—যেখানে মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—তাই কেউ জানে না কোন্‌দিক থেকে আসবে নিষ্ঠুর মৃত্যুবাণ। তবু গুরুকৃপায় পেরেছি ভয় কাটিয়ে উঠতে, তাই তো পেরেছি গাইতে নিঃক্ষোভ শান্তির মিড়েঃ

ব্যথার ছায়ার কোলে আনন্দশিশু দোলে,
তাই কালো মুখ ঝাঁপে আলোর গানে,
অভয়কমল ফোটে অমল প্রাণে।

শ্রীঅরবিন্দের চরণে এসেই পেয়েছি এই অভয়প্রসাদ, তাই প্রণাম করি দিনে রাতে সেই অভী প্রবীরকে যিনি অদূরে ফাঁসির মঞ্চকে দেখেও নির্বিকল্প হ'য়ে নিরস্ত ধ্যানে মগ্ন ছিলেন দিনের পর দিন, না ভেবে কাল কী হবে।

তাঁর কাছে এই অভয়ের বাণীবাহ হ'য়ে এসেছিলেন স্বয়ং বাসুদেব যাঁর দর্শন পেয়ে তিনি লিখেছিলেন মধুর উচ্ছ্বাসে (সাবিত্রী, শেষ বল্লী) ঃ

A marvellous form responded to her gaze
Whose sweetness justified life's blindest pain,
The universe and its agony seemed worth while.
অপরূপ মূর্তি এক ফলিল নয়নে সাবিত্রীর,
মাধুর্যে যাহার লীন হ'ল জীবনের অন্ধতম
বেদনাও—মনে হ'ল সার্থক বিশ্বের হাহাকার।

যত দিন যায় তত মনে হয় তিনি এসেছিলেন এ-নাস্তিক বৈজ্ঞানিক যুগে দিতে আস্তিক্যের দৃষ্টিবর—সেই পরশমণি—যে সব মিথ্যার খাদকে রূপান্তরিত করে তার একটি ছোঁওয়ায়। যত দিন যায় তত দেখি—তিনি ধরা দিয়েছিলেন উদ্‌ভ্রান্তদেরকে অমরার আবাহনে দীক্ষা দিতে। যত দিন যায় তত দেখতে পাই এ মৃন্ময়ী পৃথিবীর মধ্যে তাঁর দিব্যনেত্র দেখেছিল এক চিন্ময়ী সত্তাকে যার দিব্যপ্রভায় তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্ব-জনীন কালোও হ'য়ে গিয়েছিল আলো, তিনি ডুবেছিলেন সেই পরমানন্দে তাঁর মানস বিগ্রহ অশ্বপতির মতন ঃ

A colonist from immortality,
A treasurer of superhuman dreams,
His soul lived as eternity's delegate,
His mind was like a fire assailing heaven,
He made of miracle a normal act.
অমরার পুরবাসী হ'ল ধরণীর নাগরিক,
মানুষ পায় নি যার দিশা—সেই স্বপ্নের ভাণ্ডারী,
অন্তরাত্মা তার ছিল অবিনশ্বরের প্রতিনিধি,
মন তার যেন বহ্নিশিখা সম স্বর্গে দিত হানা,
অঘটন-ইন্দ্রজাল ছিল তার স্বভাব সাধনা।

যত দিন যায় ধীরে ধীরে চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, দেখতে পাই—আরো আরো আরো—যে, এ-দিব্য রূপান্তরের ফলে শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবী থেকে দূরে স'রে যান নি, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষের আরো কাছে এসে সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলেন যা তিনি নিজে চাক্ষুষ করেছিলেন ঃ যে, জীবনের কোনো উপলব্ধির স্তরেই মানুষ থেমে যায় না—[তাঁর LIFE DIVINE-এ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ More is possible—

আমরা আরো ফুটে উঠতে পারি যদি সত্যি চাই]—জীবন পরা সিদ্ধি লাভ করে শুধু প্রেমে, কারণ কেবল প্রেমই তার শ্রীক্ষেত্রে প্রতি আর্তকে পরিবেষণ করতে চায় সেই নিত্যানন্দ যার স্বাদ পেলে মানুষ অমৃত হয়—"যে এতদ্ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি"—তাই সাবিত্রীর মাধ্যমে তিনি গেয়েছিলেন :

In me the spirit of immortal Love
Stretches its arms out to embrace mankind.

আমার অমর প্রেম বাহু মেলি' ডাকে আলিঙ্গন করিতে বিশ্বমানবে···

কারণ

Imperfect is the joy not Shared by all

···নয় নয় নিখুঁৎ সুন্দর
সে-আনন্দ—স্বাদ যার পায় নি মর্ত্যের প্রতি জীব।

সাবিত্রীর উপসংহারে সাবিত্রী দিয়েছে এই অভয় বাণী কী মধুর প্রস্বনে :

Heaven's touch fulfils but cancels not our earth.

অধরার স্পর্শে ধরা হয় ধন্য, লুপ্ত হয় না সে।

কারণ, মর্ত্যবাসীর তীর্থযাত্রায় প্রতি পদে ভগবান্ থাকেন তার তীর্থসাথী প্রেমরূপে—সাবিত্রীর চিরারাধ্য প্রাণাধিপ এই সহযাত্রী ভগবান্ :

My God is Love and sweetly suffers all,
A traveller of the million roads of life

আমার দেবতা—প্রেম, ব্যথার ব্যথী সে সকলের—
জীবনের অগণন সরণির প্রতি পথে চলে।

যত দিন যায় দেখি মুগ্ধ হ'য়ে যে, অধরার আনন্দলোক থেকে শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ঈর্ষাদ্বেষ হানাহানির অশান্তিলোকে তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে শান্তিবৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে নয়—ভাগবতী করুণার দিব্যস্পর্শে ধূলিধামে প্রাণারামের এক নব সুষমা লীলায়িত করতে। তাঁর অপরূপ "ঋষি" কবিতার শেষ স্তবকে যুগর্ষি মনুকে দিয়েছেন ধরার এই নিখুঁৎ নবপরিণতির নিত্যসাধনাব্রত বরণ করতে :

RISHI

Yet, King, deem nothing vain ; through many veils
This spirit gleams.
The dreams of God are truths and He prevails,

··· ··· ···

Shrink not from life, O Aryan, but with mirth
And joy receive
His good and evil, sin and virtue, till
He bids thee leave···
... ...

Love men, love God, Fear not to love, O king,
Fear not to enjoy ;
For Death's a passage, grief a fancied thing
Fools to annoy.···
Seek Him upon the earth. For thee He set
In the huge press
Of many worlds to build a mighty state
For man's success,
Who seeks his goal. Perfect thy human might
Perfect the race.
For thou art He, O King. Only the night
Is on thy soul
By thy own will. Remove it and recover
The serene whole
Thou art indeed, then raise up man the lover
To God the goal.

কিছুই ভুবনে নয় নিরর্থক, বহু আবরণ দীর্ণ করি'
আত্মজ্যোতি ভায়।
ঈশ্বরের স্বপ্ন যত সত্য সবই—তাই তাঁর বিশ্বলীলা বরি'
লহ বসুধায়।
... ...

জীবনবিমুখ আর্য, হোয়ো না—পরমানন্দে তাঁর চিহ্ন চিনি'
করিও গ্রহণ
তাঁর পৃথ্বীলীলা—ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য সবই—যতদিন তিনি
রাখেন জীবন।
... ...

মানবে বাসিও ভালো, বাসিও ঈশ্বরে ভালো, কোরো না ভোগেরে
ভয় বসুধায়,
মৃত্যু শুধু তীর্থপথ, দুঃখব্যথা মিথ্যা মায়া—শুধু অবোধেরে
তাহারা ভুলায়।

... ...

এ-ধরায়ই হবে তাঁকে খুঁজিতে। তোমার কাছে চাহেন ঈশ্বর—
অসংখ্য বিশ্বের
মহাসঙ্ঘে তুমি নব মহাসাম্রাজ্যের ভিত্তি রচি' বীরবর,
মর্ত্য মানবের
পরম কৃতার্থতার দিবে দিশা—মানুষের শক্তিরে সাধিও
জাতির কল্যাণে।
তুমিই রাজন্ তিনি। অজ্ঞানের অমানিশা তুমিই জানিও
স্ব-ইচ্ছায় প্রাণে
করেছ বরণ। সেই মায়া-আবরণ করো দীর্ণ, আবাহন
করি' পূর্ণতায়
তোমার প্রশান্ত সত্তা—পরে জীবে ঊর্ধ্বলক্ষ্যে করো উত্তরণ
ঈশ্বরের পায়।

কারণ, শ্রীঅরবিন্দের চির-বরণীয় ঃ

I cherish God the Fire, not God the Dream
আমার আদরণীয় সেই ভগবান্ যাঁর নাম
পাবন অনল, নন তিনি যাঁর উপাধি—স্বপন।

(সাবিত্রী ১০/২)

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করেছি শুধু তাঁর কাছে কত কী শিখেছি সে-খবরটুকু দিতেই নয়—তাঁর বিরাট্ প্রতিভার আলোকে আর একটু ফলিয়ে তুলতে—আরো এইজন্যে যে, এ-চিঠিগুলির ভাষার শক্তি ও সাবলীলতার কিছু আভাষ না দিলে আমার তর্পণ অসমাপ্ত থাকবে মনে করি ব'লে। একথা সত্য যে, কোনো মহাপ্রতিভারই পূর্ণিমা-পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—যতই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি না কেন। ইংরাজীতে বলে খৃষ্টকে জানতে হ'লে খৃষ্ট হওয়া দরকার। মানি। কিন্তু তবু কোনো প্রতিভার সিকির সিকি মহিমাও আমাদের উদ্দীপ্ত করে যদি লেখার মধ্যে আন্তরিকতার এজাহার থাকে। এই উদ্দীপনার আনন্দ এ পত্রগুলির মধ্য দিয়ে কিছুটা অন্ততঃ পরিবেশন করার সার্থকতা আছে এই বিশ্বাসেই পরিশিষ্টে শ্রীঅরবিন্দের নানামুখী দৃষ্টির কিছু আভাষ দিতে চেয়েছি।

প্রমোদদা*,

আপনার স্নেহলিপি কাল পেয়েছি। আপনি লিখেছেন: শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের জন্মদিন ১৩ই জানুয়ারী, সেই উপলক্ষে আমি কিছু লিখলে আপনি সুখী হবেন। আমি উপস্থিত ঈষৎ অসুস্থ, কাশি চেপে ধরেছে। তবে আজ কাশি কম তাই মনে হল লিখে ফেলি যা মনে আসে আমার স্মৃতিচাবণী ভঙ্গিতে—যাকে সাহেব-পুরাণে বলে Reminiscences।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আমার এক প্রিয় বন্ধু সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে শুনতাম নলিনীবাবুর সম্বন্ধে নানা প্রশংসা। শুনেছিলাম ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরি যান তখন তাঁর শিষ্য তথা শাস্ত্রী ছিলেন তিনজন: সুরেশবাবু, নলিনীবাবু ও বিজয়বাবু (নাগ)।

নলিনীবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বালিগঞ্জে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর রসচক্রে। প্রমথবাবুর 'সবুজ পত্র' পত্রিকায়ও পড়েছিলাম নলিনীবাবুর দু-একটি প্রবন্ধ—বিশেষ ক'রে আধুনিক ফরাসী নাটক সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধের কথা মনে আছে—যদিও তিনি ঠিক কি যে লিখেছিলেন মনে নেই, থাকবার কথাও নয়। স্মৃতিশক্তি জোরালো

*শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। প্রমোদবাবু বিখ্যাত "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ" তথা আরো অনেক গ্রন্থের প্রণেতা—বিশেষ ক'রে হিমালয় সম্বন্ধে।

হলেও অনেক কিছুই তার তহবিল থেকে ফস্কে যায় এ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু সব জড়িয়ে নলিনীবাবুর লেখার মধ্যে দিয়ে একটি খাঁটি ভাবুকের ছবি ফুটে উঠেছিল আমার চিত্তপটে—এটুকু ভুলিনি আজো।

তখন আমি সবে ফরাসী ভাষা শিখছি। শুনলাম নলিনীবাবু এ ভাষায় পারঙ্গম। ফলে আমার গ্রহিষ্ণু যুবক চিত্ত আরো উজিয়ে উঠলো। কিন্তু নলিনীবাবু চিরদিনই গভীর জলের মীন, যার পাত্তা পাওয়া সহজ নয়। বিলেতে আমার এক প্রিয়বন্ধু—এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর স্ত্রী একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, যারা গম্ভীরাত্মা মানুষ তাদের মধ্যে সার বেশি। কথাটি সত্যও বটে, নয়ও বটে। উপমা মনে আসে—সিন্দুক বন্ধ আছে বলেই কিছু সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তার মধ্যে রত্নমণি অপর্যাপ্ত। কিন্তু রত্নমণিওয়ালা বন্ধ সিন্দুকও জগতে আছে। আমার মনে হয়েছিল নলিনীবাবু এই শেষোক্ত থাকে পড়েন।

কিন্তু এ হল স্বভাবের কথা। নলিনীবাবু স্বভাবে গম্ভীরাত্মা, স্বধর্মে পণ্ডিত, মানসে ভাবুক। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছুই শিখেছি দিনের পর দিন।

মনে পড়ে, পণ্ডিচেরিতে যখন ছিলাম মাঝে মাঝেই নলিনীবাবু আসতেন আমার নিমন্ত্রণে ও আমার নানা উৎসুক প্রশ্নের চমৎকার চমৎকার উত্তর দিতেন। গীতায় বলে, তত্ত্বদর্শীদের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে পরিপ্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সেবা করলে তাঁদের কাছে পথের নির্দেশ মেলে। আমি নলিনীবাবুর সেবা করতে পারিনি —তিনি কারোর সেবা নিতেনই না, সেবা ক'রে তাঁর অন্তরঙ্গ হব কোত্থেকে? আর অন্তরঙ্গ হতে না পারলে কাউকে জানা বা চেনা যায় না। তাই বলতে পারি না জোর ক'রে যে, নলিনীবাবুকে আমি জানি বা চিনি। বলতে কি, আমাদের নিজেদেরকেই-বা আমরা কতটুকু চিনি বা জানি নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ঘর করা সত্ত্বেও? ডি. এইচ. লরেন্স বলতেন—প্রতি মানুষই এক একটি দ্বীপ অর্থাৎ নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে একলা থাকাই তার নিয়তি।

উক্তিটি অনুধাবনীয়, কেননা মানুষ পদে পদেই চায় অপরের সঙ্গ, কিন্তু সাধুসঙ্গে অনেক কিছু পেলেও তাঁদের মনের পরশ পায় না পাওয়ার মতন ক'রে। নলিনী-বাবুকে একদিন এ নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা ছাড়া আর কারো স্নেহ-সান্নিধ্য আদৌ কামনাই করেন না।

শুনে চমকে উঠেছিলাম। কারণ আমি বরাবরই বহু মানুষের স্নেহসান্নিধ্য চাইতাম ও সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এ-সান্নিধ্যে পেতাম কিছুটা পাথেয়-উৎসাহ তথা আনন্দ। কিন্তু যে-মানুষ তার সব শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রণাম নিবেদন

করতে চায় মাত্র একটি বা দুটি বরেণ্য মানুষকে তাকে ঠিক গড়পড়তাদের দলে ফেলা চলে না। নলিনীবাবুর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানেই, তাই তাঁর উক্তিটির উল্লেখ করলাম।

কিন্তু তবু তিনি স্নেহশীল মানুষ নন এমন কথা বলব না। কারণ তাঁর প্রীতি ও গ্রহিষ্ণু উৎসাহ থেকে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি—বিশেষ করে তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ আশীর্বাদ থেকে। নম্র কোমল স্বল্পবাক্ মানুষটি—কারুর কাছেই কিছু চাইতেন না, কিন্তু কেউ কাছে আসতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করতেন না তার প্রীতি শ্রদ্ধার নিবেদন। আমি তাঁকে নিবেদন করতাম বিশেষ ক'রে শ্রদ্ধা, প্রীতিরও কিছু মিশেল ছিল সে-শ্রদ্ধায়—কিন্তু শ্রদ্ধার ধূপ-চন্দনই বেশি। ফলে তিনি যখন আমাদের কাছে এসে ধরা না দিয়েও আমাদের শ্রদ্ধায় সাড়া দিতেন তখন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম সত্যিই। কেবল মনে হ'ত—"আহা, যদি ইনি আর একটু মিশুক হতেন—যাকে সাহেবরা বলে expansive!" কিন্তু বদান্য হ'লে তিনি তাঁর বরেণ্যতার অনেক কিছু হারাতেন হয়তো—কে জানে! মানুষ যে-পথে আত্মবিকাশ চায় সে-পথে তো সব সময়ে এগুতে পারে না, ভাবে এক হয় আর। নলিনীবাবুও হয়তো ঠিক জানতেন না কোন্ পথে তাঁকে চলতে হবে—কী তার স্বধর্ম। "ঠিক" বলছি এই জন্যে যে, তিনি আমাদের কাছে তাঁর নানা দার্শনিক উক্তির মধ্যে দিয়ে এই আভাষটি ফুটিয়ে তুলতেন যে তিনি তাঁব লক্ষ্য তথা পথ দুয়েরই হদিশ পেয়েছেন। এ পাওয়া সহজ কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রী'তে অকারণ লেখেননি মানুষের একটি জোরালো প্রবণতার কথা:

"All sides he sees and turns to every call":

"নানাদিকে দৃষ্টি তার, নানা আহ্বানে সে দেয় সাড়া।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন (চ্যাড্উইক-কে) যে, মানুষের পক্ষে একান্তী হওয়া সবচেয়ে কঠিন। ইংরাজীতে বলে putting all one's eggs in one bask--। ওরফে কপাল না চাপড়ে বুক ঠুকে বলা—গেয়ে, "একলা চলো রে!"

যাঁদের গুরুকরণ হয়েছে তাঁদের একটি মস্ত বাঁচোয়া এইখানেই: অর্থাৎ তাঁরা একলা হয়েও একলা চলেন না—গুরু তাঁদেব সহযাত্রী—মুখের কথায় নয়, প্রতি পদে, পদযাত্রায়। নলিনীবাবু ভাগ্যবান, তাই শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাগুরুর স্নেহাশিস পেয়ে গিয়েছিলেন কৈশোরেই। পরে এ-ভাগ্য আমাকেও ধন্য করেছিল—আমার উচ্ছ্বাস-প্রবণ মনকে তাঁর স্নেহনির্ঝরে টইটুম্বুর পূর্ণ ক'রে। তাই শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশায় আমার কোনো দিনই নিজেকে একলা মনে হয়নি নলিনীবাবুর ও যে হয় নি তার প্রমাণ পাই তাঁর এই আত্মকথনে যে, তিনি শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কারুর

স্নেহসান্নিধ্য কোনোদিন কামনা করেননি—গুরুর স্নেহাশিসের উত্তরে তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন তাঁর অনন্যা ভক্তিপ্রীতি। ফলে এর প্রকাশও হয়েছিল যেমন নিটোল তেমনি বলিষ্ঠ—তিনি বলতে পেরেছিলেন মন মুখ এক করে:

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।

অর্থাৎ

জানি তুমি মাতা, তুমি সখা তুমি বন্ধু
তুমিই আমার বৈভব অফুরান।
যা-কিছু জেনেছি তব দান, জ্ঞানসিন্ধু!
তুমিই আমার সর্বস্ব মহান্।

কিন্তু এ হ'ল পাওয়ার খবর। মানুষ জানাতে চায় দাতাকে তার কাছে কত কি পেয়েছে—সব পাওয়ার খবর সে নিজেও জানে না। তা সত্ত্বেও জানাতে চায় সোচ্ছ্বাসে, বলে, তুমিই আমার সর্বস্ব—ত্বমেব সর্বং। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অনুপম গানেও পাই এ-কৃতজ্ঞ অঙ্গীকার:

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর, তুমি হে আমার প্রাণ
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার—সকলি তোমার দান।

নলিনীবাবু তাঁর জীবনসঙ্গীতে এই গানই গেয়েছেন—তিনি যা কিছু পেয়েছেন সবই গুরুকৃপায়। এ-কথা যে মন মুখ এক ক'রে বলতে পারে সে ধন্য। নলিনীবাবু পড়েন এই কৃতকৃত্যদের কোঠায়।

এ হ'ল প্রাপ্তির দিক। কিন্তু প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় না বৃত্ত সম্পূর্ণ না হ'লে। প্রেম ভক্তির বৃত্ত পূর্ণ হয় সেবায়। নলিনীবাবু এ-বৃত্ত সম্পূর্ণ করে বরেণ্য হয়েছেন, বলতে পেরেছেন বড় গলা করে যে, তিনি গুরুসেবায়ই নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চান। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'-তে একটি দৈবী উক্তি আছে:

"Make of thy daily way a pilgrimage"
প্রতিদিন হোক তব অসীমের তীর্থযাত্রা সম

এ তীর্থের পরম পাথেয় গুরুসেবা। নলিনীবাবু নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এই সেবায়—আর শুধু থেকে থেকে নয়—অবিশ্রান্ত—দিনের পর দিন—মাসের পর

মাস—বৎসরের পর বৎসর। ১৯১০ সালে তিনি পণ্ডিচেরি আসেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ধীর পদযাত্রায় চলেছেন অতন্দ্র ভক্তি উদ্বুদ্ধ গুরুসেবায়।

এভাবে আরো কেউ কেউ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন যুগে যুগে। কিন্তু যাঁরা করেছেন তাঁদের থাকেই থাকে একটি পরম সম্পদ—অসাধ্যসাধনী নিষ্ঠা। নলিনীবাবু মহাপণ্ডিত, ভাবুক, দার্শনিক, নম্র, নানাভাষাবিৎ, বেদজ্ঞ, আত্ম-প্রচার বিমুখ—আরো নানাগুণে গুণান্বিত। কিন্তু আমার মানসপটে আজো জলজল করে আছে তাঁর সর্বোচ্চ মহত্ত্ব—একান্তী গুরুসেবাব্রতী গুরুস্নেহধন্য সাধননিষ্ঠা। ইতি।

SRI AUROBINDO'S LETTERS TO DILIP

18. 6. 43

"Dilip,

I thought I had already told you that your turn towards Krishna was not an obstacle. In any case I affirm that positively in answer to your question. If we consider the large and predominant part he played in my *sadhana*, it would be strange if the part he has in yours could be considered objectionable. 'Sectarianism' is a matter of dogma, ritual etc. not of spiritual experience ; the concentration on Krishna is a self-offering to the Ishta Deva. If you reach Krishna you reach the Divine ; if you can give yourself to Him you can give yourself to me. In any case it does not very much matter. We have accepted your loyalty and devotion, your work and service. All else that is needed can come of itself afterwards. There is nothing wrong in your self-offering in works and service ; it is quite as it should be ; you have no reason to feel worried about it. Don't be diffident. More resistance in difficulties and more faith in your spiritual destiny."

16. 9. 44

"Dilip,

As regards Krishna and devotion, I think I have already answered that more than once. I have no objection at all to the worship of Krishna or the Vaishnava form of devotion, nor is there any incompatibility between the Vaishnava *bhakti* and my Supramental Yoga. There is in fact no special and exclusive

form of Supramental Yoga ; all ways can lead to the Supermind, just as all ways can lead to the Divine.

Certainly I will help you and am helping you and will always help you ; the idea that I can stop doing it or will send you away (because of my ineradicable thirst for Krishna···D.) has no sense in it. If you persevere you cannot fail to get the permanent *bhakti* and the realisation you want but you should learn to put an entire reliance on Krishna to give it when he finds all ready and the time come. If he wants you to clear out imperfections and impurities first, that is after all understandable. I don't see why you should not succeed in doing it, now that your attention is being constantly turned on to it. To see them and acknowledge clearly is the first step."

17. 9. 44

"Dilip,

Certainly Krishna is credited with much caprice, difficult dealings and a playfulness (*lila* !) which the played-with do not always immediately appreciate. But there is reasoning as well as a hidden method in his caprices and when he does come out of it and takes a fancy to be nice to you, he has a supreme attractiveness, charm and allurement which compensate for all you have suffered. Of course your decision to continue the solitude has our full approval."

2. 10. 44

"Dilip,

What is there to comment on foolishness ? It is a universal human failing. Your remark about Krishna was not so much foolish as desperately illogical. (I wrote to Gurudev that I discovered *de nouveau* that I was foolish plus vain—D.) If Krishna was by nature cold and distant (Lord, what a discovery—Krishna of all people !) how could human devotion and aspiration come near him—he and it would soon be like the North and South Pole, growing icier and icier, always facing each other but never seeing because of the earth's bulge ! Also if Krishna

did not want the human *bhakti* as well as the *bhakta* wanting him, who could get at him? He would be always sitting on the snows of the Himalayas like Shiva!"

[But the climax came when, to cap my discomfiture, a loyal adherent of Gurudev wrote me a letter gently admonishing me on my wrong mood. He advised me—doubtless with the friendliest of motives—to worship Sri Aurobindo and not Krishna. His reason was that if I approached Sri Aurobindo I could get Krishna easily en route for the Supramental, but if I worshipped Krishna, he could only lead me to the Overmental and not the still higher Supramental plateau because Krishna could only attain the Overmental but not the Supramental which only Sri Aurobindo could bring down. The long letter my friend penned wound up with a portentous warning to the effect that though Krishna was "included" in the Supramental, He could not include the Supramental in Himself! Duly I sent that letter up to Gurudev who wrote back to me :]

"Dilip,

I am puzzled and perplexed by this affair of Krishna and the Supermind. A. B. C. D. E. F. etc., of Bombay. Nagpur, and Delhi and P. Q. R. up to X. Y. Z. of Calcutta and Pondicherry will all be able to catch hold of its tail and 'include' it in themselves, only poor Krishna can't do it? He can only be himself 'included' in it? Hard lines on Bhagavan Vasudeva! What I said was that Krishna in his incarnation brought down the Overmind into human possibility, because that was his business at the time and all that could be done then; he did not bring down the Supermind, because that was not possible or at least not intended at that stage of the human evolution. I did not mean that he could not have brought down the Supermind if that had been willed at the time. You listen too easily to anybody, G. H. or Q. let us say, and treat their ingenious hairsplitting or unduly authoritative ideas as if they were gospel truths; that causes mental confusion. I believe Krishna's intentions are to remain with us and he won't run away when

the Supermind comes down ; so why should Mother and I send you away on his account? It would be a most illogical procedure. So that is that."

10. 12. 44

"Dilip,

The question you have put raises one of the most difficult and complicated of all problems and to deal with it at all adequately would need an answer as long as the longest chapter of the "Life Divine". I can only state my own knowledge founded not on reasoning but on experience that there is such a guidance and that nothing is in vain in this universe.

If we look only at outward facts in their surface appearence or if we regard what we see happening around us as definitive, not as processes of a moment in a developing whole, the guidance is not apparent ; at most we may see interventions occasional or sometimes frequent. The guidance can become evident only if we go behind appearances and begin to understand the forces at work and the way of their working and their secret significance. After all, real knowledge—even scientific knowledge—comes by going behind the surface phenomena to their hidden processes and causes. It is quite obvious that this world is full of suffering, and afflicted with transience to a degree that seems to justify the Gita's description of it as "this unhappy and transient world, *anityam asukham..*" The question is whether it is mere creation of Chance or governed by a mechanical inconscient Law or whether there is a meaning in it and something beyond its present appearance towards which we move. If there is a meaning and if there is something towards which things are evolving, then inevitably there must be a guidance—and that means that a supporting Consciousness and Will is there with which we can come into inner contact. If there is such a Consciousness and Will, it is not likely that it would stultify itself by annulling the world's meaning or turning it into a perpetual or eventual failure.

This world has a double aspect. It seems to be based on a material Inconscience and an ignorant mind and life full of that

Inconscience; error and sorrow, death and suffering are the necessary consequence. But there is evidently, too, a partially successful endeavour and an imperfect growth towards Light, Knowledge, Truth, Good, Happiness, Harmony, Beauty,—at least a partial flowering of these things. The meaning of this world must evidently lie in this opposition; it must be an evolution which is leading or struggling towards higher things out of a first darker appearance. Whatever guidance there is must be given under these conditions of opposition and struggle and must be leading towards that higher state of things. It is leading the individual, certainly, and the world, presumably, towards the higher state, but through the double terms of knowledge and ignorance, light and darkness, death and life, pain and pleasure, happiness and suffering; none of the terms can be excluded until the higher state is reached and established. It is not and cannot be, ordinarily, a guidance which at once rejects the darker terms, still less a guidance which brings us solely and always nothing but happiness, success and good fortune. Its main concern is with the growth of our being and consciousness, the growth towards a higher Self, towards the Divine, eventually towards a higher Light, Truth and Bliss: the rest is secondary, sometimes a means, sometimes a result, not a primary purpose.

The true sense of the guidance becomes clearer when we can go deep within and see from there more intimately the play of the forces and receive intimations of the Will behind them. The surface mind can get only an imperfect glimpse. When we are in contact with the Divine or in contact with an inner knowledge or vision, we begin to see all the circumstances of our life in the new light and can observe how they all tended without our knowing it towards the growth of our being and consciousness, towards the work we had to do, towards some development that had to be made,—not only what seemed good, fortunate or successful but the struggles, failures, difficulties, upheavals. But with each person the guidance works differently according to his nature, the conditions of his life, his cast of consciousness, his stage of development, his need of further experience. We are not automata but conscious beings and our mentality, our will and its decisions, our attitude to life and

demand on it, our motives and movements help to determine our course; they may lead to much suffering and evil, but through it all the guidance makes use of them for our growth in experience and consequently the development of our being and consciousness. All advance by however devious ways, even in spite of what seems a going backwards or going astray, gathering whatever experience is necessary for the soul's destiny. When we are in close contact with the Divine, a protection can come which helps or directly guides or moves us: it does not throw aside all difficulties, sufferings or dangers, but it carries us through them and out of them—except where for a special purpose there is need of the opposite.

It is the same thing though on a larger scale in a more complex way with the guidance of the world movement. That seems to move according to the conditions and laws of forces of the moment through constant vicissitudes, but still there is something in it that drives towards the evolutionary purpose, although it is more difficult to see, understand and follow than in the smaller and more intimate field of the individual consciousness and life. What happens at a particular juncture of the world-action or the life of humanity, however catastrophical, is not ultimately determinative. Here too, one has to see not only the outward play of forces in a particular case or at a particular time but also the inner and secret play, the far-off outcome, the event that lies beyond and the will at work behind it all. Falsehood and Darkness are strong everywhere on the earth, and have always been so and at times they seem to dominate; but there have also been not only gleams but outbursts of the Light. In the mass of things and the long course of Time, whatever may be the appearances of this or that epoch or movement, the growth of Light is there and the struggle towards better things does not cease. At the present time Falsehood and Darkness have gathered their forces and are extremely powerful; but even if we reject the assertion of the mystics and prophets since early times that such a condition of things must precede the Manifestation and is even a sign of its approach, yet it does not necessarily indicate the decisive victory—even temporary—of the Falsehood. It merely means that the struggle between the Forces is at its

acme. The result may very well be the stronger emergence of the best that can be : for the world-movement often works in that way. I leave it at that and say nothing more.

Uma had reached a stage of her development marked by a predominance of the *sattwic* nature, but not a strong vital (which works towards a successful or fortunate life) or the opening to a higher light,—her mental upbringing and surroundings stood against that and she herself was not ready. The early death and much suffering may have been the result of past (prenatal) influences or they may have been chosen by her own psychic being as a passage towards a higher state for which she was not yet prepared but towards which she was moving. This and the non-fulfilment of her capacities would be a final tragedy if there were this life alone. As it is she has passed towards the psychic sleep to prepare for her life to come."

February 17 1942 Sri Aurobindo

"Dilip,

I am certainly not helping you only with letters, but doing it whenever I get some time for concentration and I notice that when I can do it with sufficient energy and at some length there is response. But this habit of sadness of yours is very much in the way—you ought to take it by the neck and throw it out of you altogether.···Peace was the very first thing that the Yogis and seekers of old asked for and it was a quiet and silent mind—and that always brings peace—that they declared to be the best condition for realising the Divine. A cheerful and sunlit heart is the fit vessel for the Ananda and who shall say that Ananda or what prepares it is an obstacle to the Divine union ? As for despondency, it is surely a terrible burden to carry on the way. One has to pass through it sometimes, like Christian of the Pilgrim's Progress through the Slough of Despond but its constant reiteration cannot be anything but an obstacle. The Gita specially says "Practise the Yoga with an undespondent heart—*anirvinnena chetasa*—I know perfectly well that pain and suffering and struggle and accesses of despair are natural—

though not inevitable on the way—not because they are helped but because they are imposed on us by the darkness of this human nature out of which we have to struggle into the Light. I do not suppose Ramakrishna or Vivekananda would have recommended the incidents you allude to as an example for others to follow—they would surely have said that faith, fortitude, perseverance were the better way. That after all was what they stuck to in the end in spite of these bad moments.··· At any rate Ramakrishna told the story of Narada and the ascetic Yogi and Vaishnava Bhakta with approval of its moral. I put it in my own language but keep the substance : Narada on his way to Vaikuntha met a Yogi practising hard tapasya on the hills. "O Narada," cried the Yogi "you are going to Vaikuntha and will see Vishnu. I have been practising terrific austerities all my life and yet I have not even not attained to Him. Ask Him at least for me when I shall reach Him ?" Then Narada met a Vaishnava, a bhakta who was singing songs to Hari and dancing to his own singing, and he cried also : "O Narada, you will see my Lord, Hari. Ask Him when I shall reach Him and see His face." On his way back Narada came first to the Yogi. "I have asked Vishnu" said the sage, "You will realise Him after six more lives." The Yogi raised a cry of loud lamentation : "What ! So many austerities ! Such gigantic endeavours ! And my reward is realisation after six long lives ! O how hard to me is the Lord Vishnu !" Next Narada met again the bhakta and said to him : "I have no good news for you. You will see the Lord but only after a lakh of lives." But the bhakta leapt up with a great cry of rapture : "Oh, I shall see my Lord Hari ! After only a lakh of lives I shall see my Lord Hari ! How great is the grace of the Lord !" And he began dancing and singing in a renewed ecstasy. Then Narada said "Thou hast attained. Today thou shalt see the Lord" Well, you may say : "What an extravagant story and how contrary to human nature !" Not so contrary as all that and in any case hardly more extravagant than the stories of Harischandra and Shivi. Still I do not hold up the bhakta as an example, for I myself insist on the realisation in this life and not after six or a lakh of births more. But the point of these stories is in the moral and surely when

Ramakrishna told it, he was not ignorant that there was a sun-lit path of Yoga. He even seems to say that it is the Quicker way as well as the better. So the possibility of the sun-lit path is not a discovery or original invention of mine. The very first books on Yoga I read more than thirty years ago spoke of the dark and sun-lit way and emphasised the superiority of the latter over the former."

20. 12. 42 Sri Aurobindo

"Dilip,

These things should not be spoken of but kept under a cover. Even in ordinary non-spiritual things the action of invisible or subjective forces *is* open to doubt and discussion in which there could be no material certitude—while the spiritual force is invisible in itself and also invisible in its action. So it is idle to try to prove that such and such a result was the effect of spiritual force. Each must form his own idea about that—for if it is accepted it cannot be as a result of proof and argument, but only as a result of experience, of faith or of that insight in the heart or the deeper intelligence which looks behind appearances and sees what is behind them. The spiritual consciousness does not claim in that way, it can state the truth about itself but not fight for a personal acceptance. A general and impersonal statement about spiritual force is another matter, but I doubt whether the time has come for it or whether it could be understood by the mere reasoning intelligence.

Sri Aurobindo"

(December, 1935)

3. 12. 29

Almora.

"My dear Dilip,

As regards my remarks about science and art in my last letter, your interpretation was quite right. All I meant was that all these things, were in themselves, in a totally different plane from Yoga. Seen from the top of a mountain the

difference between a dog and an elephant is negligible. Yoga is just such a mountain and as it is said somewhere in Gita : "Even the seeker after Yoga transcends the Vedas." He certainly transcends science and art and all the rest of it. However, as I told you so often, I do not at all disparage either of those pursuits, nor indeed, any part of the Divine Lila.

You say, you hope for a rapproachement betwen science and Yoga. But I am afraid I cannot believe that the day is dawning when scientists will become yogis. It would take long to explain it just now, but I am inclined to feel that the subjectivism of some modern psychology, in the near future will tend to weave a curtain which will cut off educated men from perception of Reality even more effectually than was done by the old-style materialism. Even yogic experiences will be explained, so clearly, and apparently convincingly, that few will be able to hold out. However, I may be wrong and in any case the time has not yet come……

I do so entirely agree with Sri Aurobindo's remarks about the difference between Indian and Western philosophy in his letter to Chadwick where he so beautifully and luminously explains the difference between the Western outlook on life and the India, e. g., where he writes :

"All European metaphysical thought—even in those thinkers who try to prove or explain the existence and nature of God or of the Absolute—does not in its method and result go beyond the intellect. But the Intellect is incapable of knowing the supreme Truth : it can only range about seeking for Truth, and catching fragmentary representations of it, not the things itself, and trying to piece them together. Mind cannot arrive at Truth ; it can only make some constructed figure that tries to represent it or a combination of figures. At the end of European thought, therefore, there must always be Agnosticism, declared or implicit. Intellect, if it goes sincerely to its own end, has to return and give this report : 'I cannot know ; there is or at least it seems to me that there may be or even must be Something beyond, some ultimate Reality, but about its truth I can only speculate ; it is either unknowable or cannot be known by me.' Or, if it has received some light on the way from

what is beyond it, it can say too : 'There is perhaps a consciousness beyond Mind, for I seem to catch glimpses of it and even to get intimations from it. If that is in touch with the Beyond or if it is itself the consciousness of the Beyond and you can find some way to reach it, then this Something can be known but not otherwise.'

"Any seeking of the supreme Truth through intellect alone must end either in Agnosticism of this kind or else in some intellectual system or mind-constructed formula. There have been hundreds of these systems and formulas and there can be hundreds more, but none can be definitive. Each may have its value for the mind, and different systems with their contrary conclusions can have an equal appeal to intelligences of equal power and competence. All this labour of speculation has its utility in training the human mind and helping to keep before it the idea of Something beyond and Ultimate towards which it must turn. But the intellectual Reason can only point vaguely or feel gropingly towards it or try to indicate partial and even conflicting aspects of its manifestation here ; it cannot enter into and know it. As long as we remain in the domain of the intellect only, an impartial pondering over all that has been thought and sought after, a constant throwing-up of ideas, of all the possible ideas, and the formation of this or that philosophical belief, opinion or conclusion is all that can be done. This kind of disinterested search after Truth would be the only possible attitude for any wide and plastic intelligence. But any conclusion so arrived at would be only speculative ; it could have no spiritual value ; it would not give the decisive experience or the spiritual certitude for which the soul is seeking. If the intellect is our highest possible instrument and there is no other means of arriving at supra-physical Truth, then a wise and large Agnosticism must be our ultimate attitude. Things in the manifestation may be known to some degree, but the Supreme and all that is beyond the Mind must remain for ever unknowable.

"It is only if there is a greater consciousness beyond Mind and that consciousness is accessible to us that we can know and enter into the ultimate Reality. Intellectual speculation, logical

reasoning as to whether there is or is not such a greater consciousness cannot carry us very far. What we need is a way to get the experience of it, to reach it, enter into it, live in it. If we can get that, intellectual speculation and reasoning must fall necessarily into a very secondary place and even lose their reason for existence. Philosophy, intellectual expression of the Truth may remain, but mainly as a means of expressing this greater discovery and as much of its contents as can at all be expressed in mental terms to those who still live in the mental intelligence.

"This, you will see, answers your point about the Western thinkers, Bradley and others, who have arrived through intellectual thinking at the idea of an 'Other beyond Thought' or have even, like Bradley, tried to express their conclusions about it in terms that recall some of the expressions in the Arya. The idea in itself is not new ; it is as old as the Vedas. It was. repeated in other forms in Buddhism, Christian Agnosticism. Sufism. Originally, it was not discovered by intellectual speculation, but by the mystics following an inner spiritual discipline. When, somewhere between the seventh and fifth centuries B.C., men began both in the East and West to intellectualise knowledge, this Truth survived in the East ; in the West, where the intellect began to be accepted as the sole or highest instrument for the discovery of truth, it began to fade. But still it has there too tried constantly to return ; the Neo-Platonists brought it back, and now, it appears, the New-Hegelians and others (e.g., the Russian Ouspensky and one or two German thinkers, I believe) seem to be reaching after it. But still there is a difference.

"In the East, especially in India, the metaphysical thinkers have tried as in the West, to determine the nature of the highest Truth by the intellect. But, in the first place, they have not given mental thinking the supreme rank as an instrument for the discovery of Truth, but only a secondary status. The first rank has always been given to spiritual intuition and illumination and spiritual experience ; an intellectual conclusion that contradicts this supreme authority is held invalid. Secondly, each philosophy has armed itself with a practical way of reaching to the supreme

state of consciousness, so that even when one begins with Thought the aim is to arrive at a consciousness beyond mental thinking. Each philosophical founder (as also those who continued his work or school) has been a metaphysical thinker doubled with a Yogi. Those who were only philosophic intellectuals were respected for their learning but never took rank as truth-discoverers. And the philosophics that lacked a sufficiently powerful means of spiritual experience died out and became things of the past because they were not dynamic for spiritual discovery and realization.

"In the West it was just the opposite that came to pass. Thought, intellect, the logical reason came to be regarded more and more as the highest end ; in philosophy Thought is the be-all and the end-all. It is by intellectual thinking and speculation that the truth is to be discovered : even spiritual experience has been summoned to pass the tests of the intellect, if it is to be held valid—just the reverse of the Indian position. Even those who see that mental Thought must be overpassed and admit a supramental 'Other', do not seem to escape from the feeling that it must be through mental Thought, sublimating and transmuting itself, that this other Truth must be reached and made to take the place of the mental limitation and ignorance. And again Western thought has ceased to be dynamic, it has sought after a theory of things, not after realisation. It was still dynamic amongst the ancient Greeks, but for moral and aesthetic rather than spiritual ends. Later on, it became yet more purely intellectual and academic ; it became intellectual speculation only, without any practical ways and means for the attainment of the Truth by spiritual experiment, spiritual discovery, a spiritual transformation. If there were not this difference, there would be no reason for seekers like yourself to turn to the East for guidance ; for in the purely intellectual field the western thinkers are as competent as any Eastern sage. It is the spiritual way, the road that leads beyond the intellectual levels, the passage from the outer being to the inmost self which has been lost by the over-intellectuality of the mind of Europe.

"In the extracts you have sent me from Bradley and Joachim, it is still the intellect thinking about what is beyond itself and

coming to an intellectual, a reasoned speculative conclusion about it. It is not dynamic for the change which it attempts to describe. If these writers were expressing in mental terms some realization, even mental, some intuitive experience of this 'Other than Thought', then one ready for it might feel it through the veil of the language they use and himself draw near to the same experience. Or if, having reached the intellectual conclusion, they had passed on to the spiritual realization, finding the way or following one already found, then in pursuing their thought one might be preparing oneself for the same transition. But there is nothing of the kind in all this strenuous thinking. It remains in the domain of the intellect and in that domain it is no doubt admirable; but it does not become dynamic for spiritual experience. I propose to deal with the substance of this thought and its limitations thereafter, but for the present, I leave it there.

"It is not by 'thinking out' the entire reality, but by a change of consciousness that one can pass from the ignorance to the knowledge—the knowledge by which we become what we know. To pass from the external to a direct and intimate inner consciousness; to widen consciousness out of the limits of the ego and the body; to heighten it by an inner will and aspiration and opening to the Light till it passes in its ascent beyond Mind, to bring down a descent of the supramental Divine through self-giving and surrender with a consequent transformation of mind, life and body—this is the *integral* way to the Truth. (I have said that the idea of the Supermind was already in existence from ancient times. There was in India and elsewhere the attempt to reach it by rising to it; but what was missed was the way to make it integral for the life and to bring it down for transformation of the whole nature, even of the physical nature). It is this that we call the Truth here and aim at in our Yoga.

"I shall answer in a continuation of this letter your question about the Arya and then write what else I have to say in the matter."

Quite, Dilip, And all his remarks about the Western philosophers are as true. Even where they are talking about the same sort of things they do so from utterly different points

of view and have nothing real in common under the seeming agreement. Whether a Western philosopher says with Mc Teggart that a stone is a colony of souls, or with Berkely that it is an idea in the mind of God or with Bertrand Russell that it is a collection of perspectives of neutral stuff (whatever that may mean), in practice he means nothing practical at all and is in just the same position as the common-sense person who says that a stone is just a stone. All these Western systems are like that. They are excellent as intellectual training, but they never come to business. [I have often noticed that many European scholars will discourse eloquently about the beauty and healthiness and convenience of Indian dress, say, or Indian ways, but let any European take them at their word and go and put on a *dhoti* and he is damned at once. It is so with Western thought. It will talk eloquently but will never "put on the dhoti," and will regard you as vulgar if you attempt to do so].

That is why I differ from those wonderfully catholic men who seek to build a bridge between India and Megalopolis and want to make it easy for the 'Megalopolitan' (to use Spengler's words) to stroll over to India and back for the evening walk in Piccadilly. I would rather Megalopolitan were confronted once and for all with the necessity of a choice so that if he chose India he should have to renounce his cultural pride for good and all and bow his head in the dust that Sri Krishna trod. For that reason I do not care for Woodroff's attempts to show how much in accord with modern science are certain aspects of Shakta philosophy. I would prefer simply to say : "This is the truth ; take it or leave it." If science says this in her own way, so much the better for science. If not, so much the worse···

You talk of internationalists. But all this pale internationalism will not get one anywhere, and it will be swept away again by the very next flood of violent national passions. Noble as it is, it seems anaemic when confronted with say the vivid though Asuric life of the socialist Third International. However, my chief objection to an artist internationalist is that I suspect him of using the words and expressions coined by *yogis* and *rishis* in their efforts to set forth their experiences···of using, I say, these

expressions to lend a sort of borrowed grandeur to the pale experiences of 'art' which (when even genuine) are to the former as the moon is to the sun. He is thus helping to debase the currency as it were.

Give Chadwick my love and some news about your own sweet self.

Affectionately,
KRISHNAPREM

Dilip,

As for the sense of superiority, that is a little difficult to avoid when greater horizons open before the consciousness, unless one is already of a saintly and humble disposition. There are men like Nag Mahashaya (among Sri Ramkrishna's disciples) in whom spiritual experience creates more and more humility; there are others like Vivekananda in whom it creates a great sense of strength and superiority—European critics have taxed him with it rather severely; there are others in whom it fixes a sense of superionrity to men and humility to the Divine. Each position has its value. Take Vivekananda's famous answer to the Madras Pundit who objected to one of his assertions saying: "But Shankara does not say so", to whom Vivekananda replied: "No, but I, Vivekananda, say so", and the Pundit was speechless. That "I, Vivekananda", stands up to the ordinary eye like a Himalaya of self-confident egoism. But there was nothing false or unsound in Vivekananda's spiritual experience. For this was not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled. This is not to deny the necessity of non-egoism and of spiritual humility, but to show that the question is not so easy as it appears at first sight. For if I have to express my spiritual experiences I must do that with truth—I must record them, their *bhavá*, their thoughts, feelings, extensions of consciousness which accompany them. What am I to do with the experience in which one feels the whole world in oneself or the force of the Divine flowing in one's being and nature or the certitude of

one's faith against all doubts and doubters or one's oneness with the Divine or the smallness of human thought and life compared with this greater knowledge and existence? And I have to use the word I—I cannot take refuge in saying "This body" or "This appearance", especially as I am not a *Mayavadin*. Shall I not, therefore, fall into expressions which will make K. S. shake his head at my assertions as full of pride and ego? I imagine it would be difficult to avert it.

Another thing: it seems to me that you identify faith very much with the mental belief, but real faith is something spiritual, a knowledge of the soul. The assertions you quote in your letter are the hard assertions of mental belief leading to a great vehement assertion of one's mental creed and goal because they are one's own and must therefore be greater than those of others—an attitude which is universal in human nature. Even the atheist is not tolerant, but declares his credo of Nature and Matter as the only truth and on all who disbelieve it or believe in other things he pours scorn as unenlightened morons and superstitious half-wits. I bear him no grudge for thinking me that, but I note that this attitude is not confined to religious faith but is equally natural to those who are free from religious faith and do not believe in Gods or Gurus. You will not, I hope, mind my putting the other side of the question; I want to point out that there is the other side, that there is much more to be said than at first sight appears.

Sri Aurobindo

"Dilip,

It was a great refreshment to read the letters of Krishnaprem; one feels here a stream from the direct sources of Truth that one does not meet so often as one could desire. Here is a mind that can not only think but see—and not merely see the surfaces of things with which most intellectual thought goes on wrestling without end or definite issue and as if there were nothing else, but look into the core. The Tantriks have a phrase *Pashyanti Vak* to describe one level of the *vak-shakti*, the seeing Word. Krishnaprem has, it seems to me, much of the *Pashyanti Buddhi*,

the seeing Intelligence. It might be because he has passed beyond thought into experience, but there are many who have a considerable wealth of experience without its clarifying their eye of thought to this extent ; the soul feels, but the mind goes on with mixed and imperfect transcriptions, blurs and confusions in the idea. There must have been the gift of right vision lying ready in his nature.

It is an achievement to have got rid so rapidly and decisively of the shimmering mists and fogs which modern intellectualism takes for Light of Truth. The modern mind has so long and persistently wandered—and we with it—in the Valley of the False Glimmer that it is not easy for anyone to disperse its mists with the sunlight of clear vision so soon and entirely as he had done. All that he says about modern humanism and humanitarianism, the vain efforts of the sentimental idealist and the ineffective intellectual, about synthetic electicism and other kindred things is admirably clear-minded ; it hits the target. It is not by these means that humanity can get that radical change of its ways of life which is yet becoming imperative, but only by reaching the bed-rock of Reality behind,—not through mere ideas and mental formations, but by a change of the consciousness, an inner and spiritual conversion. But that is a truth for which it would be difficult to get a hearing in the present noise of all kinds of many-voiced clamour and confusion and catastrophe.

A distinction, the distinction very keenly made here, between the plane of phenomenal process, of externalised Prakriti, and the plane of Divine Reality ranks among the first words of the inner wisdom. The turn Krishnaprem gives to it is not merely an ingenious explanation, it expresses very soundly one of the clear certainties you meet when you step across the border and look at the outer world from the standing-ground of the inner spiritual experience. The more you go inward or upward, the more the view of things changes and the outer knowledge science organises takes its real and very limited place. Science, like most mental and external knowledge, gives you only truth of process. I would add that it cannot give you

even the whole truth of process; for you seize some of the ponderables, but miss the all-important imponderables; you get, hardly even the how, but the conditions under which things happen in Nature. After all, the triumphs and marvels of Science, the explaining principle, the rationale, the significance of the whole is left as dark, as mysterious and even more mysterious than ever. The scheme it has built up of the evolution not only of this rich and vast variegated material world, but of life and consciousness and mind and their workings out of a brute mass of electrons, identical and varied only in arrangement and number is an irrational magic more baffling than any the most mystic imagination could conceive. Science in the end lands us in a paradox effectuated, an organised and rigidly determined accident, an impossibility that has somehow happend: it has shown us a new, a material Maya, *aghatana-ghatana-patiyasi*, very clever at bringing about the impossible, a miracle that cannot logically be and yet somehow is there—actual, irresistibly organised, but still irrational and inexplicable. And this is evidently because science has missed something essential: it has seen and scrutinised what has happened and in a way how it has happened, but it has shut its eyes to something that made this impossible possible, something it is there to express. There is no fundamental significance in things if you miss the Divine Reality; for you remain embedded in a huge surface crust, of manageable and utilisable appearance. It is the magic of the Magician you are trying to analyse, but only when you enter into the consciousness of the Magician himself can you begin to experience the true organisation, significance and circles of the Lila. I say "begin" because, as you suggest, the Divine Reality is not so simple that at the first touch you can know all of it or put it into a single formula; it is Infinite and opens before you an infinite knowledge to which all science put together is a bagatelle. But still you do touch the essential, the eternal behind things and in the light of That all begins to the profoundly luminous, intimately intelligible.

I have once before told you what I think of the ineffective peckings of certain well-intentioned scientific minds on the surface or apparent surface of the spiritual Reality behind things

and I need not elaborate it here.* Krishnaprem's prognostic of a greater danger in the new attack by the adversary against the validity of spiritual and supraphysical experience, their new strategy of destruction by admitting and explaining it in their new sense, is interesting enough and there is strong ground for the apprehension he expresses. But I doubt whether if, once these things are admitted to scrutiny, the mind of humanity will long remain satisfied with explanations so ineptly superficial and external explanations that explain nothing. If the defenders of religion take up an unsound position, easily capturable, when they affirm only the subjective validity of spiritual experience, the opponents also seem to me to be giving away, without knowing it, the gates of the materialistic stronghold by their consent at all to admit and examine spiritual and supraphysical experience. Their entrenchment in the physical field, their refusal to admit or even examine supraphysical things was their tower of strong safety ; once it is abandoned, the human mind pressing towards something less negative, more helpfully positive will pass to it over the dead bodies of their theories and the broken debris of their annulling explanations and ingenious psychological labels. Another danger may then arise not of a final denial of the Truth, but the repetition in old or new forms of a past mistake : on one side some revival of blind fanatical obscurantist sectarian religionism, on the other a stumbling into the pits and quagmires of the vitalistic occult and the pseudospiritual mistakes that made the whole real strength of the materialistic attack on the past and its credos. But these are phantasms that meet us always on the border line or in the intervening country between the material darkness and the perfect splendour. In spite of all, the victory of the supreme Light even in the darkened earth-consciousness stands as the one ultimate certitude.

Art, poetry, music are not Yoga, not in themselves things spiritual any more than philosophy is a thing spiritual or Science.

---

* Sri Aurobindo wrote in a letter to D. K. R. about Professor Eddington's 'Science and the Unseen World" : "The part about the changed attitude of modern Science to its own field of discovery is interesting. ...The latter part of this book about religious experience I find very feeble ; it gives me the impression of a hen scratching the surface of the earth to find a scrap or two of food—nothing deeper."

There lurks here another curious incapacity of the modern intellect—its inability to distinguish between mind and spirit, its readiness to mistake mental, moral, and aesthetic idealisms for spirituality and their inferior degrees for spiritual values. It is mere truth, the mental intuitions of the metaphysician or the poet for the most part fall far short of a concrete spiritual experience ; they are distant flashes, shadowy reflections, not rays from the centre of Light. It is not less true that, looked at from the peaks, there is not much difference between the high mental eminences and the lower climbings of this external existence. All the energies of the *Lila* are equal in the sight from above, all are Disguises of the Divine. But one has to add that all can be turned into a first means towards the realisation of the Divine. A philosophic statement about the Atman is a mental formula, not knowledge, not experience, yet sometimes the Divine takes it as a channel to touch, strangely a barrier in the mind breaks down, something is seen, a profound change operated in some inner part, there enters into the ground of the nature something calm, equal, ineffable ; one stands upon a mountain ridge and glimpses or mentally feels a wideness, a pervasiveness, a nameless Vast in Nature, then suddenly there comes the touch, a revelation, a flooding, the mental loses itself in the spiritual, one bears the first invasion of the Infinite. Or you stand before a temple of Kali beside a sacred river and see what ?—a sculpture, a gracious piece of architecture, but in a moment, mysteriouly, unexpectedly there is instead a Presence, a Power, a Face that looks into yours, an inner sight in you has regarded the World Mother. Similar touches can come through art, music, poetry to their creator, or to one who feels the shock of the world, the hidden significance of a form, a message in the sound that carries more perhaps than was consciously meant by the composer. All things in the Lila can turn into windows that open on the hidden Reality. Still, so long as one is satisfied with looking through windows, the gain is only initial ; one day one will have to take up the pilgrim's staff and start out to journey there where the Reality is for ever manifest and present. Still less can it be spiritually satisfying to remain with shadowy reflections ; a search imposes itself for the Light which they

strive to figure. But since this Reality and this Light are in ourselves no less than in some high region above the mortal plane, we can in the seeking for it use many of the figures and activities of life, as one offers a flower, a prayer, an act to the Divine, one can offer too a created form of beauty, a song, a poem, an image, a strain of music, and gain through it a contact, a response or an experience. And when that divine consciousness has been entered or when it grows within, then too its expression in life through these things is not excluded from Yoga, these creative activities can still have their place, though not intrinsically a greater place than any other than can be put to divine use and service. Art, poetry, music, as they are in their ordinary functioning, create mental and vital, not spiritual values; but they can be turned to a higher end, and then, like all things that are capable of linking our consciousness to the Divine, they are transmuted and become spiritual and can be admitted as part of a life of Yoga. All takes new values not from itself, but from the consciousness that uses it; for there is only one thing essential, needful, indispensable, to grow conscious of the Divine Reality and live in it and live it always.

Sri Aurobindo
17. 3. 32

"Guru!

Brotteaux, one of the unabashed scoffers in Anatole France's *Dieux Ont Soif* throws this hearty fling at God in the face of Father Longuemare, the pious Priest.

"Ou Dieu veut empêcher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le peut ni ne le veut, ou il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut. il est impuissant; s'il le peut et ne le veut, il est pervers; s'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers; s'il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon Pire?"

[Either God would prevent evil if he could, but could not, or he could but would not, or he neither could nor would, or he both would and could. If he would but could not, he is impotent; if he could but would not, he is perverse; if he neither could nor would, he is at once impotent and perverse; if he both could and would why on earth doesn't he do it, Father?]

I send this to you as I immensely enjoyed the joke and am sure you would too, hoping you would have something to fend it off with.

Dilip"

"Dilip,

Anatole France is always amusing whether he is ironising about God and Christianity or about the rational animal Humanity (with a big H) and the follies of his reason and his conduct. But I presume you never heard of God's explanation of his non-interference to Anatole France when they met In some Heaven of Irony, I suppose—it can't have been in the heaven of Karl Marx, in spite of France's conversion before his death. God is reported to have strolled up to him and said : "I say, Anatole, you know that was a good joke of yours ; but there was a good cause for my non-interference. Reason came along and told me : 'Look here, why do you pretend to exist ? You know you don't exist and never existed, or, if you do, you have made such a mess of your creation that we can't tolerate you any longer. Once we have go you out of the way all will be right upon earth, tip-top. AI ; my daughter Science and I have arranged that between us. Man will raise his noble brow, the head of creation, dignified, free, equal, fraternal, democratic, depending upon nothing but himself, with nothing greater than himself anywhere in existence. There will be no God, no gods, no priestcraft, no religion, no kings, no oppression, no poverty, no war or discord anywhere. Industry will fill the earth with abundance , Commerce will spread her golden reconciling wings everywhere ; Universal Education will stamp out ignorance and leave no room for folly or unreason in any human brain. Man will become cultured, disciplined, rational, scientific, well-informed, arriving always at the right conclusion upon full and sufficient data. The voice of the scientists and the experts will be loud in the land and guide mankind to the earthly paradise. A perfected society ; health universalised by a developed medical science and a sound hygience everything rationalised · science evolved, infallible, omnipotent, omniscient ; the riddle of

existence solved ; the Parliament of Man, the Federation of the world ; evolution, of which man, magnificent man, is the last term, completed in the noble white race, a humanitarian kindness and uplifting for our backward brown, yellow and black brothers ; peace, peace, peace, reason, order, unity everywhere.' There was a lot more like that, Anatole, and I was so much impressed by the beauty of the picture and its convenience, for I would have nothing to do or to supervise, that I at once retired from business—for, you know that I was always of a retiring disposition and inclined to keep myself behind the veil or in the background at the best of times. But what is this I hear ? It does not seem to me from reports that Reason even with the help of Science has kept her promise. And if not, why not ? Is it because she would not, or because she could not ? Or is it because she both would not and could not ? Or because she both would and could, but somehow did not ? And I say, Anatole, these children of theirs, the State, Industrialism, Capitalism and the rest have a queer look ; they seem very much like Titanic monsters armed, too, with all the powers of Intellect and all the weapons and organizations of Science : Yet it does look as if mankind were not freer under them than under Kinds and the Churches : What has happened — or is it possible that Reason is not supreme and infallible, even that she has made a greater mess of it than I could have done myself !!" Here the report of the conversation ends ; I give it for what it is worth, for I am not acquained with the God and have to take him on trust from Anatole France.

Sri Aurobindo

"Guru !

You write : "The Shavian assertiveness is not offensive (as the Hugoesque tends to be) because it is full also of a smiling self-mockery, an irony that under a form of deliberate self-praise cuts at itself and the world at one sweep. It is curious that so many people seem to miss this character of Shaw's self-assertiveness and self-praise—its essential humour." But what about Frank Harris's exposure of Shaw ?

He writes, for instance, in his posthumous biography of his erstwhile collegue and idol : "fifty years later, the Encyclopaedia will read : 'Bernard Shaw—a marvellous statue by Rodin, otherwise unknown." Another fact ; the judgment of Wells who, broadcasting the other day on Shaw's apotheosis of Soviet Russia, said : "he heard Shaw's lectures for his exquisite and astonishing English pronounciation, but who ever heard him for anything else ?"

Dilip

"Dilip,

I do not think Harris's attack on Shaw can be taken very seriously any more than can Wells' jest about his pron unciation of English being the sole astonishing thing about him. Wells, Chesterton, Shaw and others joust at each other like the *kabiwalas* (rival strret-poets) of old Calcutta, though with more refined weapons, and you cannot take their humourous sparrings as considered appreciations ; if you do, you turn exquisite jests into solemn nonsense. Mark that their method in these sparrings, the turn of phrase, the style of their wit is borrowed from Shaw himself with personal modifications ; for this kind of humour, light as air and sharp as a razorblade, epigrammatic, paradoxical, often flavoured with burlesque seriousness and urbane hyperbole, good-humoured and cutting at once, is not English in origin , it was brought in by two Irishmen, Shaw and Wilde. Harris's stroke about the Rodin bust and Wells sally are entirely in the Shavian turn and manner, they are showing their cleverness by spiking their guru in swordsmanship with his own rapier. Harris's attack on Shaw's literary reputation may have been serious, there was a sombre and violent brutality about him, which makes it possible ; but his main motive was to prolong his own notoriety by a clever and vigorous assualt on the mammoth of the hour. Shaw himself supplied materials for his critic, knowing well what he would write, and edited this damaging assault on his own fame, a typical Irish act at once of chivalry and whimsical humour. I don't think Harris had much understanding of Shaw, the man, as apart from the writer ; the

Anglo-Saxon is not usually capable of understanding either Irish character or Irish humour, it is so different from his own. And Shaw is Irish through and through ; there is nothing English about him except the language he writes and even that he has changed into the Irish case, flow, edge and clarity—though not bringing into it, as Wilde did, Irish poetry and colour.

Shaw's seriousness and his humour, real seriousness and mock seriousnes, run into each other in a baffling inextricable *mêlange*, thoroughly Irish in its character for it is the native Irish turn to speak lightly when in deadly earnest and to utter the most extravagant jests with a profound air of seriousness,—and it so puzzled the British public that they could not for a long time make up their mind as to how to take him. At first they took him for a jester dancing with cap and bells, then for a new kind of mocking Hebrew Prophet or Puritan reformer : Needless to say, both judgments were entirely out of focus. The Irishman is, on one side of him, the vital side, a *passione'*, imaginative and romantic, intensely emotional, violently impulsive, easily inspired to poetry or rhetoric, moved by indignation and suffering to a mixture of aggressive militancy, wistful dreaming and sardonic extravagant humour ; on the other side, he is keen in intellect, positive, downright, hating all loose foggy sentimentalism and solemn pretence and prone, in order to avoid the appearance of them in himself, to cover himself with a jest at every step ; it is at once his mask and his defence. At bottom he has the possibility in him of a modern Curtius leaping into the yawning pit for a cause, an Utopist or a Don Quixote,—according to occasions a fighter for dreams, an idealistic pugilist, a rebel or a reckless but often shrewd and successful adventurer. Shaw has all that in him, but with it a cool intellectual clearness, also Irish, but no often put to such use, which dominates it all and tones it down, subdues it into measure and balance, gives an even harmonising colour. There is as a result a brilliant tempered edge of flame, lambent, lighting up what it attacks and destroys, and destroying it by the light it throws upon it, not fiercely but trenchantly,—though with a trenchant playfulness—aggressive and corrosive. An ostentation of humour and parade covers up the attack and puts the opponent off his defence. That is why the English

mind never understood Shaw and yet allowed itself to be captured by him, and its old established ideas, "moral" positions, impenetrable armour of commercialised Puritanism and self-righteous Victorian assurance to be ravaged and burned out of existence by Shaw and his allies. Anyone who knows Victorian England and sees the difference now cannot but be struck by it, and Shaw's part in it, at least in preparing and making it possible, is undeniable. That is why I call him devastating, not in any ostentatiously catastrophic sense, for there is a quietly trenchant type of devastatingness, because he has helped to lay low all these things with his scythe of sarcastic mockery and lightly, humorously penetrating seriousness—effective, as you call it, but too deadly in its effects to be called merely effective.

That is Shaw as I have seen him and I don't believe there is anything seriously wrong in my estimate. I don't think we can complain of his seriousness about Pacifism, Socialism and the rest of it ; it was simply the form in which he put his dream, the dream he needed to fight for, needed by his Irish nature. Shaw's bugbear was unreason and disorder, his dream was a humanity delivered from vital illusions and deceptions, organising the life-force in obedience to reason, casting out waste and folly as much as possible. It is not likely to happen in the way he hoped, reason has its own illusions, and though he strove against imprisonment in his own rationalistic ideals, trying to escape from them by the issue of his mocking critical humour, he could not help being their prisoner. As for his pose of self-praise, no doubt he valued himself,—the public fighter like the man of action needs to do so in order to act or to fight. Most, though not all, try to veil it under an affectation of modesty ; Shaw, on the contrary, took the course of raising it to a humorous pitch of burlesque and extravagance. It was at once part of his strategy in commanding attention and a means of mocking at himself—I was not speaking of analytical self-mockery, but of the whimsical Irish kind—so as to keep himself straight and at the same time mocking his audience. It is a peculiarly Irish kind of humour to say extravagant things with a calm convinced tone as if announcing a perfectly serious proposition—the Irish exaggeration of the humour called by the

French *pince-sans rire*, his hyperboles of self-praise actually reek with this humourous savour. If his extravagant comparison of himself with Shakespeare had to be taken in dull earnest with no smile in it, he would be either a witless ass or a giant of humourless arrogance,—and Bernard Shaw could be neither.

As to his position in literature, I have given my opinion; but, more precisely, I imagine he will take some place but not a very large place, once the drums have ceased beating and the fighting is over. He has given too much to the battles of the hour perhaps to claim a large share of the future. I suppose some of his plays will survive for their wit and humour and cleverness more than for any higher dramatic quality, like those of three other Irishmen: Goldsmith, Sheridan, Wilde. His prefaces may be saved by their style and force, but it is not sure. At any rate. as a personality he is not likely to be forgotten, even if his writings fade. To compare him with France is futile -they were minds too different and moving in too different domains for comparison to be possible.

Sri Aurobindo

"Dilip,

I find in Shavianism a delightful note and am thankful to Shaw for being so different from other men that to read even on ordinary interview with him in a newspaper is an intellectual pleasure. As for his being one of the most original personalities of the age, there can be no doubt about that. All that I deny to him is a constructive and creative mind—but his critical force in certain fields at least, as a critic of men and life, was very great, and in that field he can in a sense be called creative—in the sense that he created a singularly effective and living form for his criticism of life. It is not drama but it is something original and strong and altogether of its own kind—so, up to that limit, I qualify my statement that Shaw was not a creator.

The tide is turning against him after being strongly for him under compulsion from his own power and will, but nothing can alter the fact that he was one of the keenest and most powerful minds of the age with an originality in his way of looking at

things which no one else can equal. He is too penetrating and sincere a mind to be a stiff partisan or tied to some intellectual dogma or other. When he sees something which qualifies the "ism"—even that on whose side he is standing, he says so, that need not weaken the ideal behind, on the contrary it is likely to make it more plastic and practicable.

Sri Aurobinda"

"Dilip,

The spiritual life is not a thing that can be formulated in a rigid definition or bound by a fixed mental rule: it is a vast field of evolution, an immense kingdom potentially larger than the other kingdoms below it with a hundred provinces, a thousand types, stages, forms, paths, variations of the spiritual ideal, degrees of spiritual advancement. It is from the basis of this truth which I shall explain in subsequent letters that things regarding spirituality and its seekers must be judged if they are to be judged with knowledge. It is only by so understanding it that one can understand it truly, either in its past or in its future, or put in there the spiritual men of the past and the present or relate the different ideals, stages, etc., thrown up in the spiritual evolution of the human being.

(December, 1935) Sri Aurobindo

"Dilip,

I was a little taken aback by the first letter, for my remarks about X had been perfectly casual and I attached little importance to them when I wrote them. I would certainly not have written them if I had thought they were of a kind to cause trouble to you. In scribbling them I had no idea of imposing my views about X on you—I had no idea of writing as a Guru to a disciple or laying down the law, it was rather as a friend to a friend expressing my ideas and discussing them with a perfect ease and confidence. Both the Mother and myself have a natural tendency to speak or write to you in that way, expressing the idea that comes without measuring of terms or any *arrie're-*

pens ee because we feel close to your ps ychic being always and that is the relation we have quite naturally with you.

"Dilip,

If you can't remember the Divine all the time you are writing, it does not greatly matter. To remember and dedicate at the beginning and give thanks at the end ought to be enough. Or, at the most, to remember too when there is a pause. Your method seems to me rather painful and difficult, you seem to be trying to remember and work with the same part of your mind. I don't know if that is possible. When people remember all the time during work (it can be done) it is usually with the back of their minds or else there is created gradually a double consciousness—one in front that works, one within that witnesses and remembers. But this is only a comment—I am not asking you to try that. For usually it does not come so much by trying as by a very simple constant aspiration and will of consecration which does bring results, even if in some it takes a long time about it. That is a great secret of *sadhana*—to know how to get things done by the Power behind or above instead of doing all by the mind's effort. Let me hasten to say, however, that I am not dogmatising—I don't mean to say that the mind's effort is unnecessary or has no result—only if it tries to do all by itself, that becomes a laborious effort for all except the spiritual athletes. Nor do I mean that the other method is the longed-for short cut; the result may, as I have said, take a long time. Patience and firm resolution are necessary in every method of *sadhana*.

Strength is all right for the strong—but the aspiration and Grace answering to are not altogether myths. Again, you see, I am muddling the human mind—like Krishna of the Gita—by supporting contrary things at the same time—can't help it—it is my nature."

"Dilip,

I think you have made too much play with my phrase "an accident", ignoring the important qualification," it *seemed* to come by an accident". After four years of *pranayam* and other practices on my own, with no other result than an increased health and outflow energy, some prychophysical phenomena, a great outflow of poetic creation, a limited power of subtle sight (luminous patterns and figures etc.) mostly with the waking eye, I had a complete arrest and was at a loss. At this juncture I was induced to meet a man without fame whom I did not know, a *bhakta* with a limited mind but with some experience and evocative power. We sat together and I followed with an absolute fidelity what he instructed me to do, not myself in the least understanding where he was leading me or where I was myself going. The first result was a series of tremendously powerful experiences and radical changes of consciousness which he had never intended—for they were Advaitic and Vedantic and he was against Advait Vedanta—and which were quite contrary to my own ideas, for they made me see with a stupendous intensity the world as a cinematographic play of vacant forms in the impersonal universality of the Absolute Brahman. The final upshot was that he was made by a Voice within him to hand me over to the Divine within me enjoining an absolute surrender to its will—a principle or rather a seed force to which I kept unswervingly and increasingly till it led me through all the mazes of an incalculable Yogic developement bound by no single rule or style or dogma or shastra to where and what I am that Justify my phrase "it seemed to come to me like an accident" ? But my meaning is that the ways of the Divine are not like that of the human moral or according to our patterns and it is impossible to judge them or to lay down for Him what he shall or shall not do for the Divine knows better than we do. If we admit the Divine at all, then the true reason and *bhakti* seem to me to be at one in demanding implicit faith and surrender. I do not see how without them there can be *avya bhicharini bhakti* (one-pointed adoration.)

(May 1932) Sri Aurobindo

"Dilip.

The Yogi goes still further,—he is not only a master there but even while in mind in a way he gets out of it, as it were and stands above or quite back from it, and free. For him the image of the factory of thoughts is no loger quite valid, for he sees that thoughts come from outside, from the Universal Mind, or Universal Nature, sometimes formed and distinct, sometimes unformed and then they are given shape somewhere in us···It was my great debt to Lele that he showed me this. "Sit in meditation," he said, "but do not think, look only at your mind; you will see thoughts *coming into it*; before they can enter throw these away from your mind till your mind is capable of entire silence." I had never heard before of thoughts coming visibly into the mind from outside, but I did not think either of questioning the truth or the possibility, I simply sat down and did it. In a moment my mind became silent as a windless air on a high mountain summit and then I was one thought and then another coming in a concrete way from outside, I flung them away before they could enter and take hold of the brain and in three days I was free. From that moment, in principle, the mental being in me became a free Intelligence, a Universal Mind, not limited to the narrow circle of personal thought as a labourer in a thought-factory, but a receiver of knowledge from all the hundred realms of being and free to choose what it willed in this vast sight-empire and thought-empire.

5. 8 32 Sri Aurobindo"

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১২	belong to your myself	belong to your self
২৬	১১	the day	the clay
৩২	১৭	heaven's touch snare	heaven's touch a snare
৩৮	১৪	যে মতো	যে মন্ত্রে
৪৪	১৮	given to you that I have	given to you what I have
৫৬	৭	lenchten	leuchten
৬৭	২২	nissed	kissed
৯৬	২৪	তাঁর দ্বারা যেমন	তাঁর দ্বারা যে-রকম
১১৭	২৩	earth borb	earth born
১২১	৭	অবাধ উচ্ছ্বাসে :	অবাধ উচ্ছ্বাসে গাইবেই গাইবে :